প্রথম প্রকাশ
১৫ই আগস্ট ১৯৬০

প্রকাশক
অনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

অক্ষর বিন্যাস
কম্পোজিট
৩৪/২, বাজেশিবপুর রোড
শিবপুর, হাওড়া ৭১১১০২

মুদ্রাকর:
অজিত কুমার সাউ
নিউ রূপলেখা প্রেস
৬০, পটুয়াটোলা লেন,

সূচি

চিঠিপত্র

সবিনয় নিবেদন

জন্মের উপর তো আমাদের হাত নেই। বামন হয়ে জন্মাই-ই যদি, চাঁদ ধরার স্বপ্ন দেখতে পারব না কেন? স্বপ্ন দেখার স্পর্ধা থেকেইতো এই জীবনকথা রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। মনের টানে শচীনকর্তাকে নিয়ে লিখেছিলাম 'ভাটি গাঙ বাইয়া'। ত্রিপুরার গৌরব চরিত্র শচীনকর্তা। তেমনি গৌরব চরিত্র শিল্পী ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা। নানা উচ্চারণে তিনি পরিচিত। ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মন। ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা। ধীরেন ঠাকুর। সমরেশ বসু আবার 'দেখি নাই ফিরে' লিখতে গিয়ে তাঁকে ধীরেন দেবও বলেছেন। সে আমরা যেই নামেই ডাকি, মানুষটিকে চিনতে কোন অসুবিধে হয় না। নিজে তিনি সাধারণত 'ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা' নামে সই করতেন। আমরা 'দেববর্মা' ও 'দেববর্মন' দুই পদবিই ব্যবহার করেছি।

বহুকাল ধরে ত্রিপুরার রাজপরিবারের সঙ্গে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার বিশেষত রবীন্দ্রনাথের নিবিড় যোগাযোগ ছিল। ত্রিপুরার মহারাজার কাছ থেকেই এই দেশে প্রথম রবীন্দ্রনাথ 'কবিখ্যাতি' পেয়েছিলেন। মোট সাতবার তিনি ত্রিপুরা সফরে গিয়েছেন। নানা সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে এই দুই বাড়ির লোকজন পরস্পর পরস্পরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রকে স্বাধীনভাবে গবেষণা করার জন্য ত্রিপুরার রাজপরিবার থেকে আবেদন করে প্রচুর অর্থসংগ্রহ করে দিয়েছেন।

শিক্ষা শিল্প ও সংস্কৃতির অবিচ্ছিন্ন চর্চা ত্রিপুরার রাজপরিবারে বহুকাল থেকেই বহমান ছিল। ফলে ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনে ছোটদের বিদ্যালয় গড়েছিলেন, ত্রিপুরার রাজপরিবারের অনেক ছোট ছেলেরা সেখানে পড়তে গিয়েছে। রাজপরিবারের বাইরেও ত্রিপুরার অনেক ছেলেমেয়ে শান্তিনিকেতনে পাঠ গ্রহণ করেছেন। সত্যি বলতে কি, শুরুতে কলকাতা শহরের কেউ ওখানে পড়তে যেত না। বাইরের নানা জায়গা থেকেই বিদ্যার্থীরা জড়ো হত।

ধীরেনকৃষ্ণও তেমনি লেখাপড়ার প্রথম পাঠ শুরু করেছেন শান্তিনিকেতনে। দুই ভাই মিলে ১৯১১ সালে শান্তিনিকেতন গিয়েছিলেন। দাদা কমলকৃষ্ণ ও

ছোটভাই ধীরেনকৃষ্ণ। ন'বছর বয়স তখন ধীরেনকৃষ্ণের। ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে পড়েছেন। পরে কলাভবনে ছাত্র হিসেবে যোগ দেন। অসিতকুমার হালদার, নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ কর মশাই তাঁর শিক্ষক ছিলেন। মাস্টারমশাই নন্দলালের প্রভাব তাঁর উপর সবচেয়ে বেশি ছিল। নন্দলালকে নিয়ে তিনি লিখেছেনও বেশি।

প্রথম বছর কলাভবনের ছাত্রসংখ্যা ছিল চার। ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মন, হীরাচাঁদ দুগার, অর্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় আর কৃষ্ণকিঙ্কর ঘোষ। ২০০২ সালে ধীরেনকৃষ্ণের শতবর্ষ অতিক্রান্ত হয়েছে। বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর শতবর্ষ অতিক্রান্ত হয়েছে। চিত্রশিল্পপ্রেমিকেরা তাঁদের জন্মশতবর্ষের কথা প্রচারের আলোয় বিশেষ নিয়ে আসেননি। নানা প্রচার মাধ্যমগুলো পর্যন্ত এমন একটি ঐতিহাসিক তথ্যে ইতিহাস-উপাদান 'যথেষ্ট' পাচ্ছেন বলে মনে করছেন না।

ত্রিপুরা সরকারের কথা জানি। শিল্পীর জন্মশতবর্ষে 'ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ পুরস্কার' প্রবর্তন করেছেন। প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন কমলপ্রভা দেবী।

ধীরেনকৃষ্ণ কলাভবনের দীর্ঘকাল অধ্যক্ষ ছিলেন। রমেন্দ্রনাথও কলকাতায় সরকারী আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। এসব এখন 'পলিপড়া' তথ্য, কারো কাছেই বুঝি আর আলোকোজ্জ্বল ইতিহাস নয়।

যাই হোক, আমরা আমাদের সাধ্যমতো শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি। কলাভবন তৈরি হবার পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের চিত্রকলার একটা সারসংক্ষেপ প্রাক-পরিচ্ছেদ হিসেবে যোগ করেছি। আমি চিত্রবিশারদ নই। রঙ তুলির ভাষা একবর্ণও বুঝি না। যাঁরা প্রতিষ্ঠিত শিল্প-সমালোচক ও শিল্প-ইতিহাস-বিশারদ, তাঁদের লেখালেখি থেকে কথা ধার করে প্রাক-পরিচ্ছেদ রচনা করেছি। যখন আমরা জেনে যাই যে ১৮৩১ সালে ব্রাশ ক্লাবের উদ্যোগে কলকাতায় প্রথম চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল ও সেই আয়োজনে দ্বারকানাথ ঠাকুর একাধিক ছবি তাঁর সংগ্রহ থেকে দিয়েছেন, আমরা বুঝতে পারি, ঠাকুর বাড়িতে ছবির রসিকজন নিশ্চয়ই আগামী দিনে জন্মাবেন। শুধু রসিকজন কোথায়? এক একজন স্রষ্টা জন্মালেন। অবন ঠাকুর সবার সেরা। গগন ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথতো রয়েছেন-ই। ফলে রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় বিদ্যাচর্চার অঙ্গনে যে চিত্রশিল্প যথাযথ মর্যাদা লাভ করবে, বুঝতে আমাদের বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় না।

যে যাই বলুন, বিশ্বভারতীর আন্তর্জাতিক খ্যাতির আড়ালে যে দুই ভবনের কথা বারবার উঠে আসে তাদের নাম কলাভবন ও সঙ্গীতভবন। আমাদের

ভাবতে ভালো লাগে, শিল্পচর্চার এমন এক প্রতিষ্ঠানে ধীরেনকৃষ্ণ তাঁর জীবনের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছেন। শ্রদ্ধানির্মিতির পরিসর সূচিপত্রের প্রকৃতি দেখে গভীরমনস্ক পাঠক উপলব্ধি করতে সমর্থ হবেন। চিত্রকলার সংক্ষেপ-ইতিহাসের পর আমরা শিল্পীর জীবন আখ্যান কালক্রমের অনুশাসন মেনে রচনা করেছি। অনেক 'না-বলা-বাণী' শিল্পী ধীরেনকৃষ্ণের নিজস্ব রচনা থেকে প্রকাশিত হবে। তাঁর রচনাশৈলী অনবদ্য। সাধু ও চলিত উভয় ভাষাতেই তিনি সিদ্ধহস্ত। তার পরিচয় আমরা এখানে দেব।

ধীরেনকৃষ্ণের নিজের নানা স্মৃতিচারণায় কিছু কিছু আখ্যান বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। ছন্দ ও তালের লয়ের কথা ভেবে হাত দিইনি।

রচনাও তাঁর বিচিত্রপন্থী। ত্রিপুরার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক বিষয়ক রচনা আমাদের দিতেই হয়েছে। স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথের ছবি ফুটে উঠেছে তাঁর অন্য রচনায়। আশ্রমশিক্ষার অনুভূতি যোগ হয়েছে। যোগ হয়েছে কলাভবনের স্মৃতিচারণ। এই স্মৃতিচারণ থেকে ধীরেনকৃষ্ণের 'বড়ো হওয়া' আমরা বুঝতে পারি। অগ্রজ ও সমকালীন শিল্পীদের নিয়ে ছোট ছোট যে জীবনালেখ্যগুলি শিল্পী রচনা করেছেন, আমরা এখানে সন্নিবদ্ধ করেছি। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, অসিতকুমার হালদার, সুরেন্দ্রনাথ কর, নন্দলাল বসু, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিনোদবিহারী, রামকিঙ্কর সবাই এখানে রয়েছেন।

ত্রিপুরার প্রথিতযশা চিত্রশিল্পী শৈলেশচন্দ্র দেববর্মাকে নিয়ে তাঁর একটি নিবন্ধ আমরা এখানে যোগ করেছি।

শিল্পের বাইরেও নানা জগতের মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। এই নিয়ে তাঁর লেখাও অনেক। আমরা শুধু দু'জনের কথা (কালীমোহন ও ক্ষিতিমোহন) নিলাম। শিল্প ও শিল্পতত্ত্ব বিষয়েও ধীরেনকৃষ্ণ লিখেছেন। প্রতিনিধিত্বমূলক একটি রচনাই গ্রহণ করা হল। ভারতীয় শিল্পী ও ইয়োরোপীয় মডার্ন আর্ট। আর যোগ করেছি আমরা তাঁর একটি ভ্রমণকাহিনি ' মহামৌনী হিমালয় তীর্থের দ্বার হরিদ্বার। পাশাপাশি রেখেছি পত্রসাহিত্য 'বিলাতের পথে'। এই ভ্রমণবিবরণীতে শিল্পীর রসবোধের স্পষ্ট দেখা মেলে।

এক ডালি পত্রগুচ্ছের সংযোজন এই গ্রন্থকে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করেছে। রবীন্দ্রনাথ রয়েছেন। নন্দলাল বসু খুব বড়ো পরিসরে রয়েছেন। রয়েছে শৈলেশচন্দ্র দেববর্মার কাছে লেখা শিল্পীর অপ্রকাশিত আটটি চিঠি। চিঠির উল্টোপিঠে অঙ্কিত আটটি ছবিও এই বইয়েই প্রথম মুদ্রিত হল। এমন সম্পদ প্রাপ্তির জন্য আমি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সচিব শ্রী সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় ও আকাদেমি সংগ্রহশালার কর্মীদের কাছে আমার ঋণস্বীকার

করছি। শৈলেশচন্দ্রের বাইরে আমরা আরও একগুচ্ছ অপ্রকাশিত চিঠি এই বইয়ে দিলাম। ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে অগ্রজ সলিলকৃষ্ণ ও প্রাঞ্জলকৃষ্ণের কাছে লেখা চিঠি আমাকে দিয়েছেন শিল্পী ধীরেনকৃষ্ণের নিকট আত্মীয় স্নিগ্ধচরিত্রসম্পন্ন সুলেখক ধবলকৃষ্ণ দেববর্মন। শুধু তাই নয়, তাঁর সংগ্রহ থেকেই আমি 'রবি' পত্রিকার ধীরেনকৃষ্ণ কৃত তিনটি প্রচ্ছদ পেয়েছি। শিল্পীর কুলজি নির্মাণে সহায়তা করেছেন শিল্পীর নিকটাত্মীয়া শ্রদ্ধেয়া বাণী দেববর্মন। ত্রিপুরার বিস্ময়-সংগ্রাহক পল্টুদা (রমাপ্রসাদ দত্ত) তাঁর গবেষণাগার আমাকে অকৃপণভাবে ব্যবহার করতে দিয়েছেন। তাঁর কাছ থেকে একাধিক রচনা ও ভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী রচিত 'ছোটদের রাজমালা' (যা একসময়ে ত্রিপুরার বিদ্যালয়ে পাঠ্য ছিল) বইয়ে ধীরেন্দ্রকৃষ্ণের অঙ্কিত ছবিটি সংগ্রহ করেছি। বন্ধুসাহিত্যিক নন্দকুমার দেববর্মার কাছে লেখা ধীরেনকৃষ্ণের একটি চিঠি আমায় তিনি প্রকাশ করতে দিয়েছেন। এমন সম্পদ উইপোকার হাত থেকে পরিত্রাণ পায়নি। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পংক্তি রয়েছে বলে এই চিঠি প্রকাশের লোভ সংবরণ করতে পারিনি।

শান্তিনিকেতন কলাভবনে শিল্পীর মোট আটাশটি চিত্র সংগৃহীত রয়েছে। সেই সংগ্রহ পরিচিতি আমরা এই বইয়ে যোগ করেছি। এই কাজে আমাকে কলাভবনের অভয়কুমার দাস ও মৃদুলা সরকার বন্দ্যোপাধ্যায় আন্তরিকভাবে সহায়তা করেছেন।

ত্রিপুরায় প্রশংসনীয় এক উদ্যোগের নাম ছিল 'গ্যালারি ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ'। যদিও এমন উদ্যোগ বাঁচিয়ে রাখা যায়নি। ধীরেনকৃষ্ণ তাঁর নামে এমন গ্যালারি স্থাপনের পরিকল্পনায় সায় দিয়েছিলেন, ভাবতে আমাদের ভাল লাগছে। গ্যালারি সম্পর্কিত একাধিক নথিপত্র (সংবাদপত্রের টুকরো টুকরো খবর সহ) এই বইয়ে আমরা যোগ করেছি। আগামী প্রজন্মের অনুপ্রেরণার জন্য এমন প্রচেষ্টা লিপিবদ্ধ থাকুক। এই তথ্য উদ্ধারে আমি শিল্পী স্বপন নন্দী, সম্পাদক সমীরণ রায় ও সংস্কৃতি-কর্মী আশিস বর্ধনের সহযোগিতা পেয়েছি।

নানাভাবে আমার উপকার করেছেন প্রবীণ আলোকচিত্রী রবীন সেনগুপ্ত, ভাষাগবেষক কুমুদ কুন্ডুচৌধুরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, সাংবাদিক-গবেষক কমল চৌধুরী, কলাভবনে ধীরেনকৃষ্ণের ছাত্রী সংঘমিত্রা নন্দী ও দীপঙ্কর আম্বুলী।

যাঁর কথা না বললেই নয় তিনি নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। এই 'জ্ঞানাগ্রাসী' যুবকের সঙ্গে বন্ধুত্ব না হলে এমন কাজ আরও বহুকাল অপ্রকাশিত থাকত। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে একাধিকবার শিল্পীপুত্র শ্রদ্ধেয় প্রণবকৃষ্ণ দেববর্মার কাছে

শান্তিনিকেতনে গিয়েছি। নীলাঞ্জন তাঁর ক্যামেরা দিয়ে আমাকে ধীরেনকৃষ্ণের অঙ্কিত চিত্রগুলি তুলে দিয়েছেন যা এই বইয়ে আমরা ছাপতে পারলাম। দুজনের ছিল দাদু-নাতি সম্পর্ক। ধীরেনকৃষ্ণের সাক্ষাৎকারটি নীলাঞ্জন যখন নিয়েছিলেন তখন তাঁর কিশোর বয়স অতিক্রান্ত হয়নি।

'বিশ্বভারতী গবেষণা-প্রকাশন' থেকে প্রকাশিত 'স্মৃতিপটে' বইটি বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগের কর্মী ও এই সময়ের বিশিষ্ট ছড়াকার বন্ধু শমীন্দ্র ভৌমিক সংগ্রহ করে দিয়েছেন। দুই ভাই প্রদ্যুৎ ও প্রণব সাহা প্রথমবারেই প্রায় নির্ভুল অক্ষরবিন্যাস করেছেন। পাণ্ডুলিপি থেকে পুস্তক নির্মাণে খুব বেশি বিরক্তি উৎপাদনের সুযোগ দেননি। দুই মৃদুভাষী বন্ধু তাপস মিত্র ও দেবাশিস রায় মাথায় জেদ চাপিয়েছিলেন, কত কম সময়ে যথাসাধ্য নির্ভুলভাবে এই বইয়ের নানা ছবি ও প্রচ্ছদের ফিল্ম প্রস্তুত করা যায়। মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের কাজে যুক্ত বন্ধুদেরও এই সুযোগে কৃতজ্ঞতা জানাই। বন্ধু অসিত সাউ ও পরেশনাথ মোদকের নাম আমাকে আলাদা করে বলতেই হয়।

বন্ধু শুভব্রত বিষয়ে আর কি বলব! মাঝে মাঝে এমন করে তথ্যসংগ্রহ আর নথিপত্রের অনুসন্ধানে সে ঘুরে বেড়িয়েছে, মনে হচ্ছিল, খানিকটা অর্থ স্বচ্ছলতা থাকলে আমাদের দুজনের বিপরীত ভূমিকা গ্রহণ করলেই মানানসই হত।

ধীরেনকৃষ্ণের লেখালেখিতে আমরা একাধিক শব্দের বিভিন্ন বানান লক্ষ করেছি। তাঁর সময়ে দীর্ঘ ই-কারান্ত শব্দের বাহুল্য ছিল যেই ভার আজ সারস্বত নানা প্রতিষ্ঠানের পরামর্শে লঘু হয়ে এসেছে। আমরা শিল্পীর রচনায় বানানের কোন রূপান্তর ঘটাইনি। ফলে কিছু শব্দের বেলায় পাঠক ভিন্ন বানান দেখতে পাবেন।

শুভার্থীরা জানেন, স্ত্রী পুত্র নিয়ে ঘর সংসার করি। ঘর সংসার করি কি আদৌ? কতটা গুণপনা থাকলে আমার গৃহিণী আর পুত্র আমাকে নানা অবশ্যপালনীয় কর্তব্য থেকে অব্যাহতি দিতে পারেন, ভেবে কূল কিনারা পাই না।

সবশেষে বলব, বেঁচে থাকুন চিত্রকর ধীরেনকৃষ্ণ সকলের মনে—এমন অভীপ্সা থেকে আমাদের এই জন্মশতবর্ষ শ্রদ্ধার্ঘ। সমধর্মীরা পাশে থাকবেন, নিশ্চিতভাবেই জানি।

বাংলা চিত্রকলার দু'চার কথা

অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা। পালরাজা প্রথম মহীপালদেবের সময়ে নালন্দা মহাবিহারে এই নামে একটি পুঁথি লেখা হয়। আনুমানিক ৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে। এই পুঁথি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রহে রয়েছে। পুঁথির ভেতর রয়েছে বারোটি রঙিন ছবি। কি দাম এদের? এককথাতেই উত্তর মেলে। বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরোনো ছবি। চিত্রসমালোচকেরা বলেন, ছবিগুলো এমন নিপুণ যে কোন অতীত ইতিহাস ভিন্ন এমন চিত্রশিল্প অঙ্কিত হতে পারে না। ইতিহাস খুঁজে না পাওয়া গেলেও আলোচিত বারোখানা ছবিকেই আমাদের বাংলার প্রথম চিত্রকলা বলে ভাবতে হয়। পাল রাজাদের সময়ে চিত্রকলা কি নিষ্ঠার সঙ্গে চর্চিত হয়েছে আমরা সরসীকুমার সরস্বতীর 'পালযুগের চিত্রকলা' বই থেকে জানতে পারি।

পালযুগের আগে গুপ্তযুগেও চিত্রকলা উপেক্ষিত ছিল না। বাঘ, অজন্তা ও বাদামীর গুহাচিত্র দেখলে তা বোঝা যায়।

পালরাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। ঔদার্য ও সহিষ্ণুতা এঁদের বৈশিষ্ট্য ছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন ও বর্মন রাজাদের সময়ে চিত্রকলার মুক্ত বিকাশ ঘটেনি। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বখতিয়ার উদ্দীন খলজির আমলে শিল্পচর্চা বিন্দুমাত্র এগোল না। বরং বাংলার বহু শিল্পকর্ম নেপাল ও তিব্বতে চলে যায়।

চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে যখন সুলতানী শাসন শুরু হয়, বাংলা তার নিজস্ব সত্তা ফিরে পায়। দেশজ সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী সুলতান-রাজাদের উদার সহযোগিতায় বাংলার শিল্প ও স্থাপত্যকর্ম বিশেষভাবে বিকশিত হয়েছিল। গৌড়ের সুলতান নসরৎ শাহের শিল্পপ্রীতির কোন তুলনা ছিল না। গৌড়রাজ হুসেন শাহের সময়ে শিল্পচর্চা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় যুক্ত হয়ে যায়। বিষ্ণুপুরের রাজাদের কাছেও কলাশিল্পের চর্চা আদরনীয় বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়েছে। পাটাচিত্রতো (কাঠের ফলকে চিত্রকর্ম) ওই সময়েরই ফসল। বাংলার চিত্রকলা আলোচনায় মুর্শিদাবাদ শৈলীর কথাও উল্লেখ করতে হয়। মুঘল শৈলী ও কোম্পানি শৈলী—দুই শৈলীর চিত্রকলাই মুর্শিদাবাদের নবাব আমলে চর্চিত

হয়েছে। উনিশ শতকের শুরু থেকে প্রায়, মুর্শিদাবাদের চেয়ে কলকাতার গুরুত্ব বাড়তে থাকল। ১৭৭৪ সালে কলকাতা ব্রিটিশ-ভারতের রাজধানী ঘোষিত হয়েছিল। তারপর থেকেই ধীরে ধীরে কলকাতার অপরিহার্যতা বাড়তে থাকে। একগুচ্ছ পেশাদার ব্রিটিশ-চিত্রকর সে-সময় মাদ্রাজ আর কলকাতায় এসেছিলেন। এঁরা এঁদের নিয়মমতোই তেলরঙে ছবি আঁকতেন। বাংলার চিত্রকলা আলোচনায় এই শিল্পীরা স্মরণযোগ্য, কেননা এদের অঙ্কনরীতির প্রকৃতি ভারতীয় চিত্রশিল্পীদের প্রভাবিত করেছিল।

১৮৩১ সালে ব্রাশ ক্লাব (Brush Club)-এর উদ্যোগে কলকাতার টাউন হলে প্রথম চিত্রপ্রদর্শনী আয়োজিত হয়। ডিরোজিও, দ্বারকানাথ ঠাকুর, শ্রীনাথ ঘোষাল প্রমুখ উল্লেখ্য মানুষদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে সেই প্রদর্শনীতে ছবি টানানো হয়েছিল। পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুর, বর্ধমানের রাজপরিবার ও পাইকপাড়ার মহারাজা প্রচুর ছবি সংগ্রহ করেছিলেন। ঠাকুর পরিবারের চিত্রকলাপ্রীতি বহু আগে থেকেই চোখে পড়ে। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ব্রিটিশ শিল্পী মার্শাল ক্ল্যাক্সটনকে দিয়ে দেবেন্দ্রনাথ নিজের ও কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রতিকৃতি অঙ্কন করিয়েছিলেন—এমন কথা আমাদের মনে রাখতেই হয়।

এখন যাই হোক, একসময় তেলরং ছিল বিদেশিদের ছবি আঁকার মাধ্যম। আমাদের দেশে প্রথম দিকে এই মাধ্যমে ছবি আঁকার প্রচলন ছিল না। আঠারো শতকের কলকাতা আর উনিশ শতকের শুরুর কলকাতায় যে সকল সাহেব শিল্পী ছবি আঁকতেন তাঁদের অনেকেই ধনীগৃহে 'প্রতিকৃতি' এঁকে ভাল পরিমাণ অর্থ রোজগার করেছেন। তবে সকল শিল্পীই অর্থকে প্রধান বিবেচনায় আনতেন না। নিজেদের ভালো লাগার বিষয় নিয়েও কাজ করতেন। তা না হলে চিত্রশিল্প 'সংস্কৃতি'র অন্যতম উপাদান হত কেমন করে?

তেলরঙের ছবি কলকাতার আবহাওয়ায় ভাল থাকছিল না। একদল শিল্পীকে আমরা দেখেছি তাই, তেলরং ছেড়ে হাতির দাঁতের উপর জলরঙে কাজ করছেন। হাতির দাঁতের উপর মিনিয়েচার অঙ্কনে প্রথমেই আমাদের যাঁর নাম উচ্চারণ করতে হয় তিনি জর্জ চিনেরি। কলকাতায় তিনি ছিলেনও বেশিদিন। প্রায় দেড় দশক। প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন চিনেরি। ইউরোপের কেমন ছবি, কার ছবি কিনতে হবে, এই বিষয়ে পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরকে উপদেশ দিতেন তিনিই।

এবার আমাদের বলতে হয় জলরং ছবির কথা। প্রকৃতি ও সাধারণ মানুষজন জলরঙে ছবি আঁকিয়ে শিল্পীদের মধ্যে গুরুত্ব পেয়েছে। কলকাতায়

এই মাধ্যমের প্রথম সার্থক চরিত্র উইলিয়াম হজেস। জলরঙে যাঁরা ছবি আঁকেন, তাঁরা চাইলে পরে এই ছবি থেকে খোদাই, জলছাপ বা লিথো করে ছাপাই ছবির অ্যালবাম তৈরি করতে পারেন। করেছেনও অনেকে তাই। হজেস বের করেছিলেন 'সিলেক্ট ভিউজ অফ ইণ্ডিয়া (১৭৮৩)।' প্রচুর টাকা পেয়েছিলেন।

হজেসের পর আমাদের মনে পড়ে যায় ড্যানিয়েলদের কথা। টমাস ড্যানিয়েল। উইলিয়াম ড্যানিয়েল। কাকা ভাইপো দু'জনায়। এখনও পুরোনো কলকাতা নিয়ে ড্যানিয়েলদের ছবি দেখলে মন অনাস্বাদিত ভালো লাগায় ভরে যায়। আট বছর এঁরা দুজন কলকাতায় ছিলেন। দিনরাত খাটতেন। পয়সাও পেয়েছেন তেমন। তাঁদের বই 'টুয়েলভ ভিউজ অফ ক্যালকাটা', ওরিয়েন্টাল সিনারি' ও 'পিকচারেস্ক ভয়েজ অফ ইণ্ডিয়া'। পুরোনো বইয়ের ফুটপাত দিয়ে হেঁটে গেলে কচিৎ কদাচিৎ এমন টাইটেল চোখে পড়ে যায়।

ওই সময়ে আরও বেশ ক'জন সার্থক চিত্রকর ছিলেন। দু'জন মহিলা চিত্রশিল্পী রসিকমহলে সেসময় পরিচিতি পেয়েছিলেন। ওই সময়কার শিল্পীদের নানা কাজ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সংগ্রহে গেলে এখনও দেখা যায়। বেশ ক'জন সাহেব-সুবোর নাম বলেছি আমরা। দেশের মানুষদের শিল্পী হিসেবে পরিচিতি পাওয়া গেল কোথায়? প্রথমে আমরা তিনজনের নাম বলব। জৈনুদ্দিন, ভবানী দাস ও রাম দাস। ভাইসরয়দের লেডিরা এদেশের নানা পশুপাখির ছবি এঁকে দিতে জৈনুদ্দিনদের কাজে লাগিয়েছেন। সত্যিই বলব, শিল্পী হিসেবে সেসময় জৈনুদ্দিনের কোন তুলনা ছিল না। বহু চেনা অচেনা পশুপাখির ছবি এঁকেছেন জৈনুদ্দিন।

ধীরে ধীরে আরো মানুষ এগিয়ে এলেন। শবপুর বোটানিক্যাল গ'র্ডেনে গিয়ে শিল্পীরা ফুল লতাপাতার ছবি আঁকতে থাকলেন। ব্যারাকপুরে সেসময় একটা ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম ছিল। ওই মিউজিয়ামে জন্তু-জানোয়ারের ছবি এঁকে দেবার জন্যও শিল্পীরা আমন্ত্রিত হতেন। মুঘল নিয়মে যেমন ঘন জলরং-এর সমাদর বেশি ছিল, ইংরেজ নিয়মে তা স্বচ্ছ জলরঙে পৌঁছে যায়।

যেত না। ছবির চরিত্রে বদল না হোক, ছবির মাধ্যম ও প্রকরণে বদল ঘটতে থাকল। বোর্ডে ছবি আঁকা কমতে থাকল। বিদেশি সাদা কাগজে ছবি আঁকা বেড়ে চলল। ইতিহাসে ধারাবাহিকতা মানতে হয়, নইলে সত্যি বলতে কি, এইসব কাজ চিত্রশিল্পের আওতায় পড়ে না। আঠারো আর উনিশ শতকের গোড়ায় ছবির রাজধানী দুই। মুর্শিদাবাদ আর কলকাতা। নবাবদের মুর্শিদাবাদ। ইংরেজদের কলকাতা। শহরের বাইরে বিশাল গ্রামবাংলায় চিত্রকলার চর্চা তখন কেমন ছিল?

প্রথমে বলে নেওয়া ভাল, গ্রামের মানুষ এমন জমির উপর ছবি আঁকতেন যা বেশিদিন টিকে থাকত না। ফলে খুব বেশি পুরোনো সংগ্রহ পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় তার বেশির ভাগ ছবিই বৈষ্ণব ভাবনায় আধারিত। পাটায়, পটে ও মন্দিরের গায়ে এসব ছবি আঁকা হয়েছে। শুধুমাত্র চৈতন্যদেব ও তাঁর পারিষদদের নিয়ে যে কত ছবি আঁকা হয়েছে, হিসেব নিকেশের ভেতর আনা যায় না। ছবি আঁকার ধরন কি? মুঘলদের শৈলীই বেশি।

বাংলার পটচিত্র শিল্পকলার ইতিহাস চর্চায় এক উল্লেখ্য স্থান অধিকার করে রয়েছে। পট ও পটুয়াদের বিষয়ের গভীরে আমরা যত যেতে চাই, ততোই আমাদের বিস্মিত হতে হয়। কথায় কথায় মনে পড়ে যায়, মাস্টারমশাই নন্দলাল বসু তাঁর প্রিয় ছাত্র ধীরেনকে শান্তিনিকেতন থেকে ১৯৫০ সালের ৩১ শে আগস্ট এক চিঠিতে লিখেছিলেন, 'ফটোগ্রাফে প্রকৃতির বস্তুর খুঁটিনাটি হুবহু নকল করা যায়। কিন্তু যত ভাল ফটোগ্রাফই হউক তাহা ছবি নয়।' এমন কথা আমাদের পটচিত্রের বেলায় বেশি করে মনে পড়ে।

বাংলাদেশে ব্রতচারী আন্দোলনের মানুষ গুরুসদয় দত্ত (১৮৮২-১৯৪১) ও 'বৃহৎবঙ্গ' খ্যাত আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯) প্রচুর পটচিত্র সংগ্রহ করেছিলেন। গুরুসদয় দত্ত লিখছেন, '...পটের ছবি পশ্চিমি এক্সপ্রেশনিস্টদের ভাবনায় সিঞ্চিত। ফোটোগ্রাফির অনুকরণ নেই' (Folk Arts and Crafts of Bengal : The collected papers)। ১৯৩৩ সালে শ্রীদত্ত এমন অভিমত পেশ করেছিলেন। গুরুসদয় দত্ত ও নন্দলাল বসুর ভাবনা থেকে আমরা পটচিত্রের উৎকর্ষ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে পারি। পটের বিষয় কোন গণ্ডিতে বাঁধা নেই। ধর্ম ও সামাজিক উভয় বিষয়ই উঠে এসেছে পটচিত্রে। একক বর্ণের জোরালো রেখা টেনে পটচিত্রের অবয়ব তৈরি হয়। শুধুমাত্র লাইন ড্রয়িং-এর বেলাতেও পটুয়ারা আধুনিক লাইন ড্রয়িং ভাবনাকে টেক্কা দিতে পারেন। 'গলদা চিংড়ি মুখে বেড়াল' একটি বিখ্যাত পটচিত্র।

চিংড়িমুখে বেড়াল ঃ কালীঘাটের পটচিত্র

চিংড়ির চেহারা জটিল। বেড়ালের চেহারাও তাই। পাঠক দেখুন, ক'টা মাত্র জোরালো রেখায় কি অপূর্ব ব্যঞ্জনা গড়েছেন কালীঘাটের কোন অখ্যাত (!) পটুয়া। এই চিত্রের বিকাশে একটা লোকায়তিক ভাবনা কাজ করেছে বলেই হয়তো সার্থক শিল্পীদের ব্যক্তি-পরিচিতি বড় করে দেখা দেয় না।

১৮৩১ সালে কলকাতায় প্রথম চিত্র প্রদর্শনীর কথা আমরা আগে বলেছি। বলিনি, কলকাতায় প্রথম কবে আঁকা শেখানোর আয়োজন শুরু হয়। ১৮৩৯ সাল। ওই বছর কলকাতায় গড়ে উঠল 'মেকানিক্যাল ইনস্টিটিউশন'। ওখানে সপ্তাহে দু''দিন ছবি আঁকা শেখানো হত। কে শেখাতেন? কোল্‌সওয়ার্দি গ্র্যান্ট। প্রথমে কলকাতা টাউন হলে ক্লাস শুরু হয়েছিল। বেশিদিন বেঁচে থাকেনি এই স্কুল। তবে একটা ভাবনা গড়ে দিয়ে যায় যা পরে কাজে লাগে।

১৮৫১ সাল। লন্ডনে এক বিশাল প্রদর্শনী সংগঠিত হয়। 'গ্রেট একজিবিশন'। আমাদের দেশ থেকেও প্রচুর সৃষ্টিকর্ম লন্ডনের প্রদর্শনীতে দেখানো হয়। সাড়া পড়ে যায়। তিন বছর পর ১৮৫৪ সালে কলকাতায় 'সোসাইটি ফর দি প্রমোশন অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট' গড়ে ওঠে। শুধু 'আর্ট' নয় কিন্তু, 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট'। সভাপতি হলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার গুডউইন সাহেব। যুগ্মসচিব প্রাট সাহেব ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সুর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ, রামচন্দ্র মিত্র, প্যাঁরিচাদ মিত্র ও প্রতাপচন্দ্র সিংহ। সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী (১৮২৪-১৮৭৪) ছিলেন অনাথ। গরীব। অবর্ণনীয় লড়াই করে খ্যাতনামা চিকিৎসক হয়েছিলেন। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের প্রথম ভারতীয় প্রধান চিকিৎসক। মেডিক্যাল কলেজের বাইরে চিকিৎসা করতেন না। সমাজসেবামূলক কাজে জড়িয়ে ছিলেন। ১৮৭৪ সালে বিলেতে মারা যান। রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-১৮৬৮) হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর ছাত্র। অসামান্য বাগ্মী। সার্থক ব্যবসায়ী ও সমাজসংস্কারক। প্রচুর প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত সাহায্য করেছেন। বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠায় তাঁর প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছিল। আইন ও আদালতে ভারতীয়দের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার ছিলেন। নীলকরদের বিরোধিতা করায় অ্যাগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটির সহ-সভাপতি পদ থেকে অপসারিত হন। কুসংস্কার অপসারণের আমরণ যোদ্ধা, 'ইণ্ডিয়ান ডিমস্থিনিস্' বলতে আমরা তাঁকেই বুঝি।

রামচন্দ্র মিত্র (১৮১৫-১৮৭৪) হিন্দু কলেজে পড়েছেন ও অধ্যাপনা করেছেন। পক্ষিতত্ত্ববিশারদ। তাঁর লেখা বই 'পক্ষীর বিবরণ'। দ্বিতীয় পর্যায়ে

'পশ্বাবলী' মাসিক পত্রিকা পরিচালনা করেছেন। পাঠ্যসূচিনির্ভর তাঁর একাধিক বই রয়েছে।

প্যারীচাদ মিত্র (১৮১৪-১৮৩৩)-কে আমরা সবাই চিনি। তিনিও হিন্দু কলেজের ছাত্র। কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক ছিলেন। প্রচুর জনকল্যাণমূলক সংস্থায় জড়িত ছিলেন। বহু পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি করতেন। টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে 'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৪-১৮৫৬)-য় তিনি ধারাবাহিকভাবে বাংলার স্মরণীয় উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল' রচনা করেন। প্রতাপচন্দ্র সিংহ (১৮২৭-১৮৬৬) পাইকপাড়া রাজপরিবারে দত্তকপুত্র ছিলেন। 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা'র প্রতিষ্ঠতা। বিদ্যাসাগরের নিবিড় বন্ধু ছিলেন তিনি। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কাজ তাঁর দেয় পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে শুরু হয়েছিল।

যে ক'জন মানুষের সংক্ষেপ-পরিচয় আমরা এখানে দিয়েছি, এঁরা নিজেরা কেউই চিত্রশিল্পী ছিলেন না। সংস্কৃতির সর্বার্থ সাধক ছিলেন। ফলে সমাজে যে বিষয়ের প্রচার ও প্রসার অপরিহার্য বলে তাঁদের মনে হয়েছে, চিত্রকলা অন্যতম। সোসাইটির উদ্যোগে 'বিখ্যাত ধনী হীরালাল শীলের বাড়িতে এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় (শিল্প ও শিক্ষা, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়)।' নাম দেওয়া হয় 'স্কুল অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট'। প্রতিষ্ঠা দিবস ১৬ই আগস্ট, ১৮৫৪। স্থানসংকুলানের জন্য স্কুল প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও তাঁর ছোটভাই ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের গরাণহাটা বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। সিংহসহোদর বিনিময়ে কোন ভাড়া দাবি করেননি। পরে স্কুলটিকে (নভেম্বর মাস নাগাদ) কলুটোলায় শীলের কলেজ নামে মতিলাল শীলের বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। স্কুলে কী শেখানো হত সেসময়, আমরা একটা তালিকার উল্লেখ করতে পারি।

1. Elementary Drawing; drawing from models and natural objects and architectural drawing;
2. Etching, Engraving on wood, metals and stone;
3. Modelling, including pottery.

প্রথম বছরে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ছিল পঁচানব্বই। অঙ্কনশিল্পে পঞ্চাশ জন। মূর্তি গড়ার কাজে পঁয়তাল্লিশ জন। স্কুলে অঙ্কনশিল্পের শিক্ষক ছিলেন M. Agyer ও মোলডিং আর মডেলিং-এর শিক্ষক ছিলেন M. Regaud;

১৮৫৫ সালে ওই স্কুলের পাশাপাশি সংগীত স্কুল তৈরির পরামর্শ এসেছিল। কার্যকরী হয়নি। বরং বলা হল আর্ট স্কুলে আরও নতুন তিনটি বিষয় খোলা হবে।

কি কি বিষয়?

1. Modelling and Moulding Department
2. Engraving and Lithographic Department
3. Department of Higher Drawing and Painting.

যে কোন বিভাগে ছাত্রদের মাস মাইনে ছিল আড়াই টাকা। তবে ছাত্রদের তৈরি শিল্পকর্ম বিক্রি হলে যে টাকা পাওয়া যাবে তার একটা ভাগ ছাত্রদেরই ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

কিছুদিন পর স্কুলের আর্থিক সংগতি কমতে থাকে। ছাত্রসংখ্যাও কমে যেতে থাকে। ১৮৫৮ সালে স্কুল পরিদর্শক লেফটেনান্ট উইলিয়ামস এই স্কুল বিষয়ে সরকারের কাছে যে অভিমত জানিয়েছিলেন তা নিচে দেওয়া হল।

'I am disposed to recommend Government to undertake the entire management of the school connecting it perhaps in some way with the C. E. College and looking to it to ultimately become a normal school for native drawing masters.'

তখন বাংলায় রয়েছেন বড়লাট সিসিল বিডন। তাঁর কাছে স্কুলটিকে রক্ষা করার আবেদন গেল। তিনি আগ্রহী হন। বিলেত থেকে একজন দক্ষ প্রশাসক এনে বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হবে। যেমন ভাবনা তাই হল। লন্ডন স্কুল অফ ডিজাইনের সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছে একজন লোক চেয়ে পাঠানো হল। তিনি যাঁকে পাঠালেন তাঁর নাম হেনরি হোভার লক। বিনোদবিহারী এক জায়গায় লিখেছেন, '...অনিশ্চিত অবস্থা থেকে শিল্পবিদ্যালয়কে উচ্চাঙ্গের আর্টস্কুলে পরিণত করার জন্য অধ্যক্ষ H. H. Locke-এর কৃতিত্ব স্মরণীয়।'

১৮৬৪ সালের ২৯শে জুন লক আর্টস্কুলে যোগ দেন। ছেলেদের সংখ্যা তখন তেরোয় নেমে এসেছে। লক এসে শুরুতেই স্কুলটিকে দু'ভাগে ভেঙে দিলেন। একভাগে রইল ফাইন আর্ট। অন্য ভাগে অ্যাপ্লায়েড আর্ট। ইউরোপীয় পদ্ধতিতে শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন অধ্যক্ষ লক। Oil Painting, Water Colour drawing, Cast drawing, Life study, প্রতিকৃতি অঙ্কন—এগুলি ছিল চিত্রকলা বিভাগের ছাত্রদের শিক্ষার বিষয়।

Modelling বিভাগের ছাত্রদের ছাঁচ নেওয়া বিশেষভাবে শেখাবার ব্যবস্থা ছিল। Free-hand drawing, মেকানিক্যাল ড্রয়িং, আলংকারিক নক্‌শার নকল এগুলি আবশ্যিক ছিল।

বলতেই পারি আমরা, ১৮৭৬ সালে ২১০ নং বৌবাজার স্ট্রিটে যে বিজ্ঞানভাবনা চর্চার কথা বলেছিলেন মহেন্দ্রলাল সরকার ও ফাদার লাঁফো, বারো বছর আগে একই অভিজাত ভাবনা নিয়ে অধ্যক্ষ লক আর্ট স্কুলের মর্যাদা বাড়িয়েছিলেন। শুধু নন্দনতত্ত্বের চর্চা নয়, নানা প্রয়োজনেও এই স্কুলের দরকার ছিল। মিউজিয়াম, বোটানিক্যাল গার্ডেন, এশিয়াটিক সোসাইটি, মেডিক্যাল কলেজ—এদের নানারকম নকসা, চার্ট, প্লাস্টারের ছাঁচ দরকার হত। ফলে এনগ্রেভিং আর লিথোগ্রাফ বিভাগের কাজের অভাব ছিল না।

ভাবতে ভালোই লাগে, বিজ্ঞানচর্চার নবধারাপাত যেমন ২১০ নং বৌবাজার স্ট্রিট, চিত্রশিল্পচর্চার নবধারাপাতের নতুন ঠিকানা হয়েছিল ১৬৬ বৌবাজার স্ট্রিট। পাঠক্রম তৈরি হল। পরিচালনায় শৃঙ্খলা আরও বেশি গুরুত্ব পেল। তবু বলা ভাল, 'শিক্ষার্থীর চিন্তা বা কল্পনাশক্তিকে সমৃদ্ধ করে তাকে মননশীল শিল্পী হিসাবে গড়ে তোলার কোনো পরিকল্পনা এই পাঠক্রমে ছিল না।' (বাংলার চিত্রকলা, অশোক ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা ১১০)।

বাংলাদেশের ছেলেরা শুধুই মাত্র অনুকরণে দক্ষ, এমন সংকীর্ণতাবোধ লকের ছিল না। তিনি তাঁর নানা প্রতিবেদনে এমন কথা বলেছেন। সত্যিই সাহস দেখালেন তিনি। সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারে ফিরে তাকালেন না। অন্নদাপ্রসাদ বাগচী, শ্যামাচরণ শ্রীমানী ও আর. বি. লসনকে শিক্ষকের দায়ভার দিলেন। বিডন, টেম্পল ও নর্থব্রুক—এঁরা সবাই সেদিন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় এমন কি কলকাতার বাইরে বিভিন্ন শিল্প ও স্থাপত্যকর্মে লক তাঁর ছাত্রদের পাঠাতেন। ফোর্ট উইলিয়ামের সেন্ট পিটার্স চার্চ, রাজভবনের দরবার হল এভাবেই অলঙ্কৃত হয়েছে। একাধিক ধ্রুপদী বইয়ের অলঙ্করণ করেছেন তাঁর ছাত্রেরা। বিলেতের প্রদর্শনীতে ছবি পাঠিয়ে ভীষণ প্রশংসা অর্জন করেছেন।

অন্য জিজ্ঞাসায় যাই। কলকাতায় প্রথম আর্ট গ্যালারি কবে তৈরি হয়েছিল? ১৮৭৬ সালে। হ্যাঁ, একই বছরে আমাদের দেশে বিজ্ঞানচর্চার প্রথম গবেষণাগার 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স' গড়ে ওঠে। ঠিকানা আগেই বলেছি, ২১০ বৌবাজার স্ট্রিট। প্রথম আর্ট গ্যালারি আর্ট স্কুলের কাছে ১৬৪/১৬৫ নং বৌবাজার স্ট্রিটে গড়ে উঠেছিল।

লক চাইতেন, ভারতীয় ছাত্রেরা যেন ইউরোপের অন্ধ অনুকরণ করতেই শুধু না শেখে। নিজেদের দেশের ঐতিহ্য নিয়েও যেন এরা চর্চা করে। আঠারো বছর তিনি আর্ট স্কুল দেখাশুনা করেছেন। ভাবতে খারাপ লাগে, মাত্র

আটচল্লিশ বছর বয়সে তাঁর প্রয়াণ ঘটে। তবে ভারতীয়দের বিচারে তিনি কখনও নিন্দিত হননি। সবাই তাঁকে এদেশের শুভার্থী বলেই ভাবতেন। বিখ্যাত 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা লকের জীবনাবসানের পর লিখেছিল,

'তিনি যখন স্কুলে প্রথম পদার্পণ করেন...তখন কামার, কুমার, ছুতার প্রভৃতি শ্রমজীবী শ্রেণীর লোক ভিন্ন ভদ্রবংশীয় সন্তানগণ এখানে শিক্ষালাভ করিতে বড় অগ্রসর হইত না। ...এখন এই বিদ্যালয়ে সদ্বংশীয় ও শিক্ষিত বালকগণের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে।'

হোভার লকের ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নাম করেছিলেন অন্নদাপ্রসাদ বাগচী (১৮৪৯-১৯০৫)। স্কুলে এনগ্রেভিং ক্লাসের ছাত্র ছিলেন অন্নদাপ্রসাদ। পরে পশ্চিমি ধারায় চিত্রাঙ্কনচর্চা করেন। প্রতিকৃতি অঙ্কনে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সমকালীন একাধিক মনীষীর প্রতিকৃতি এঁকেছেন তিনি। যেমন রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ। ১২৯২ বাংলায় শিল্প-বিষয়ক প্রথম বাংলা পত্রিকা 'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি'র তিনি ছিলেন প্রধান পরামর্শদাতা। ১৯০৫ সালে বঙ্গীয় কলা সংসদ তৈরি হয়। তিনি ছিলেন তার প্রথম সভাপতি। রাজেন্দ্রলালের একাধিক বিখ্যাত বই অলঙ্করণের সঙ্গেও তাঁর নাম জড়িয়ে আছে। ১৮৭৮ সালে অন্নদাপ্রসাদ 'আর্ট স্টুডিয়ো' গড়ে তুলেন। এই স্টুডিয়ো থেকে লিথোগ্রাফি করে বহু বহু পৌরাণিক ছবি প্রকাশিত হয়েছে। বিদ্যাসাগর, ভগবতী দেবী, প্যারীচরণ সরকার, বেথুন সাহেবের ছবি অন্নদাপ্রসাদ নিজেই এঁকেছিলেন।

অন্নদাপ্রসাদের সমকালে আরও একজন শিল্পীর নাম তুলনায় কম হলেও আলোচনা হত। তিনি শ্যামাচরণ শ্রীমানী। শ্যামাচরণ কাঠখোদাই, লিথোগ্রাফি ভালো জানতেন। নবগোপাল মিত্রের জাতীয় স্কুলে তিনি শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। ভারত-শিল্পকলা বিষয়ে প্রথম তিনিই নিয়মিত আলোচনা করতেন। তাঁর লেখা একটি নিবন্ধ 'আর্যজাতির শিল্পচাতুরি' সেসময় বেশ হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিল। এই রচনায় শ্যামাচরণ দেশের তরুণ চিত্রকরদের পশ্চিমি অনুকরণ বর্জন করে স্বদেশের ভাবনায় নিজেদের শিক্ষিত হতে অনুরোধ জানান।

লক প্রয়াত হলে আর্ট স্কুলের প্রধান হয়েছিলেন উইলিয়াম জবিন্স। জবিন্স তেলরঙে খুব ভাল প্রকৃতিচিত্র আঁকতেন। নানা প্রদর্শনীতে তিনি নিয়মিত যোগ দিতেন। 'ক্যালকাটা আর্ট সোসাইটি' (১৮৮৯)-র তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তাঁর সময়ে আর্ট গ্যালারি বৌবাজার থেকে চৌরঙ্গীতে চলে যায়।

চিত্রকর গিলার্ডি প্রায় দুই দশক ছাত্রদের কাজ শিখিয়েছেন। তিনি আর্ট

স্কুলের ভাইস-প্রিন্সিপাল ছিলেন। তাঁর উদ্যোগ না থাকলে শশীকুমার হেশ (১৮৬৯-?), রোহিণীকান্ত নাগ (১৮৬৮-৯৫) ও ফণীন্দ্রনাথ বসু (১৮৮৮-১৯২৬) ইয়োরোপে কাজ শিখতে যেতেন না। শশীকুমারের কথা সবার আগে মনে পড়ে। ইয়োরোপীয় নিয়মে অসামান্য ছবি আঁকতেন। কলকাতায় এসে তিনি এক ফরাসি কন্যাকে বিয়ে করেন। কলকাতায় তিনি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের কাছে উঠেছিলেন। ছোটবেলায় শশীকুমারকে খুব দুঃসহ জীবনযাপন করতে হয়েছে! বাইরে ইতালি ও জার্মানিতে ছবি আঁকা শিখেছেন। ত্রিপুরার মহারাজা শশীকুমারকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। ত্রিপুরা রাজপরিবারের একাধিক মানুষের প্রতিকৃতি অঙ্কন করেছিলেন শশীকুমার। নিরলস ছবি আঁকতেন। একসময় কি মনে হল কে জানে! সপরিবারে ফরাসিদেশে চলে যান। সবাই মনে করেন ওই দেশেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুকাল আমরা আজও জানতে পারিনি।

রোহিণীকান্ত ও ফণীন্দ্রনাথ ভাস্কর ছিলেন। রোহিণীকান্ত যক্ষ্মায় মাত্র ২৭ বছর বয়সে মারা যান। ফণীন্দ্রনাথ এডিনবরায় কাজ শিখে আর দেশে ফিরে আসেননি।

বাংলার চিত্রকলার ইতিহাসে হ্যাভেলের সময়টাকে আমরা এক গুরুত্বপূর্ণ কাল বলতে পারি। আরনেস্ট বিনফিল্ড হ্যাভেল। ১৮৫৪ সালে প্রথম আর্ট স্কুল তৈরি হয়েছিল কলকাতায়। তারপর আমাদের 'গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল' পেতে বিয়াল্লিশ বছর অপেক্ষা করতে হয়। ১৮৯৬ সালের ৬ই জুলাই কলকাতায় গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল গড়ে উঠেছে।

ই. বি. হ্যাভেল প্রথম এদেশের মাদ্রাজে আসেন। ১৮৮৪ সাল থেকে মাদ্রাজ গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল হিসেবে কাজ করেন। দক্ষিণ ভারতের শিল্প বিষয়ে তাঁকে নানা সমীক্ষা ওই সময়ে করতে হয়। তাঁতশিল্প নিয়েও হ্যাভেল সমীক্ষা করেছিলেন। কুটিরশিল্প বিকশিত না হলে এই দেশে শিল্পকলার বিকাশ সম্ভব নয়—হ্যাভেল পরিষ্কার ভাষায় সবাইকে বলতেন। এই কথা বলতে গিয়ে তিনি পশ্চিমি প্রযুক্তির কথা বললেও দেশীয় শিক্ষাপদ্ধতির উপরেই জোর দিতে বলেছেন। যখন দিল্লিনগরী তৈরি হচ্ছিল, তিনি দেশীয় স্থপতিদের সহযোগিতা নেওয়ার কথা বলেন। তাঁর কথা সেকালে কেউ বিশেষ আমল দেননি। ভারতীয় কলাশিল্পের বৈশিষ্ট্য হ্যাভেলের আগে অতো নিপুণতার সঙ্গে কেউই অধ্যয়ন করেননি। কতগুলো কথা তিনি পরিষ্কার করে বলতেই ভালোবাসেন। কোন ভারতীয়ের ইয়োরোপপ্রীতি বেশি দেখলে

তিনি বলতেন,

'You do not expect Government to understand and aid you in your religious movements. Why should you expect them to understand and keep alive your art?' (An open Letter to Educated Indians, Kala Bhavana Collection No 2 Vol 1, 1904, p-60)

চিত্রকর্মের প্রদর্শনী থেকে এই শিল্পের উন্নতি হয়, এমন কথা মানতেন না তিনি। ফলে সরাসরি বলতেন,

'I have no faith in art exhibition, art museums or school of art as agencies for preserving or stimulating the spirituality of Indian art'.

মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় এসে সরকারী আর্ট স্কুলে যোগ দিয়েছিলেন হ্যাভেল। ফাইন আর্টস বিভাগের ছাত্রদের বিনা মাইনেতে পড়ার সুযোগ বদলে দিয়ে মাইনে চালু করেছিলেন। তবে প্রাচ্যরীতিতে চারুকারু শিল্পচর্চায় যে ছাত্ররা যোগ দিয়েছিল তাদের মাইনে কমিয়ে দেন। এই নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়। অনেকের ধারণা হয়, ভারতীয়দের যথাযথ শিল্পচর্চা থেকে বঞ্চিত করার জন্যই তিনি পাশ্চাত্য ভাবনাকে সহজসাধ্য করে তুলছেন না। গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের কাছেই বিলিতি চিত্রকলার একটি সংগ্রহশালা ছিল। এই শিল্পসংগ্রহ হ্যাভেল নিলামে বিক্রি করে দেন এবং সেই টাকা দিয়ে দেশীয় ছবি সংগ্রহ শুরু করেন।

এমন এক পরিস্থিতিতে আর্ট স্কুলে কিছু পুরোনো ছাত্র সংগঠিত হয়। রণদাপ্রসাদ গুপ্ত (?-১৯২৭) নেতা হিসেবে এদের পরিচালনা করেন। হ্যাভেল ১৮৯৬ থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল ছিলেন। এক দশক কাল। যখন ফাইন আর্ট বিভাগের গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, রণদাপ্রসাদ ও আরও সবাই আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। রণদাপ্রসাদকে তার জন্য কলেজ ছাড়তে হয়েছে। শশীকুমার হেশ মশাইয়ের কাছে তিনি ছ'বছর কাজ শেখেন (১৯০০—১৯০৫)। কলেজ থেকে বিতাড়িত হবার পর ১৮৯৭ সালে রণদাপ্রসাদ গড়ের মাঠে 'জুবিলি আর্ট স্কুল' তৈরি করেন। রণদাপ্রসাদ সেই সময় কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে বিনামূল্যে জমি ও মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর কাছ থেকে অর্থ সহায়তা পেয়েছিলেন। পরাধীন দেশে তিনি এই স্কুল টানা তিরিশ বছর চালিয়েছেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে আমাদের হেমেন মজুমদার, বসন্ত গাঙ্গুলী, প্রহ্লাদ কর্মকারদের নাম বলতে হয়।

পৃথিবীর নানা উৎকর্ষ শিল্পধারার প্রশস্তিতে যাঁর কখনও কোন সংকীর্ণতা

ছিল না, সেই শিল্পী বিনোবিহারী মুখোপাধ্যায় ই. বি. হ্যাভেলের অবস্থান বিষয়ে মূল্যায়ন করেছেন। খুব কম কথায় তিনি বলছেন, '... তিনি জানতেন যে ভারতীয় সমাজ প্রাণহীন পাশ্চাত্য শিল্পরুচির প্রভাবে আচ্ছন্ন। হ্যাভেল যে আর্টস্কুলের ঐতিহ্যকে ভেঙ্গে দিচ্ছেন এ বিষয়টি যত সহজে তৎকালীন শিল্পীসমাজ লক্ষ্য করেছিলেন তেমনভাবে তাঁর গঠনমূলক পরিকল্পনা লক্ষ্য করেননি। ...কারুশিল্পের জাগরণ প্রসঙ্গে যেমন তিনি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি প্রবর্তনে সমর্থক ছিলেন তেমনি শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রেও পাশ্চাত্য শিক্ষার বিধিব্যবস্থা সম্পূর্ণ বর্জন করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। ...সংক্ষেপে অনুকরণধর্মী শিল্পকে তিনি সম্পূর্ণ বর্জন করতেই চেয়েছিলেন। স্থূল বাস্তবতার সঙ্গে পাশ্চাত্য শিল্পের আদর্শের পার্থক্য যে অনেকখানি এ কথা আজ যত সহজে আমরা মেনে নিতে পারি বিংশ শতাব্দীর প্রথমে অনুরূপ মনোভাব দৈবাৎ লক্ষ্য করা যায়।' (আধুনিক শিল্পশিক্ষা, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়)

হ্যাভেল যখন কলকাতায় তখন তাঁর শরীর মাঝে মাঝেই খারাপ যাচ্ছিল। অথচ বড় ভার তাঁকে সামলাতে হয়। কে বইতে পারেন এমন ভার? বছর কয় আগে হ্যাভেলের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ঠাকুরবাড়ির এক শিল্পীর। তিনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১—১৯৫১)। যেমন লিখতে জানেন তেমন-ই তিনি ছবি আঁকেন। তাঁকে হ্যাভেল গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের কিছু দায়ভার নিতে বলেন। প্রথমে হ্যাভেলের মাথায় উত্তরসূরী নির্মাণের ভাবনা স্পষ্ট ছিল না। ছবি আঁকছেন অবন ঠাকুর। হ্যাভেলের কাছে ভারতীয় শিল্পের পাঠগ্রহণ করছেন। কখনও দায়দায়িত্ব নিয়ে কথা হয়নি। ১৯০৬ সালে হ্যাভেল আকস্মিক অসুস্থ হয়ে এই দেশ ছেড়ে চলে যান। তখন কোন বিকল্প নেই। অবনীন্দ্রনাথকে দায়িত্ব নিতে হয়। অস্থায়ী প্রিন্সিপাল হিসেবে কাজ করতে থাকেন। অবন ঠাকুর যে শুধু প্রাচ্যধারাতেই ছবি আঁকা শিখেছিলেন, আমাদের ভাবলে ভুল হবে। পামার ও গিলার্ডির মতো শিল্পীর কাছে তিনি পাশ্চাত্যধারা রপ্ত করেছিলেন। কিন্তু একসময় একটা নিজের জগৎ গড়ে নিতে হয়। নইলে আত্মপরিচিতি তৈরি হয় না। পামার তাঁকে তেল রঙের কাজ শেখান। গিলার্ডি শেখান প্যাস্টেলের কাজ ও জলরঙের কাজ। জাপানের প্রসিদ্ধ শিল্পবিশারদ ওকাকুরা কাকুজোর কাছে তিনি জাপানের শিল্প বিষয়ের প্রচুর জ্ঞানভাণ্ডার আহরণ করেন। কি চাইছিলেন অবনীন্দ্রনাথ? বঙ্গভঙ্গের তীব্র জোয়ার ১৯০৫ সালে বাংলার উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে। জনচিত্তের সেই প্লাবন তাঁকে উদ্বেলিত করে। ভারতীয় শিল্পধারাকে জাতীয় আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে

গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। হ্যাভেলের জোর ছিল বেশি আধ্যাত্মিকতার উপর। অবনীন্দ্রনাথ চাইলেন জাতীয়তাবাদ। 'কাজেই আধ্যাত্মিকতা ও জাতীয়তা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে প্রাচ্য শিল্পশিক্ষাকে সে সময় প্রভাবান্বিত করে।' (বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়)

গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে অবনীন্দ্রনাথের অবদান কি? তিনি একটা কথা বারবার বলতেন। 'Art School Artist গড়িতে পারে না, Artist-এর হাতের সরঞ্জাম জোগাইতে পারে মাত্র। আগে Artist হও। তবে Art School এ আসিও।' পরে আমরা দেখব, নন্দলালও তাঁর শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের কাছে অবন ঠাকুরের এই কথা বহুবার বলেছেন। বলতেন অবনীন্দ্রনাথ, 'তুলি কম্পাস মহাস্ত্র বটে কিন্তু তাদের প্রয়োগের মন্ত্রগুলোও সঙ্গে সঙ্গে না শিখিলে কি হইবে।'

হ্যাভেলের হুবহু অনুকরণ অবন ঠাকুর করেননি। শিল্পীর মননের উপর জোর দিতে চেয়েছেন বেশি। কোন নির্দিষ্ট পরম্পরা বা ঘরানার অনুশীলন তিনি আর্ট স্কুলে বাধ্যতামূলক করেননি। অনুশীলন না হলে মন জাগে না। পথ কেটে বের করা যায় না। তাই আর্ট স্কুলের প্রয়োজন। নিজে যে উপায়ে ছবি আঁকতেন অবন ঠাকুর, কাউকে সে উপায়ে ছবি আঁকতে বলতেন না। অথচ তাঁর অঙ্কন পদ্ধতির সৌন্দর্য ও সহজতা অজ্ঞাতসারে বহু শিল্পীকে প্রভাবিত করেছিল।

হ্যাভেল চলে যেতে অবন ঠাকুরও আর আর্ট স্কুলে রইলেন না। ১৯০৭ সালে তৈরি হল 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট'। এই সংস্থা গড়ার পেছনে ছিলেন অনেকেই। তবু সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ভগিনি নিবেদিতার নাম আলাদা করে বলতে হয়। অবনীন্দ্র ভাবধারার চর্চা এই সোসাইটির মাধ্যমেই ধীরে ধীরে প্রসারলাভ করেছে।

বাইরে থেকে লেডি হেরিংহাম এসেছেন। অজন্তা চিত্র নিয়ে কাজ করবেন। দুজন প্রিয় ছাত্র অবন ঠাকুরের, নন্দলাল ও অসিতকুমার, হেরিংহামের সঙ্গে গেলেন। অজন্তার ভিত্তিচিত্র গভীর ভাবে বুঝে নিলেন। অবন ঠাকুরের ছাত্ররাই তো বিশ্বভারতীর কলাভবন গড়ে তুলেছিলেন। শুরুর যে ত্রয়ীচরিত্র, অসিতকুমার, নন্দলাল আর সুরেন কর—এঁদের বাদ দিয়ে আমরা কলাভবনের কথা ভাবতেই পারি না। শিল্পী ধীরেনকৃষ্ণের নানা রচনায় এই ইতিহাস অতি স্পষ্ট রূপে ধরা পড়েছে। কলাভবনপূর্ব বাংলা চিত্রকলার ইতিহাস উপস্থাপনায় আমরা আপাতত এখানেই ইতি টানলাম।

জীবনকথা

পরিবার ও প্রতিভা

ত্রিপুরার রাজপরিবারের ইতিহাস বহু পুরোনো। তেমনি ত্রিপুরার উজির পরিবারের ইতিহাসও কম পুরোনো নয়। নানা ঐতিহাসিকের অভিমত ও 'রাজমালা'র বিবরণী থেকে আমরা মহামাণিক্যকে প্রথম রাজা বলে পরিচয় দিই। মহামাণিক্য থেকে বিজয়মাণিক্য পর্যন্ত একটা তালিকা আমরা নিচে দিলাম।
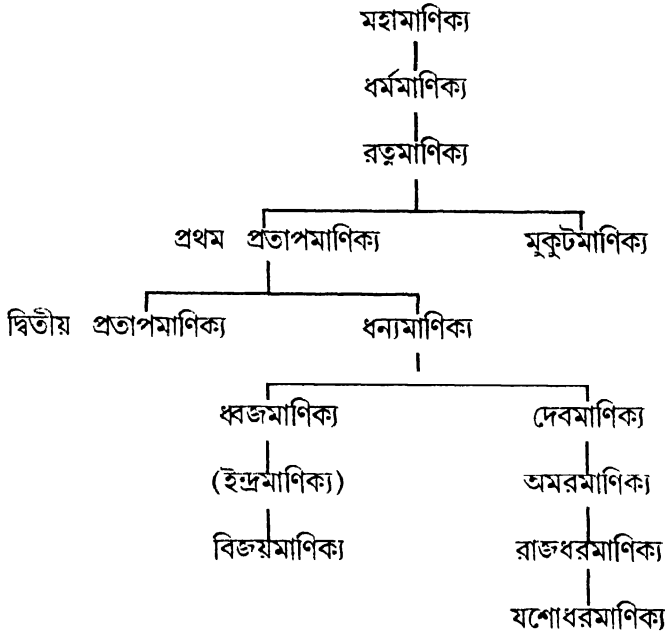
বিজয়মাণিক্য পর্যন্ত তালিকা কেন? বিজয়মাণিক্যের সময় প্রথম আমরা প্রচন্ড উজিরের নাম দেখতে পাই। বিজয়মাণিক্যের রাজত্বকাল ছিল মুঘলসম্রাট আকবরের সমসাময়িক। ১৫৩২ সালের কাছাকাছি কোন বছরে বিজয়মাণিক্য রাজা হয়েছিলেন। ১৫৬৩-৬৪ সাল নাগাদ বিজয়মাণিক্য বসন্তরোগে মারা

যান। রাজা হয়েছিলেন পুত্র অনন্তমাণিক্য। অনন্তমাণিক্য দেড় বছর মাত্র রাজা ছিলেন। তারপর রাজা হলেন গোপীপ্রসাদ ত্রিপুরা। নাম নিয়েছিলেন উদয়মাণিক্য। ১৫৬৭ সাল থেকে পাঁচ ছয় বছর রাজত্ব করেছিলেন। উদয়মাণিক্যের পর তাঁর পুত্র জয়মাণিক্য। তারপর অমরমাণিক্য, অমরমাণিক্যের পুত্র রাজধরমাণিক্য, ঈশ্বরমাণিক্য রাজা হন। ১৬০০ সালে রাজধরমাণিক্যের পুত্র যশোধরমাণিক্য রাজা হলেন।

যশোধরমাণিক্যের কোন পুত্র ছিল না। রাজা হবেন কে? মহামাণিক্যের বংশধর কল্যাণমাণিক্যকে সিংহাসনে বসানো হয়। কল্যাণমাণিক্যের পর যাঁরা রাজা হয়েছিলেন তাঁদের নাম আমরা পর পর দিচ্ছি।

কল্যাণমাণিক্য → গোবিন্দমাণিক্য → রামদেবমাণিক্য → দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য → মহেন্দ্রমাণিক্য → দ্বিতীয়ধর্মমাণিক্য → মুকুন্দমাণিক্য।

১৭৩০ সালে মুকুন্দমাণিক্য রাজা হলেন। ১৭৩৪ সাল অব্দি রাজত্ব করেছেন। মুকুন্দমাণিক্যের পুত্র এরপর রাজা হননি। রাজা হলেন রুদ্রমণি। জয়মাণিক্য নাম নিয়ে রাজত্ব করেন। তারপর রাজা হন ইন্দ্রমাণিক্য। ১৭৬০ সালে মুকুন্দমাণিক্যের পুত্র কৃষ্ণমণি ঠাকুর কৃষ্ণমাণিক্য নাম নিয়ে রাজা হন। তেইশ বছর রাজা ছিলেন কৃষ্ণমাণিক্য। ১৭৮৩ সালে প্রয়াত হন। কৃষ্ণমাণিক্যের আমলে যিনি উজির পদে ছিলেন তাঁর নাম জয়দেব উজির। পরের উজিরের নাম রাজমণি উজির। তিনি দ্বিতীয় রাজধরমাণিক্যের সময়ে উজির ছিলেন। এরপর আমরা যাঁর কথা বলব, উজির পরিবারে তাঁর খ্যাতির কোন তুলনা ছিল না। তিনি দুর্গামণি উজির। মহারাজা রামগঙ্গামাণিক্যের সময়ে তিনি উজির উপাধি পেলেন। রামগঙ্গামাণিক্য ১৮১৩ সালে রাজা হন। ১৮২৬ সালে প্রয়াত হন। দুর্গামণি উজিরের পর উজির হয়েছিলেন প্রথমে রামজয় ঠাকুর ও পরে কৃষ্ণজয় ঠাকুর। রাজা কৃষ্ণকিশোরমাণিক্যের সময়ে এঁরা পরপর উজির পদ লাভ করেছিলেন। কৃষ্ণকিশোরমাণিক্য ১৮৩০ সালে রাজা হন। ১৮৪৯ সালে বজ্রাঘাতে মারা যান। এরপর উজির হন শিবজয় ঠাকুর। রাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য তাঁকে উজির উপাধি দেননি। কিন্তু সরকারী কাগজপত্রে তাঁকে শিবজয় উজির হিসেবেই লেখা হয়েছে। পরের যিনি তিনি গোপীকৃষ্ণ উজির। মহারাজা রাধাকিশোরমাণিক্যের সময় বহুদিন মন্ত্রী ছিলেন। ১৮৯৭ সালে রাধাকিশোরমাণিক্য রাজা হন। ১৯০৯ সালে সারনাথে এক মোটর দুর্ঘটনায়
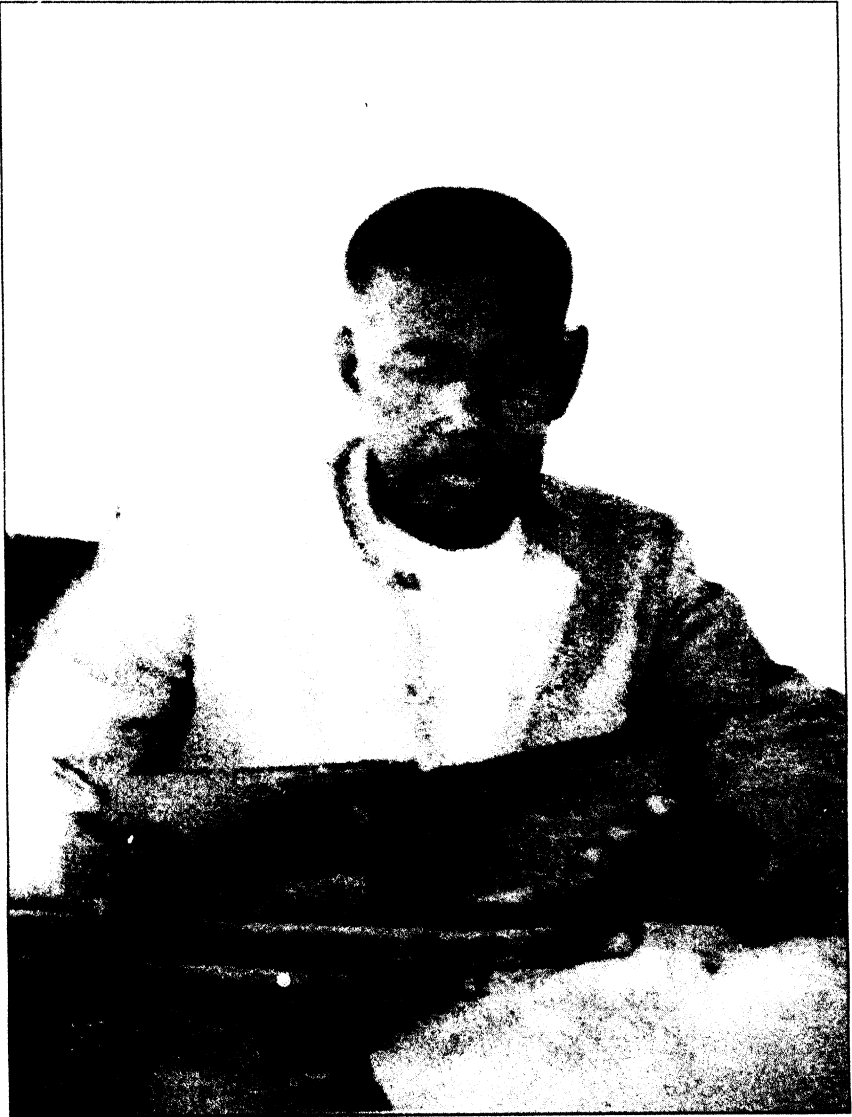
ধীরেনকৃষ্ণের পিতা উজির ব্রজকৃষ্ণ দেববর্মন

মারা যান। রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্রের নিকট বন্ধু ছিলেন রাধাকিশোরমাণিক্য। শশীকুমার হেশকে তিনিই নিয়মিত সহায়তা দিতেন।

গোপীকৃষ্ণ উজিরের পর উজির হলেন ব্রজকৃষ্ণ ঠাকুর। তখন রাধাকিশোর মাণিক্যের পুত্র বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য রাজা ছিলেন। বীরেন্দ্রকিশোর ১৯০৯ সালে রাজা হন। তিনিও বেশিদিন বাঁচেননি। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে ১৯২৩ সালে তিনি মারা যান। খুবই বড়মাপের চিত্রকর ছিলেন বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য। তিনিও পিতার কবিবন্ধু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছেন। তাঁর আঁকা 'সন্ন্যাসী', 'ঝুলন', 'বংশীবাদন' যে কোন চিত্র সমালোচকের শিল্প ইতিহাস বর্ণনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের পর রাজা হলেন পুত্র বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য। উজির পরিবারে আমরা সবশেষ উজির হিসেবে কমলকৃষ্ণের নাম দেখতে পাই। কমলকৃষ্ণ উজির। চিত্রকর ধীরেনকৃষ্ণের তিনি অগ্রজ। উজির পরিবার এখনও তার খ্যাতি ও সমৃদ্ধি নিয়ে বেঁচে রয়েছে। তবে কেউই আর 'উজির' নন। 'রাজা' না থাকলে 'উজির' থাকার কারণ নেই।

আমরা পাঠকের সুবিধের কথা ভেবেই রাজার রাজত্বকাল উল্লেখ করে সে সময়ের যিনি উজির ছিলেন তাঁর নাম নিচে লিখব।

মহারাজা কে ছিলেন	রাজত্বকাল	যিনি উজির ছিলেন
বিজয়মাণিক্য	১৫৩২-৬৩ (৬৪)	প্রচন্ড উজির
কৃষ্ণমাণিক্য	১৭৬০-৮৩	জয়দেব উজির
দ্বিতীয় রাজধরমাণিক্য	১৭৮৫-১৮০৪	রাজমণি উজির
রামগঙ্গামাণিক্য	১৮১৩-২৬	দুর্গামণি উজির
কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য	১৮৩০-৪৯	রামজয় উজির
বীরচন্দ্র মাণিক্য	১৮৬২-৯৬	কৃষ্ণজয় উজির শিবজয় উজির
রাধাকিশোর মাণিক্য	১৮৯৭-১৯০৯	গোপীকৃষ্ণ উজির
বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য	১৯০৯-২৩	ব্রজকৃষ্ণ উজির
বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য	১৯২৩-৪৭	কমলকৃষ্ণ উজির

দুর্গামণি উজিরের খ্যাতির কথা আগে আমরা উল্লেখ করেছিলাম। চিত্রকর ধীরেনকৃষ্ণের পিতামহের প্রপিতামহ ছিলেন উজির দুর্গামণি ঠাকুর। বিশিষ্ট কবি। 'রাজমালা' চতুর্থ খণ্ডের রচয়িতা। উজির পরিবারেরই সদস্য ধবলকৃষ্ণ

দেববর্মন লিখেছেন, 'কোন ব্যক্তিমানসের সাংস্কৃতিক গুণাবলী অর্জনে ও তার বিকাশে পরিবার ও সামাজিক পরিবেশ যেহেতু তার মূল ভূমিকা পালন করে, অনিলকৃষ্ণ দেববর্মণের পরিবারের ক্ষেত্রেও সেই পরিমণ্ডল রচনার কাজ শুরু হয়েছিল উজীর দুর্গামণি দেব ঠাকুরের সময় থেকে। (সঙ্গীতাচার্য অনিলকৃষ্ণ ও ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান, ধবলকৃষ্ণ দেববর্মন, পৃঃ ১৩)।' একই কথা আমরা ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মন প্রসঙ্গেও বলতে পারি।

ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মার পিতামহ ছিলেন উজির গোপীকৃষ্ণ দেব ঠাকুর। ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সাহিত্যপত্র 'বঙ্গভাষা' ১৩১০ বাংলায় তাঁরই আগ্রহে প্রকাশিত হয়েছিল। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন, অক্ষয় মৈত্রেয়, শান্তিনিকেতনে আশ্রম-বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষক জগদানন্দ রায় এই পত্রিকায় নিয়মিত লেখা দিতেন। গোপীকৃষ্ণ উজিরের পত্নী অনঙ্গমোহিনী দেবী ছিলেন বিশিষ্ট কবি ও আত্মীয়তাসূত্রে মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের প্রথমা কন্যা। তাঁর লেখা কাব্যগ্রন্থ 'শোকগাথা' ও 'কণিকা' উপহার হিসেবে পেয়ে রবীন্দ্রনাথ অনঙ্গমোহিনী দেবীকে চিঠি দিয়েছিলেন। চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, '...আপনার এই কবিতাগুলির মধ্যে কবিত্বের একটি স্বাভাবিক সৌরভ অনুভব করি। ইহাদের সৌন্দর্য্য বড় সরল এবং সুকুমার—অথচ কলানৈপুণ্যও আপনার পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ...'।

উজির পরিবারে সঙ্গীতের স্থান কেমন ছিল? উজির গোপীকৃষ্ণ নিজে বেহালা বাজাতে পারতেন। মাটির প্রতিমা গড়তে জানতেন। বাড়িতে বহুকাল ধরে দুর্গাপুজো হতো। যেই পরিবারের কারিগরেরা এই প্রতিমা তৈরি করতেন তারা বারবার গোপীকৃষ্ণ উজিরের মৃৎশিল্পবিদ্যার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

লেখাপড়ার প্রচলন উজির পরিবারে দীর্ঘকাল ধরেই বহমান ছিল। বাড়িতে যে পারিবারিক পাঠাগার তার বইয়ের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। নানা সিরিয়াস বিষয়ের বহু বই ছিল। মহানগর কলকাতা থেকে বহুদূরের একটা বাড়িতে সে সময় নিয়মিত 'বঙ্গদর্শন', 'ভারতবর্ষ', 'ভারতী', 'প্রবাসী' 'নব্যভারত' যাচ্ছে। আজও ভাবতে গেলে বিস্ময় জাগে।

চিত্রশিল্পের বন্দনাও ছিল বহুকালের। রাজা রবি বর্মার অনেকগুলো রামায়ণ-মহাভারত নির্ভর ছবি ঘরের দেওয়ালে শোভা পেত। ইয়োরোপীয় শিল্পীদের নানা নিসর্গচিত্র ছিল। শিল্পী ধীরেনকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র ও সঙ্গীতাচার্য অনিলকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠপুত্র কবি ও শিল্পী সলিলকৃষ্ণ দেববর্মন একটি নিবন্ধ লিখেছেন। 'রাজ আমলের চিত্রকলা—স্মৃতিবিস্মৃতি'।* রাজপরিবারের বহু

প্রসঙ্গ ত্রিপুরা, সম্পাদনা : নিলিপ পোদ্দার, পৌণমী প্রকাশন, আগরতলা, ত্রিপুরা

মানুষের শিল্পপ্রীতির কথা উল্লেখ করেছেন সলিলকৃষ্ণ। সেই শিল্পচর্চার প্রকৃতিও বিশ্লেষণ করেছেন। চারুশিল্পের প্রতি রাজপরিবারের অনুরাগ থাকলেও চারুকলার 'বোধোদয়' সাধারণ মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হোক, বলছেন সলিলকৃষ্ণ, রাজপরিবারের লোকজন তেমনটি চাননি। বীরচন্দ্র, বীরেন্দ্রকিশোর ও বীরবিক্রম—এই তিন রাজার প্রতিকৃতি অঙ্কন করেছিলেন আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল ই. বি. হ্যাভেল। রাজবাড়িতে এই প্রতিকৃতি শোভা পেত। এছাড়াও নানা নির্বাচিত স্থানে বরদা উকিল (১৩০২?-১৩৭৪), শশীকুমার হেশ, (১৮৬৯-?), রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অনিলকৃষ্ণ ঠাকুর, সুরেশচন্দ্র দেববর্মনের ছবি সজ্জিত ছিল। বীরেন্দ্রকিশোরের চিত্রাঙ্কন প্রতিভার কথা আমরা আগে বলেছি। তার দুটি রঙিন চিত্র আনন্দমোহন ভট্টাচার্য ছদ্মনামে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। যশ বা খ্যাতি প্রার্থী ছিলেন না বোঝাই যায়। বীরেন্দ্রকিশোর বাঁশি ও সেতার বাজাতেন ভাল। ফলে চারুশিল্প ও সঙ্গীত দুয়ের এক সার্থক সহাবস্থান ত্রিপুরার রাজপরিবারে বহু আগে থেকেই দেখা যায়। এমন সার্থক সমন্বয়ের উজ্জ্বল উদাহরণ ত্রিপুরায় উজির বাড়ির দুজন মানুষের। ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মন। অনিলকৃষ্ণ দেববর্মন। বীরেন্দ্রকিশোর কন্যা কমলপ্রভা দেবীর নামও এই প্রসঙ্গে আমাদের বলতে হয়। সলিলকৃষ্ণ বলেছেন, 'বীরেন্দ্রকিশোর দুহিতা রাজকুমারী কমলপ্রভা দেবীর ... শিল্প মেজাজ আধুনিক স্তরে বিধৃত। রাজকুমারী কমলপ্রভা দেবীর চিত্র রচনায় একটি স্বকীয় রীতি আছে। তাঁর চিত্র বর্ণবহুল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কল্পনার মাধুর্য বর্তমান। ... রঙের বিমিশ্রণে তার চিত্রানুরাগ পূর্বসুরীদের প্রভাব পড়েনি।'

তিনি আমাদের মধ্যে এখনও বেঁচে আছেন। ত্রিপুরা সরকার তাঁকে যথার্থ কারণেই প্রথম 'ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ পুরস্কার'-এ সম্মানিত করেছে। বীরেন্দ্রকিশোর পত্নী রানী প্রভাবতী দেবীও ছবি আঁকতেন ভাল। নিসর্গচিত্র আঁকতেন চমৎকার। 'জল রঙে আঁকা তার ছোট ছোট নিসর্গচিত্র খুবই উচ্চমানের এবং পরিশীলিত শিল্পরুচির পরিচায়ক'। বাবা মায়ের শিল্পদক্ষতা কন্যা কমলপ্রভার মধ্যে খুবই সুচারুভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল।

রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যও তেলরঙে ছবি আঁকতেন। সমরেন্দ্র দেববর্মন (বড় ঠাকুর) জলরঙে ছবি আঁকতেন। বীরচন্দ্রের পুত্র মহেন্দ্র দেববর্মন জলরং ও তেলরং উভয় মাধ্যমেই পারদর্শী ছিলেন। শৈলেশ দেববর্মনের কথা আলাদা করেই বলতে হয়। শান্তিনিকেতনে ছিল তাঁর শিক্ষা। ত্রিপুরায় ফিরে এসেছিলেন। ধীরেনকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্কের পরিচয় আমরা এই বইয়ের প্রকাশিত চিঠিগুলির মধ্যে দেখতে পাব।

আশ্রম-বিদ্যালয়

'আগরতলা শহরে একান্নবর্তী পরিবারে বুধবার ২৩ মাঘ ১৩০৮ বঙ্গাব্দ, ইংরাজি ১৯০২ সালে জন্মেছিলাম। পিতার নাম উজির ব্রজকৃষ্ণ দেববর্মা, মাতার নাম স্বর্ণলতা দেবী।'

একশো বছর আগের শহর আগরতলা। লোকজন-ই বা শহর জুড়ে ক'জন? চারপাশে গভীর বনবাদাড় ছিল। আর ছিল বুনো হাতি, মোষ, বাঘ, ভাল্লুক, শুয়োর, হরিণ ও অগুনতি রকমের পাখি। বোশেখের শুরুতে বৃষ্টি হলে পোকামাকড় চারপাশে বেড়ে উঠত। পাখির ছানাদের খাবারের অভাব হতনা। ধীরেনকৃষ্ণ ছোটবেলায় একটু সুযোগ পেলেই বনজঙ্গলে বেড়াতে চলে যেতেন। 'সাথিদের সঙ্গে বনের ফুল দেখতে, ফল খেতে বনে যেতাম।'

ছোটবেলার দিনগুলো কাটিয়েছেন কেমন করে? 'ছোটো বয়সেই বনের গাছপালা, পশুপাখিদের ভালোবেসেছি, তাদের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছি। কিছু লেখাপড়া করা, সমবয়সীদের নিয়ে নানারকম খেলা করা, আর সুযোগ পেলেই বনে বেড়াতে যাওয়া এমনিভাবে আমাদের ছোটো জীবনের গতি বেশ আনন্দেই বয়ে চলেছিল।'

উজির বাড়ির ছেলে ধীরেনকৃষ্ণ। বাড়ি খুব বড়। অন্দরমহল বাহির মহল দুই-ই রয়েছে। বাইরের মহলে ছোটরা সবাই মিলে খেলা আর গল্পগুজবে মেতে থাকতেন।

১৯১১ সালের একদিনের কথা। বাবা ব্রজকৃষ্ণ 'উজির' ছিলেন বলে প্রচুর মানুষ বাবার সঙ্গে কথা বলতে আসতেন। সেইসব মানুষদের চিনতেনও ধীরেনকৃষ্ণ। কিন্তু একদিন এমন একজন মানুষ বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, যাঁকে তিনি আগে কখনও দেখেননি। দেখেই খুব ভাল লেগে যায়। 'সৌম্য মূর্তি, বয়সে নবীন, মাথায় সামান্য দীর্ঘ কালো কেশগুচ্ছ, দাড়ি গোঁফ খুব একটা দীর্ঘ নয়, গায়ের রঙ ফর্সা ও দেখতে সুশ্রী, পরিধানে ধুতি ও পাঞ্জাবি, শুভ্র একটি সাদা রঙের চাদর গায়ে জড়ানো।' কে তিনি? প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার। পরিণত বয়সে শান্তিনিকেতনে দূর থেকে দেখলে ছোটরা তাঁকে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ভেবে ভুল করতেন।

অবশ্য ধীরেনকৃষ্ণ বলেছেন, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেহারার সঙ্গে তাঁর মিল ছিল। ১৮৯২ সালে নদীয়ার রানাঘাটে প্রভাতকুমারের জন্ম। ১৯০৯ সালে সতেরো বছর বয়সে শান্তিনিকেতনের আশ্রম বিদ্যালয়ে যান। ১৯১০ সালের জুন মাস থেকে ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে কাজে যোগ দেন। ১৯১৭ সালে কলকাতায় এসে সিটি কলেজের গ্রন্থাগারিক পদে যোগ দিলেন। কবির আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯২৮ সালে আবার তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরে যান। বয়স তখন তাঁর ছাব্বিশ বছর। ১৯৫৪ সালে বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৬৫ সালে 'দেশিকোত্তম' উপাধি লাভ করেন। ১৯৮৫ সালের ৭ই নভেম্বর তিনি শান্তিনিকেতনে প্রয়াত হন। এই ছিলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

প্রভাতকুমারের পরিচয়ের পর আবার আমরা আগের কথায় ফিরে আসি। ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বলছেন, খানিকক্ষণ পরে বাবা জয়কৃষ্ণ ধীরেন আর তাঁর চেয়ে দু'বছরের বড় দাদা কমলকৃষ্ণকে ডেকে পাঠিয়েছেন। প্রভাতকুমারের কাছে এঁদের দেখিয়ে বাবা জানতে চাইলেন, তাঁর এই দুই ছেলে বোলপুরে রবি ঠাকুরের স্কুলে পড়তে পারবে কি না। বেশিক্ষণ তাঁদের ওই ঘরে থাকতে হল না। ছুটে পালিয়েছিলেন। পরে মায়ের কাছে জানলেন, দু ভাইকে শান্তিনিকেতনে পড়তে যেতে হবে। '......খুব ভালো লেখাপড়া হয়, দুষ্টু ছেলেরা সব ভালো হয়ে যায়।'

এই খবরে ধীরেনকৃষ্ণ খুশিই হয়েছিলেন। একটা বড় কারণ, বাড়ি থেকে অনেক দূর যাওয়া হবে। তাছাড়া ওখানে মারধোর নেই, আগরতলায় যে স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন তারা বকাবকি মারধোর কোনটাই বাদ দিতেন না। ওই সময় কর্ণেল বাড়ির ছেলেরাও শান্তিনিকেতনে পড়ছিলেন। ফলে পরিচিতদেরও তিনি শান্তিনিকেতনে দেখতে পাবেন। ১৯১১ সালে, সত্যি বলতে কি, প্রভাতকুমার কর্ণেল বাড়ির অতিথি হয়ে আগরতলায় এসেছিলেন। কে জানে, হয়তো ছাত্রসংগ্রহের জন্যই উক্তির বাড়িতে ঢুকেছিলেন। তখন প্রভাতকুমারের বয়স কত? মাত্র কুড়ি বছর। কেউ কেউ তাঁকে মজা করে 'ছেলেধরা' বলতেন। অবশ্য এমন 'ছেলেধরা' মানুষে আমাদের আপত্তির কিছু নেই।

১৯১১ সালে পুজোর ছুটি শেষ হলে কমলকৃষ্ণ ও ধীরেনকৃষ্ণ কর্ণেল মহিম ঠাকুরের ছোটভাই উমেশ ঠাকুরের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে এলেন। অতো বছর আগের শান্তিনিকেতন! বোলপুর স্টেশনে নেমে বাইরে বেরোলেন

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

সবাই। গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে বেশ ক'খানা। দু'খানা গাড়ি ভাড়া নিয়ে 'ছয়-সাতটি প্রাণী কোনো প্রকারে তাতে চড়ে শান্তিনিকেতন চললাম। ....সেই রাত্রির স্মৃতি মন থেকে আজও মুছে যায়নি।'

আশ্রম-বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের ছিল তিনভাগ। আদ্য, মধ্য আর শিশু। ন'বছর বয়সী ধীরেনকৃষ্ণ শিশুদলে পড়েছিলেন। তাঁকে বীথিকাগৃহে পাঠানো হল। ভর্তির পরীক্ষা হবে। একজন মাস্টারমশাই তাঁর বাংলা, অঙ্ক আর ইংরেজির বিদ্যা পরীক্ষা করলেন। স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে শিল্পী লিখেছেন, 'বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা একশতের মতো ছিল। ছাত্রীর সংখ্যা বোধহয় চার-পাঁচটি হবে।'

প্রতি ছাত্রের মাসের খরচ ছিল আঠারো টাকা। বই খাতার খরচ বাবদ আরও পাঁচ টাকা করে দিতে হত। ভর্তির পর ছাত্রদের কাছে একটা ছাপানো কাগজ দেওয়া হত। প্রতিদিন কেমন করে চলতে হবে, পরপর লেখা ছিল ওই কাগজে। ভোর চারটেয় ঘুম থেকে উঠতে হত। নিজের ঘর নিজেকেই পরিষ্কার করতে হত। 'স্নানের পরে নিজেদের কাপড় কেচে রোদে দেওয়া, বিছানা গুছিয়ে রাখা, আহারের পর থালা, গেলাস মেজে পরিষ্কার করা', সব ছাত্রদের নিজের হাতে করতে হত। তখন শান্তিনিকেতন খোলা মাঠ। হু হু করে হাওয়া বইছে। শীতকালের সকাল চারটায় ঘুম থেকে উঠতে ভালো লাগত না কারও। তার উপর আবার সকালবেলাতেই স্নান। একটা ঘড়ি-ধরা নিয়মের ভেতর চলতেই হত সবাইকে। পাঠক জানেন, শান্তিনিকেতনের আশ্রম-বিদ্যালয়ের ক্লাস গাছের তলায় বসে। সকাল সাড়ে দশটায় ক্লাস শেষ হয়ে যায়। বিকেলে আবার দুটো আড়াইটেয় ক্লাস শুরু হয়। চার বা সাড়ে চারটায় শেষ হয়। ঘর পরিষ্কার রাখার প্রতিযোগিতাও ছিল। দিনুবাবু (দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর) ঘুরে ঘুরে দেখতেন। হাতের কাগজে কি সব নোট নিতেন। বিকেলবেলা খেলা। তিন-চারটি খেলার মাঠ। খেলতে যেতে হত সবাইকে। সাহিত্যসভা, অভিনয়, দিনু ঠাকুরের গান শেখানোতো ছিলই। রাত ন'টায় রাতের খাবার। সাড়ে ন'টায় বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে হত।

আশ্রম বিদ্যালয়ে পড়ার সময়েই তাঁর ছবি আঁকার আগ্রহ মাস্টারমশায়েরা জানতে পারেন। তাঁর একটা ছবি দেখে কালীমোহনবাবু খুশি হন খুব। তিনি তাঁকে সন্তোষ মিত্রের কাছে নিয়ে গেলেন। সন্তোষবাবু আশ্রম-বিদ্যালয়ে ড্রইং শেখাতেন। তিনি ধীরেনকে অসিতকুমার হালদারের সঙ্গে দেখা করতে

আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্রদল।
সারিতে দাঁড়িয়ে ধীরেনকৃষ্ণ । ডানদিক থেকে দ্বিতীয়

বললেন। অসিতকুমার হালদারের কথা আমরা আলাদা করে বলব না। বড় মাপের শিল্পী। ধীরেনকৃষ্ণের রচনা থেকেই পড়ে নেব।

ছোটবেলায় তিনি যাঁদের কাছে পড়েছেন, তাঁদের কথা বারবার বলতেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে পড়ার বিরল সুযোগও তিনি পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ক্লাসে এসে বাংলা ও ইংরেজি পড়াতেন। যেই প্রভাতকুমার ধীরেনকৃষ্ণকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে এসেছিলেন তিনিও একটা বিষয়ে ক্লাস নিতেন। ব্যারোমিটার, থার্মোমিটার দেখতে হত ছেলেদের। আকাশ কেমন খাতায় নোট রাখতে হত। এই বিষয় তদারকি করতেন প্রভাতকুমার। তাছাড়া প্রভাতকুমার ভূগোলের ক্লাস নিতেন।

'বঙ্গীয় শব্দকোষ' দু'খণ্ডে রচনা করে যিনি চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন সেই হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সংস্কৃত পড়েছেন ধীরেনকৃষ্ণ। পড়াতেন ভাল। পড়া না পারলে রাগতেনও খুব। ক্ষিতিমোহন সেন বাংলা পড়াতেন। 'এই ক্লাসে বাংলা পড়তে খুব ভালো লাগত।'

অঙ্কের ক্লাস নিতেন জগদানন্দ রায়। ছাত্র ও অধ্যাপক সবাই এই মানুষটিকে ভয় করতেন। অথচ বাইরে থেকে তিনি যতোই কঠোর হোন না কেন অন্তর ছিল খুবই কোমল। বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যের পথিকৃৎদের তালিকা সাজাতে গেলে জগদানন্দের নাম বলতে হয়। তিনি ভাল বেহালাও বাজাতেন। নেপালচন্দ্র রায় মশাই ইতিহাস পড়াতেন। এলাহাবাদ অ্যাংলো-বেঙ্গলি স্কুলের প্রধান শিক্ষক নেপালচন্দ্র স্বদেশী কাজে যোগ দিয়েছিলেন। উত্তর প্রদেশের গভর্নর তাঁকে অপসারিত করার আদেশ জারি করে। তিনি নিজে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন। কবির ডাকে সাড়া দিয়ে ১৯১০ সালে শান্তিনিকেতনে যোগ দেন। এছাড়া নানা সময়ে ধীরেনকৃষ্ণ সতীশচন্দ্র রায়, নগেন আইচ, শরৎকুমার রায়, সন্তোষকুমার মজুমদার ও কালিদাস বসুর কাছে পড়েছেন। সন্তোষকুমার মজুমদার ছেলেদের খেলাধুলো দেখাশুনা করতেন। কবির গানের ভাণ্ডারি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। নীচু ক্লাসে ধীরেনকৃষ্ণদের ইংরেজি পড়িয়েছেন। এমন ঈর্ষণীয় ছাত্রজীবনের জন্য আমাদের বড় লোভ হয়। আরও একটা কথা ভেবে লোভ হয়। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। ধীরেনকৃষ্ণ তখন শান্তিনিকেতনের ছাত্র। বয়স এগারো বছর। নোবেল জয়ের আনন্দ সেদিনের সেই কিশোর কি সবার সঙ্গে ভাগ করে নেননি!

কলাভবন

১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ 'কলাবিদ্যা' নিবন্ধে বলেছিলেন, 'বিশ্বভারতী যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ভারতীয় সংগীত ও চিত্রকলা তাহার প্রধান অঙ্গ হইবে এই আমাদের সঙ্কল্প হউক।'

১৯১৯ সালের শেষে তৈরি হয়েছিল কলাভবন। শিক্ষক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে সাড়া দিয়ে শুরুতে কলাভবনে এসেছিলেন অসিতকুমার হালদার, নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর।

রবীন্দ্রনাথের নিকটাত্মীয় অসিতকুমার অবন ঠাকুরের কাছে গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে ছবি আঁকা শেখেন। ১৯১১ সালে কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল ছেড়ে আশ্রম-বিদ্যালয়ে যান। শুরুতে কলাভবনের অধ্যক্ষ হলেন। ১৯২৩ সালে কলাভবন ছেড়ে জয়পুর চলে যান। তখন নন্দলাল বসু অধ্যক্ষ হন। সুরেন কর লিখছেন, একদিন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বললেন,—'তুমি শান্তিনিকেতনে এস না; ওখানেও এমনি খোলা আকাশের নীচে অবারিত মাঠ, খোয়াই, আশেপাশে সব সাঁওতাল আমাদের প্রতিবেশী,—তোমার ভালোই লাগবে। ওখানে আমাদের স্কুলের কাজে যোগ দিতে পারবে। যদি বলো তো, তোমার বাবার কাছে অনুমতি চেয়ে আমি লিখতে পারি।' শিল্পী ও স্থপতি সুরেন করের কোন তুলনা নেই। শান্তিনিকেতনের নানা বাড়ির স্থাপত্য তাঁর হাতে তৈরি। ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে সুরেনবাবু শান্তিনিকেতনের আশ্রম-বিদ্যালয়ে যোগ দেন।

১৯১৯ সালে 'দ্বারিক'-এর দু'তলায় কলাভবন শুরু হয়। শুরুর দিন থেকেই অসিতকুমার ও সুরেন্দ্রনাথ কলাভবনে ছিলেন। 'এখানকার ফার্স্ট ব্যাচে ছিলেন ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা, বিনোদ দা, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, রমেন চক্রবর্তী; মাসোজীও ছিলেন তবে একটু পরে এসেছিলেন।' (শ্রুতি স্মৃতি, শ্রীঋতেন মজুমদার, রবীন্দ্রভবন, বিশ্বভারতী)।

১৯১৪ সালে নন্দলাল বসু প্রথম শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। তারপর আবার স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট-এ চলে যান। শান্তিনিকেতনের কলাভবনে ১৯২০ সালে এসে যোগ দেন। ১৯২২ সাল থেকেই কলাভবনের ভার

সামলাতে হয় তাঁকে। অসিতকুমার চলে গেলে অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত একটানা অধ্যক্ষ ছিলেন। তারপর অবসর গ্রহণ করেন। কলাভবনের শিক্ষকদের মধ্যে নন্দলালের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। প্রায় টানা তিন দশক তিনি এই ভবনের প্রধান ছিলেন।

১৯১৯ সালের এক বিকেলে আশ্রম-স্কুলের ছাত্রদের ডেকে বলা হল, কে কি করতে চাও বল। গান শিখবে নাকি ছবি আঁকা মূর্তি গড়া শিখবে নাকি গবেষণা করবে। কি করলেন ধীরেনকৃষ্ণ? '...লাইন থেকে এক পা এগিয়ে দিলাম।, দেখলাম যারা এগিয়ে এল তাদের সংখ্যা খুবই কম। সংগীতে যোগ দিতে অনাদি দস্তিদার, গবেষণায় যোগ দিতে দক্ষিণ ভারতীয় চালামায়া, চিত্রকলায় যোগ দিতে একমাত্র আমি ছিলাম।'

পরে দেখা গেল শুরুর বছরে ছাত্র রয়েছে চারজন। ধীরেনকৃষ্ণ, হীরাচাঁদ দুগার, কৃষ্ণকিঙ্কর ঘোষ, অর্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। সবাই বাইরে থেকে এসেছিলেন। ধীরেনকৃষ্ণ শুধু শান্তিনিকেতনের ছাত্র। একদিন আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছাত্র বিনোদবিহারীকে ধরে এনে ছবি আঁকার ক্লাসে ঢুকিয়ে দিলেন। দুজনের ভাব হল খুব। দুজনে ওঁরা কলাভবনে পড়ার সময় একই ঘরে থাকতেন। কলাভবনের ছাত্র হিসেবে দাপটের সঙ্গে একটার পর একটা কাজ করেছেন তিনি। ১৯১৫ সালে আশ্রম-স্কুলের ছাত্র থাকার সময়ে অসিতকুমার হালদারের সঙ্গে তিনি ও বন্ধু ক'জন মিলে আমগাছের তলায় পদ্মফুলের পাপড়ির মত খাঁজ কেটে লাল পাথরের টুকরো দিয়ে ভরে দিয়েছিলেন।

নন্দলাল বসুর সঙ্গে ধীরেনকৃষ্ণের সম্পর্ক ছিল সুগভীর। বছরের পর বছর ধরে তাঁদের চিঠিপত্রের আদানপ্রদান থেকে এ জিনিস উপলব্ধি করা যায়। নতুন ছাত্র কলাভবনে এলে শুরুতে তার দেখাশুনার ভার ধীরেনকৃষ্ণকে নিতে হত। রামকিঙ্করের কথা মনে পড়ছে। ১৯২৫ সালে রামকিঙ্কর শান্তিনিকেতনের কলাভবনে ভর্তি হয়েছিলেন। সমরেশ বসুর 'দেখি নাই ফিরে'র আখ্যান আমরা পরে দিয়েছি। দেখছি আমরা, রামকিঙ্করের কাছে ধীরেনকৃষ্ণকে 'অধ্যাপক' হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন নন্দলাল। বিনোদ আর ধীরেনকৃষ্ণের বন্ধুত্বও আলাদা উল্লেখের দাবি রাখে। অসিতকুমার আর সুরেন কর ১৯২১ সালে বাঘগুহাচিত্র দেখতে গোয়ালিয়র গিয়েছেন। দেওয়ালচিত্রের নকল করবেন। কথাটা ধীরেন আর বিনোদের কানে আসতেই উৎসাহিত হয়ে, 'বিনোদ ও আমি যে গৃহে বাস করতাম তার দেওয়ালে মাটির

কলাভবন, শান্তিনিকেতন। বাঁদিক থেকে
অসিতকুমার হালদার, সুরেন্দ্রনাথ কর, ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা, হীরাচাঁদ দুগার, নন্দলাল বসু, কৃষ্ণকিঙ্কর ঘোষ ও
অর্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

রঙ ও ভাতের মাড় মিশিয়ে দুটি চিত্র এঁকেছিলাম।' শান্তিনিকেতনে এর আগে কোনও দেওয়ালচিত্র আঁকা হয়নি।

অর্ধেন্দুপ্রসাদ ছাত্র হিসেবে ভাল ছিলেন। ড্রইং ও রঙ চাপানো ভালোই পারতেন। অনেক ভালো ছবি এঁকেছেন। পরে হারিয়ে যান।

হীরাচাঁদ দুগারকে (১৮৯৮-১৯৫১) আমরা চিনি। মুর্শিদাবাদের মানুষ। ১৯১৫ সালে তিনি কিছুদিন গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে পড়েন। তারপর ১৯১৯ সালে শান্তিনিকেতনে চলে যান। স্ত্রীকে হারানোর পরে ছবি আঁকা বহুদিন ছেড়ে দিয়েছিলেন। ১৯৪৬ সালে আবার ছবি আঁকতে রাজি হন। পাহাড়ি জায়গায় গিয়ে ছবি আঁকেন। একদিন পাহাড়ের মাথায় ছবি আঁকতে গিয়ে মারা যান। বয়স তখন তাঁর মাত্র চুয়ান্ন বছর।

কৃষ্ণকিঙ্কর ভাগলপুর থেকে এসেছিলেন। কথায় একটু 'পণ্ডিতি' ভাব বয়সের তুলনায় বেশি ছিল। তবে ছবি যত্ন করে আঁকতেন। ছোট মাপে ছবি আঁকতেন। নন্দবাবু, অসিতবাবুকে ধীরেনকৃষ্ণ কখনও 'দাদা' সম্বোধন করতে পারতেন না, কৃষ্ণকিঙ্কর বিনা বাধায় তাঁদের 'দাদা' বলে ডাকতেন।

বন্ধু বিনোদবিহারীকে নিয়ে কি বলেছেন ধীরেনকৃষ্ণ?

'...সুরসিক বিদ্যাচর্চার প্রতি ঝোঁক বরাবর ছিল। ফরাসি, ইংরেজি গল্প ও উপন্যাস এবং পরবর্তীকালে শিল্পবিষয়ে পুস্তকাদি পড়তে সর্বদা উৎসাহী ছিল। ভালো করে নিজের বক্তব্য শিল্পবিষয়েই হোক বা অন্য বিষয়েই হোক বলার ক্ষমতা ছিল। ...লেখক হিসেবেও সুখ্যাতি করেছে। চোখ তার এত খারাপ ছিল তার জন্য প্রথমে ছবি আঁকায় যেতে তাকে অনেকে বারণ করেছিল। ...চোখের জন্য সবসময় সূক্ষ্ম কাজের ছবি আঁকা তার পক্ষে সম্ভব না হলেও ছবির সমগ্র ও বৃহত্তর ছন্দে রূপ সৃষ্টির কোনো অসুবিধে হত না। ...ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র আমরা দুজনেই প্রথমে কলাভবনে যোগদান করেছিলাম বলে আমাদের পরস্পরের মধ্যে খুব হৃদ্যতা ছিল। ...গল্প করতে করতে কখনও দুজনে হেসেছি, আবার কখনও-বা হা-হুতাশ করেছি। ...কলাভবনেই আমরা দুজনে বাসা বেঁধেছিলাম। শিল্পীদের কথা...ভিন্ন মাথায় অন্য ভাবনার কোনো স্থান ছিল না। এমনি করেই নিজেদের শিল্পের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম। একে শিল্পসাধনা করা বলব কিনা জানি না।'

যারা চিত্রকলার ছাত্র তাদের ক্লাসরুমের বাইরে গিয়ে প্রকৃতির নানা চিত্র আঁকতে হয়। কলাভবনের ছাত্রদের তো প্রকৃতির কোন দারিদ্র্য ছিল না। ধীরেনকৃষ্ণ স্কেচ খাতা পেন্সিল নিয়ে নানা দিকে চলে যেতেন। 'সেখানে
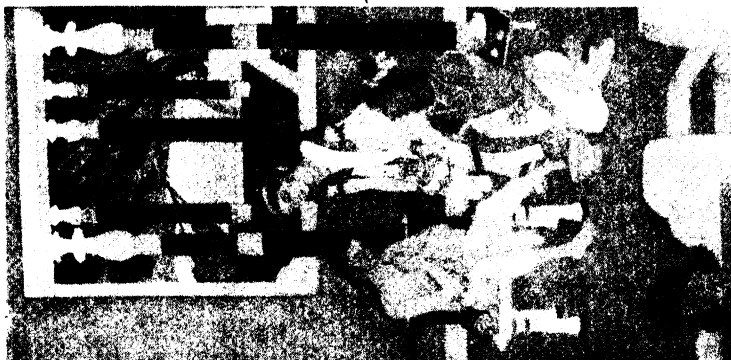
রূপ ও ভালোবাসা ঃ কৃষ্ণ ও সুদাম
শিল্পী ধীরেনকৃষ্ণের অঙ্কিত দুটি ছবি

সাঁওতাল ছেলেরা তাদের গোরু, ভেড়া, ছাগল মাঠে চরাচ্ছে। কেউ হাতের বাঁশের লাঠির উপর এক পা উঠিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। কেউ বাঁশি বাজাচ্ছে। ...শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন, 'সর্বক্ষণই সর্বস্থানে কত ছবি আঁকা হয়ে যাচ্ছে, যাদের চোখ আছে তারা দেখে ধন্য হল, আর যারা দেখতে পেল না তারা বঞ্চিত হল।'

কলাভবনের শিক্ষার প্রণালীতে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর ছাত্র নন্দলালের আধিপত্য সবচেয়ে বেশি ছিল। যদিও অবন ঠাকুর বলতেন, 'কাউকে আমি শেখাই না, শিখেইতো আসে, এখানে এসে শুধু ঝালিয়ে নেয়।' কথাটা নন্দলালের ভাল লাগত। আধুনিককালের চিত্রসমালোচক মৃণাল ঘোষ লিখছেন, 'নন্দলাল বসুর তত্ত্বাবধানে কলাভবন ভারতীয় শিল্পকলার আধুনিকতায় যে অবদান রেখেছিল, তার প্রধান এক বৈশিষ্ট্য হল, স্বদেশের ভিত্তির উপর সমগ্র বিশ্বের উত্তরাধিকারকে মিলিয়ে নেওয়া। ভারতীয় আধুনিকতায় শিল্পের মুক্তির সূচনা হয়েছিল কলাভবন থেকেই। নন্দলাল, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, রামকিঙ্কর থেকে কে. জি. সুব্রামনিয়ন পর্যন্ত সেই স্বদেশ-বিশ্বের সমন্বয়ের বিবর্তন আমরা দেখেছি।'

১৯২৭ সালে যবদ্বীপে রবীন্দ্রনাথ। দাঁড়িয়ে বাঁদিক থেকে বাকে পত্নী, মিস্টার বাকে, ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা, সুরেন্দ্রনাথ কর, মিস্টার কপার্কবার্গ ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। বাঁদিক থেকে বসে রানী, রবীন্দ্রনাথ ও রাজা মাঙ্কোনগর

ছাত্রদের সার্টিফিকেট দিয়ে চাকুরিতে যোগ দেবার অনুমতি দিতেন। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথের সার্টিফিকেট পেতে অসুবিধে ছিল না।'

ওই সময়ে অধ্যাপকের কাজে ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মন নিযুক্ত হয়েছেন, এমন কথা বলছেন বিনোদবিহারী। কলাভবনের খ্যাতি খুব দ্রুত পৃথিবীর নানা দেশে পৌঁছেছে। বিনোদবিহারীর অভিমত, '১৯৩৫ সাল পর্যন্ত যে সব ছাত্রছাত্রী কলাভবনে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা বা তাঁদের অভিভাবকরা অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল-প্রবর্তিত শিল্পধারার দ্বারা বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিলেন।...'

'ক্যালকাটা গ্রুপ'* তৈরি হয়েছে তার অনেকটা পরে। দেশের বিখ্যাত শিল্পীদের অনেকেই এই পরিকল্পনার অংশীদার হয়েছেন। গগনেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের চিত্রসংকলন তার আগে শিল্পীসমাজে নতুন দৃষ্টিকোণ খুলে দিয়েছে। গগনেন্দ্রনাথের আঁকা বারোটি কাকের ছবির অ্যালবাম আর 'জীবনস্মৃতি'র অলঙ্করণ চিত্ররসিকেরা মুগ্ধ হয়ে দেখেছেন। কলাভবনে নন্দলাল দুটো বিষয়ে সারাদেশের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। গ্রাফিক্স বা ছাপাই ছবি। ফ্রেস্কো বা ভিত্তিচিত্র। ছাপাই ছবিতে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন মুকুলচন্দ্র দে ও রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। জলরং, টেম্পেরা, তেলরং মাধ্যমে ভাল ছবি আঁকতেন রমেন্দ্রনাথ। তবু জীবনের অনেকটা সময় ছাপাই ছবি নিয়ে মেতে ছিলেন। কলাভবনের ঘরানায় নিজেদের তৈরি করেছেন মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, শফিউদ্দিন আহমেদ, হরেন্দ্রনাথ দাস ও সোমনাথ হোড়ের মত শিল্পীরা। মণীন্দ্রভূষণ প্রথম দিকে কলাভবনের ছাত্র ছিলেন। পরে কারুসংঘ তৈরিতে তাঁর অবদান ছিল। শান্তিনিকেতন থেকে প্রকাশিত নানা বইপত্রের অলঙ্করণে তাঁর অন্যতম প্রধান ভূমিকা দেখা যায়।

বিনোদবিহারী ও ধীরেনকৃষ্ণ একসঙ্গে একাধিক ফ্রেস্কো বা ভিত্তিচিত্র রচনা করেছেন। নন্দলাল নিজেও এমন কাজে যোগ দিলেন। বসু বিজ্ঞান মন্দিরে নন্দলাল বসুর ভিত্তিচিত্র রচনার কথা (১৯১৭) আমরা সবাই জানি। কলাভবনে সেসময় জয়পুর থেকে একজন শিল্পী এসেছিলেন। তিনি শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের ফ্রেস্কোর করণকৌশল শিখিয়ে দিয়ে যান। ধীরে ধীরে কলাভবনের সৌরভ বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে।

---

* 'ক্যালকাটা গ্রুপ আন্দোলন' বিষয়ে জানতে চাইলে প্রদোষ দাশগুপ্ত রচিত 'স্মৃতিকথা শিল্পকথা' দ্রষ্টব্য।

ফিরে যাই মাটির টানে

ধীরেনকৃষ্ণ ১৯২৫ সাল থেকে ছাত্রজীবন শেষ না হতেইতো কলাভবনে অধ্যাপনা করছিলেন। কবির সঙ্গে বাইরে গেলেন (১৯২৭)। ফিরে এসে আবার বিলেতে ইণ্ডিয়া হাউসের দেওয়ালচিত্র আঁকতে গেলেন (১৯২৯)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৩৬) ও শিলং-এ ত্রিপুরার মহারাজার বাড়িতে ফ্রেস্কো করেছিলেন (১৯৪৬)। মহাজাতি সদনেও কাজ করছিলেন (১৯৬০)। ফলে অবসরের ফুরসৎ পাচ্ছিলেন না। নিজের মনে ভাবনা তৈরি হল তাঁর, শান্তিনিকেতনে থাকবেন নাকি নিজের জন্মভূমি আগরতলায় চলে যাবেন? জন্মভূমি জিতে যায়। আগরতলা নিজের বাড়িতে ফিরে এলেন ধীরেনকৃষ্ণ। একটা বিষয় সত্যিই আমরা বুঝতে পারি না, যেই মানুষটি তাঁর 'শান্তিনিকেতন পর্ব' (প্রথম পর্ব ও দ্বিতীয় পর্ব) নানা লেখা ও আলাপচারিতায় আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলেছেন, তিনি কেন তাঁর মধ্যজীবনের ত্রিপুরা নিবাসের কাহিনি বিষয়ে অনুচ্চারিত থেকে গেলেন।

আগরতলা 'উজিরবাড়ি'-কে একডাকে সবাই চিনতেন। বাড়ির যেমন অন্দরমহল বাহিরমহল ছিল, বাইরে ছিল বিশাল মাঠ। মাঠের পাশে দুর্গাপুজোর মন্ডপ, নাট-ঘর, লক্ষ্মীগোবিন্দের মন্দির। মন্দির ছাড়িয়ে বড় আকারের একটা পুকুর। এই পুকুরের দুই পাড়ে ছিল দু'ভাইয়ের সাধনার স্থল। সঙ্গীতাচার্য অনিলকৃষ্ণ আগরতলায় এই দেশের প্রথম সঙ্গীতপাঠক্রম নির্ভর বিদ্যালয় গড়ে তুলেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন 'ঐক্যতান বাদন সমিতি'। পুকুরের পশ্চিম পাড়ে ছিল এই স্কুল। উত্তরপুব পাড়ে ধীরেনকৃষ্ণের 'ছবি আঁকার ঘর' ছিল। ত্রিপুরার রাজনৈতিক আবহে তিনি সক্রিয়ভাবে যোগ দেননি যদিও, জনশিক্ষার আন্দোলনে নিবিড়ভাবে সামিল হয়েছিলেন। ভাবতে খারাপ লাগে, এসব কথা তিনি নিজে যদি লিখে রেখে যেতেন, কি ক্ষতি হতো? মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর-কন্যা কমলপ্রভা দেবী প্রথম ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। মনে পড়ে যায়, শান্তিনিকেতনে শিল্পীর বাড়িতে গিয়েছি। পুত্র প্রণবকৃষ্ণ দেববর্মার কাছে আর্জি পেশ করলাম, 'মাকে একবার দেখতে চাই। যদি সম্ভব হয় একটা ছবি নেব।' আমার সঙ্গী নীলাঞ্জন। মায়ের বয়স সাতানব্বুই বছর। কথায়

কথায় জানালাম, 'ধীরেনকৃষ্ণের জন্মশতবর্ষে ত্রিপুরা সরকার 'ধীরেনকৃষ্ণ পুরস্কার' চালু করেছে। কমলপ্রভা দেবী এই পুরস্কার পেয়েছেন।' একটু থেমে আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'কমল আবার পাইছে ক্যান?' বললাম, 'তিনি খুব বড় মাপের চিত্রশিল্পী। অনেক ছবি এঁকেছেন।' আবার চুপ তিনি। হঠাৎ চোখ দুটো যেন জ্বলজ্বল করে উঠল। বলে উঠলেন, 'কমল আমার বইন, জ্যাঠতুতু বইন।' স্মৃতি তাঁর অমলিন রয়েছে আজও। প্রণাম জানিয়ে সেদিন বিদায় নিয়েছিলাম। বড় বিস্ময় জাগে, অতোকাল পরেও ত্রিপুরার কথার টানে তাঁর বিন্দুমাত্র অবিশুদ্ধতা যোগ হয়নি।

ধীরেনকৃষ্ণ জনশিক্ষা আন্দোলনে যে ভূমিকা পালন করেছিলেন, আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব। রাজপরিবারের নিকটাত্মীয় রাজপরিবারের উদাসীনতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, আমাদের ভুলে গেলে চলবে কেন? ধবলকৃষ্ণ লিখছেন, '...শিল্পী ধীরেনকৃষ্ণ ছিলেন ব্যতিক্রম। তাই রাজ-আমলের উপাধি 'ঠাকুর' পদবীটি বংশপরম্পরায় নামের সঙ্গে ব্যবহার করাকে তিনি কোন গুরুত্বই দেননি।' অপরিণত আলোচনায় অনেক সময় কেউ কেউ অভিযোগ করেন, চাইলে তিনি ত্রিপুরার জন্য আরও অনেক কিছু করতে পারতেন। একজন শিল্পীর কাজ, পরের প্রজন্মের শিল্পীদের তিনি উদ্বোধিত করবেন। এমন কাজে তাঁর কৃতিত্ব শতকরা একশো ভাগ বলেই মনে করি। ত্রিপুরার প্রতি তাঁর ভালোবাসার উদাহরণ আমরা অক্ষর পাবলিকেশনস্ প্রকাশিত ত্রিপুরার রূপকথামালা 'কেরেঙ কথমা' থেকে উল্লেখ করতে পারি। বইয়ের ভূমিকায় সুপরিচিত কুমুদ কুন্ডুচৌধুরী লিখেছেন, 'শিল্পী ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা একবার শান্তিনিকেতনে তাঁর রতনপল্লীর বাসভবনে আমাকে বলেছিলেন, 'কুমুদবাবু, ককবরক ভাষা গবেষণার সঙ্গে যদি ত্রিপুরী রূপকথা সংগ্রহ করতে পারতেন, তাহলে একটা বড়ো কাজ হতো। ছেলেবেলায় আমি মায়ের দাসীদের কাছ থেকে রোজ সন্ধেবেলায় ত্রিপুরী রূপকথা শুনতাম। রূপকথা শুনতে শুনতে যেমন উৎফুল্ল হতাম, তেমনি কেঁদেও ফেলতাম কখনো কখনো। ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্য থেকে এইসব রূপকথা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, এগুলো সংগ্রহ করা খুব দরকার।'

ত্রিপুরার ঐতিহাসিক আন্দোলন জনশিক্ষা আন্দোলন। পাহাড়ের সাধারণ মানুষের লেখাপড়া নিয়ে রাজপরিবারের প্রায় কেউই তেমন মাথা ঘামাতেন না। বিশ ক'জন তরুণ যুবক সেদিন রাজার ভাবনার তোয়াক্কা না করে শিক্ষাপ্রসারের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন।

শিল্পী ধীরেনকৃষ্ণ

জনশিক্ষা আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা সুধন্বা দেববর্মার রচনা* থেকে আমরা খানিকটা অংশ তুলে ধরতে চাই। 'এরপর রাজবাড়িতে গোপন মিটিং ডাকা হলো। সভাপতি প্রয়াত ধীরেনকৃষ্ণ ঠাকুর (শান্তিনিকেতনের কলাভবনের এককালীন অধ্যক্ষ)। তিনি আমাকে খুব ভালোবাসতেন। জনশিক্ষা সমিতির কাজকেও খুব পছন্দ করতেন। জনশিক্ষা সমিতির এক সভায় যোগ দিয়েছিলেন। দুর্গা চৌধুরী পাড়ায় এর সমর্থনে ভাষণও দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে অবশ্য জনশিক্ষা সমিতির নেতৃবৃন্দ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করায় দুঃখিত হয়েছিলেন। গোপন মিটিঙে ললিত ঠাকুর, জীতেন ঠাকুর অন্যান্য কর্তারাও ছিলেন। সভার কাজ শুরু করলেন জীতেন ঠাকুর। বললেন, 'সমস্ত পাহাড়ী-ত্রিপুরা, জমাতিয়া, হালাম, রিয়াং প্রভৃতিকে নিয়ে সম্মেলন ডাকা হবে। স্বয়ং মহারাজা সম্মেলনের খরচ বহন করবেন। সম্মেলনে একটা দল গঠন করবেন এবং ভলান্টিয়ার দলও গঠন করা হবে। সে সভায় একটা কথাও আমি বলিনি। তবে অনেক রাত অব্দি ঘুম এলো না। মহারাজা কেনো সম্মেলনের খরচ বহন করবেন! মহারাজের উদ্দেশ্য কি? এই জিজ্ঞাসা আমার ঘুম কেড়ে নিলো প্রায়। পরদিন রাতে আবার মিটিং চলবে। ওই সভায় কি কি প্রশ্ন তুলবো স্থির করে নিলাম।

সভা শুরুর সঙ্গে সঙ্গে সুযোগ মতো প্রশ্ন তুললাম। ওই সম্মেলনে দল গঠন করা হবে এবং ভলান্টিয়ার দল গঠন করা হবে, এটা কি রাজনৈতিক দল? আগেই তো মন্ডল গঠন করা হয়েছিলো, ভলান্টিয়ার দল গঠন করা হয়েছিলো। এটা কি হায়দ্রাবাদের রাজাকার বাহিনীর মতো?' জীতেন ঠাকুর বলেন, 'এতগুলো প্রশ্নের জবাব আমরা দিতে পারবো না। স্বয়ং মহারাজ এ প্রশ্নের উত্তর দেবেন। সুধন্বা দেববর্মা এ প্রশ্ন করেছে এ কথা লেখা হউক।' সভাপতি ধীরেনকৃষ্ণ ঠাকুর আপত্তি করলেন। 'নাম লেখা হবে না। সভা থেকে কথা উঠেছে এ কথা লেখা হবে।' ধীরেনকৃষ্ণের এই মন্তব্য নিঃসন্দেহে তাঁর উদার ও গভীর সাংগঠনিক মননের পরিচায়ক।

জনকল্যাণমূলক এই আন্দোলন পরিচালনায় ধীরেনকৃষ্ণ সাহসিকতার কেমন পরিচয় রেখেছিলেন তার উদাহরণও এখানে আমরা পেশ করতে পারি।

জনশিক্ষা আন্দোলন প্রসঙ্গে অঘোর দেববর্মা উল্লেখ করেছেন, '...জনশিক্ষা সমিতি গঠিত হওয়ার সময় এ পর্যন্ত এ রাজ্যে প্রকাশ্যে জনসভা, মিছিল ইত্যাদিতে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিলো। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এ রাজ্যের
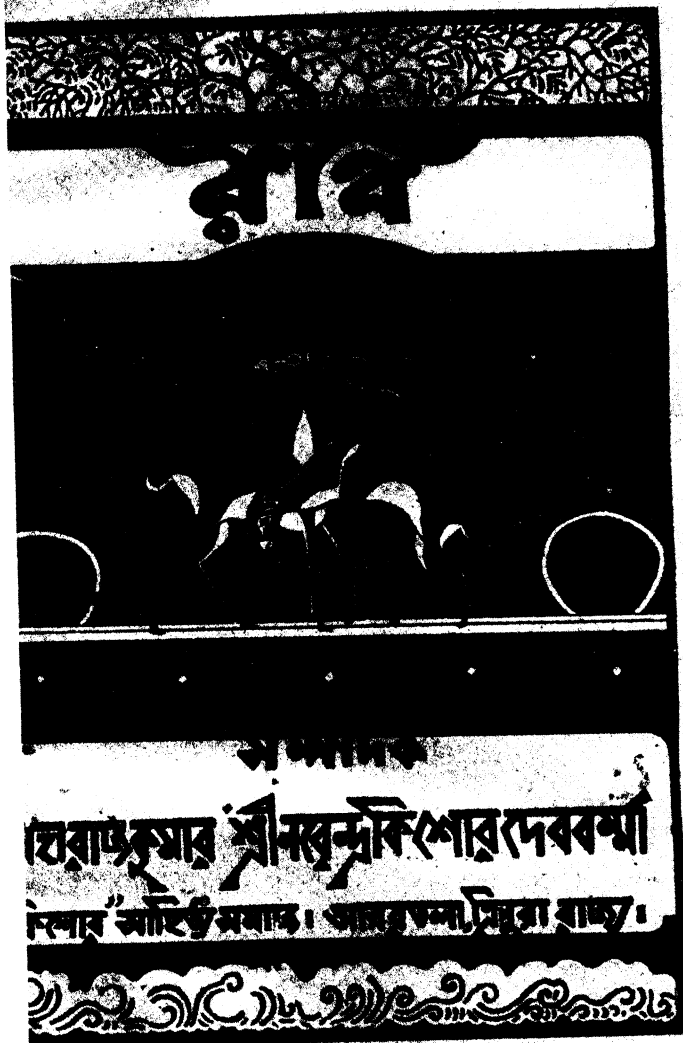
শিল্পী-কৃত 'রবি'র প্রচ্ছদ

সামন্ত শাসক বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর রাজ্যব্যাপী ১৪৪ ধারা জারী করে পূর্বোল্লিখিত আদেশ জারী করেন। বিগত মহাযুদ্ধের পরও এই আদেশ বলবৎ ছিলো। কোনরকম ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বীকৃতি ছিলো না। জনশিক্ষা সমিতিতেও এ ব্যাপারে আলোচনা হয়। জনশিক্ষা সমিতি একটি অরাজনৈতিক শিক্ষামূলক গণসংগঠন। অতএব ঝুঁকি নিয়েই প্রকাশ্যে জনসভা সম্মেলন ইত্যাদি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বলা যায় জনশিক্ষা সমিতির উদ্যোগেই এ রাজ্যে প্রথম ১৪৪ ধারা ভেঙে প্রকাশ্যে জনসভা ইত্যাদি করা হয়। আগরতলা কর্ণেলবাড়ির মাঠে শ্রদ্ধেয় শিল্পী প্রয়াত ঠাকুর ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মাকে সভাপতি করে জনশিক্ষা সমিতির উদ্যোগে আইন ভেঙে প্রথম জনসভা করা হয়।...সভার সভাপতি শ্রদ্ধেয় প্রয়াত শিল্পী ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মাও ত্রিপুরার অজ্ঞ নিরক্ষর উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষা সম্প্রসারণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য রাখেন। এটাই সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারের ১৪৪ ধারা অগ্রাহ্য করে জনসভা করার পরীক্ষামূলক উদ্যোগ।'

১৯৪৭ সালে মহারাজা বীরবিক্রমের উৎসাহে ত্রিপুরায় উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের প্রাঙ্গণে এক বড়োমাপের চিত্রপ্রদর্শনী হয়েছিল। মূল ভূমিকা পালন করেছেন শিল্পী ধীরেনকৃষ্ণ। যে সকল শিল্পীদের চিত্রকর্ম প্রদর্শিত হয়েছিল আমরা তাঁদের নামের তালিকা দেখলে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাই। কিছু নাম আমরা উচ্চারণ করতেই পারি। অবন ঠাকুর, গগন ঠাকুর, নন্দলাল বসু, বিনায়ক মাসোজী, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, রামকিঙ্কর বেইজ, এ পিরুমল, অর্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কে. জি. সুব্রহ্মনিয়াম (যিনি শান্তিনিকেতনে 'মানিদা' নামে পরিচিত), শৈলেশচন্দ্র দেববর্মা, সুরেশচন্দ্র দেববর্মা, নরেশকৃষ্ণ দেববর্মা। ধীরেনকৃষ্ণের ছবিতো ছিলই। রথীন্দ্রনাথের কাঠের কাজ ছিল। বিশ্বভারতীর শিল্পভবনের কাজ ছিল। ত্রিপুরা নারী সমিতির পক্ষ থেকে উপজাতি নারীদের হাতের কাজও প্রদর্শিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ চাইছিলেন, ধীরেনকৃষ্ণ কলাভবনে এসে তার দায়ভার নিক। বইয়ে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের ১৩ নং চিঠিতে তার পরিচয় মিলবে। সুরেন্দ্রনাথ কর মশাই লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ ধীরেনকৃষ্ণকে চাইছিলেন। মাস্টারমশাই নন্দলাল বসুর আহ্বানও গিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছল। ১৯৫১ সালে চম্পকনগর 'লোকশিক্ষালয়'

রং তুলি কালি কলম

যখন আশ্রম-বিদ্যালয়ে পড়ছেন ধীরেনকৃষ্ণ, তখনই তাঁর ছবির দিকে মাস্টারমশাইদের নজর যায়। অঙ্কের মাস্টারমশাই নগেন আইচ তাঁকে সন্তোষ মিত্র মশাইয়ের কাছে নিয়ে যান। সন্তোষ মিত্র তাঁকে অসিতকুমার হালদারের কাছে পাঠান। কলাভবনের জয়যাত্রা যে চারজন ছাত্র দিয়ে শুরু, ধীরেনকৃষ্ণ তাঁদের একজন। একজন বললে কম বলা হয়। তিনিই প্রথম ছাত্র যিনি শান্তিনিকেতনের আশ্রম বিদ্যালয় থেকে কলাভবনে যোগ দিয়েছিলেন। এমন একক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী শুধু তিনিই। অবনীন্দ্র-নন্দলাল ঘরানার আদর্শ উদাহরণ ধীরেনকৃষ্ণ। মানুষের জীবনযাত্রা ও নিসর্গ চিত্র তাঁর রং তুলিতে বারবার উঠে এসেছে। 'নেচার স্টাডি' যা যেকোন শিল্পীর এক অপরিহার্য কাজ, সেই কাজে তিনি ও বিনোদবিহারী সবার আগে পা বাড়িয়ে থাকতেন। লিখছেন ধীরেনকৃষ্ণ, '...বিনোদ ও আমি স্কেচ খাতা সঙ্গে নিয়ে কতদিন যে গোয়ালপাড়া, কোপাই নদীর ধারে তালবনে, পারুলডাঙায়, বিনয় ভবনের কাছে শালবনে আমবাগানে ঘুরে বেড়িয়েছি, গাছপালা, সাঁওতাল গ্রামবাসী, তারই সঙ্গে গরু, মোষ, ছাগল, গরুগাড়ি ইত্যাদি দেখে তাদের স্কেচ করেছি তার কোনো ইয়ত্তা নেই। সাঁওতাল গ্রামগুলি আমাদের খুব আকর্ষণ করত, অনেক কিছুই স্কেচ করবার থাকতো সেখানে। অনেকদিন স্কেচ করতে করতে আশ্রম থেকে অনেক দূরে চলে গেছি। দুপুরে রান্নাঘরে এসে খাওয়া সম্ভব হত না, দুজনে কোপাই নদীতে স্নান করে দু' আনার ছোলা ভাজা খেয়েই তৃপ্ত হয়েছি। বিকেলের দিকে খেজুর রস খেয়ে সন্ধ্যায় মনের আনন্দে ফিরেছি। গ্রীষ্মকালের আকাশে পাংশুটে রং ধরে যখন বায়ুকোণ থেকে কালবৈশাখীর ঝড়ের তান্ডব প্রবল বেগে নেমে আসত তখন বিনোদ আর আমি পাগলের মতো এই ঝড়ের মধ্যে খোয়াইয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। কত অন্ধকার রাত্রে, জ্যোৎস্নার নির্জনে দুজনে বেরিয়েছি। তার মধ্যে ছিল নানাভাবে শিল্পীর দৃষ্টি দিয়ে জীবনকে দেখার চেষ্টা, একটা আকুতি, এসকলের মধ্যে আর্টের ভাবনা সর্বক্ষণ থাকতো বলেই এত আনন্দময় ও আকর্ষণীয় ছিল আমাদের এই যথেচ্ছ ভ্রমণ।'

তাঁর নিসর্গ চিত্র বা ছোট ছোট জীবনের মুহূর্ত নিয়ে আঁকা ছবিগুলো আমাদের মন স্নিগ্ধতায় ভরিয়ে তোলে। ১৯৮২ সালে কলাভবনে শিল্পীর এক একক প্রদর্শনীতে মোট চল্লিশটি ছবি প্রদর্শিত হয়েছিল। সেখানে আমরা ১৯১৩ সালে শিল্পীর আঁকা একটি ছবি দেখতে পাই। শিল্পী তখন আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছাত্র। ছবির শিরোনাম 'কেয়া পাতায় নৌকা গড়ে সাজিয়ে দেবো ফুলে'। ১৯১৯, '২০ ও '২১ সালের একটি করে ছবি ছিল। ১৯২০ সালের ছবিটি তিনি ওয়াশ পদ্ধতিতে এঁকেছিলেন। এই ওয়াশ পদ্ধতি অবনঠাকুরেরও প্রিয় পদ্ধতি যা ধীরেনকৃষ্ণ দক্ষতার সঙ্গে জীবনের শুরু থেকেই আয়ত্ত করেছিলেন। ১৯২১ থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে অঙ্কিত কোন ছবি আমরা ওই প্রদর্শনীতে দেখতে পাইনি। তার কারণ নানারকমের হতে পারে। একটা বড় কারণ, কবির সঙ্গে তাঁর বাইরে যাওয়া। আবার ১৯২৯ সালে ইন্ডিয়া হাউসের দেওয়াল চিত্র আঁকতে তিনি ও তাঁর তিন বন্ধু বাইরে গেলেন। বন্ধুদের অন্যতম ললিতমোহন সেন (১৮৯৮-১৯৫৬)। লক্ষ্ণৌ চারুকলা বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্র। ১৯১২ সাল থেকে পাঁচ বছর সেখানে পড়াশুনো করেন। ওখানেই শিক্ষকতার কাজ নেন। বছর পাঁচ কাজ করে বিলেতে যান। আবার দেশে ফিরে আসেন। ১৯২৮ সালে 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বেরোল, লন্ডনের ইন্ডিয়া হাউসের দেওয়ালে ফ্রেস্কো আঁকার জন্য চারজন শিল্পী চাই। এই বিজ্ঞাপনের খবর ধীরেনকৃষ্ণের কাছে পৌছে দেন ত্রিপুরার খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব ও ধীরেনকৃষ্ণের আজীবন সুহৃদ সত্যরঞ্জন বসু। ললিতমোহন, রণদা উকিল আর সুধাংশু রায়চৌধুরীর সঙ্গে ধীরেনকৃষ্ণও নির্বাচিত হন। চারজন শিল্পীই ১৯২৯ সালে লন্ডনে যান ও ভিত্তিচিত্র আঁকার আগে ইতালি ও ইউরোপের আরও অনেক দেশের প্রদর্শশালা সফর করেন। তেলরঙের ছবিতে ললিতমোহন ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর ছবি দেখে ইংল্যান্ডের রানি সেসময় এত খুশি হন যে তাঁর একটি ছবি বিক্রি করার জন্য একশ কপি ছাপিয়ে দেন। আমরা তাঁর আঁকা ধীরেনকৃষ্ণের অসামান্য প্রতিকৃতিটি (তেল রং) এই বইয়ের প্রচ্ছদ হিসেবে ব্যবহার করেছি। শিল্পীপুত্র প্রণবকৃষ্ণ এই চিত্রকর্ম দিয়ে আমাদের সহযোগিতা করেছেন। কলাভবনে ধীরেনকৃষ্ণ প্রথম পর্যায়ে ১৯১৯ থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত ছিলেন।

'নন্দলাল-প্রবর্তিত আধুনিক ভিত্তিচিত্রের ধারা তাঁর দুই অগ্রগণ্য ছাত্র ধীরেনকৃষ্ণ ও বিনোবিহারীর হাতে সম্প্রসারিত ও সমৃদ্ধ হয়েছিল। ধীরেনকৃষ্ণ

লণ্ডনে ইণ্ডিয়া হাউসের দেওয়াল চিত্র

অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলালের আদর্শে সূক্ষ্ম রেখা ও বর্ণকর্মের মিনিয়েচার ধর্মী ছবির জন্য বিশেষ পরিচিত হলেও বড় পরিকল্পনার ভিত্তিচিত্রের কাজেও তাঁর দক্ষতা সর্বজন স্বীকৃত।

উঠোনের আধ শোওয়া পোষা কুকুর, মোরগ মুরগির ছিটানো সংসারের ছবি, শান্তিনিকেতনের নানা ঋতুতে প্রকৃতির ছবি এঁকেছেন ধীরেনকৃষ্ণ। তাঁর ছবির শিরোনামে কেমন সাধারণত্বের ছোঁয়া অথচ সেই ছবি আমাদের অনুভূতিতে অন্য মাত্রা যোগ করে।

মিনিয়েচারের উপর জোর দিতেন শিল্পী বেশি। প্রকৃতির ডিটেইলের দিকে খেয়াল রাখতে বলতেন। যদি ডিটেইল না-ই দেখব তবে একই ফুল নিয়ে হাজার শিল্পী হাজার রকমের ফুল আঁকছেন কেমন করে? প্রকৃতি চিত্রের কথায় একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা জানানোর লোভ সামলাতে পারছি না। বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী (ক্যালকাটা গ্রুপের সক্রিয় সদস্য ছিলেন) গোপাল ঘোষ প্রয়াত হয়েছেন। শিল্পী শৈলেশ দেববর্মার সমবয়সী। প্যাস্টেল ও জলরঙে বেশির ভাগ ছবি আঁকতেন। তাঁর স্মরণে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এর ঘরে সভার আয়োজন। সভানেত্রী লেডি রাণু মুখোপাধ্যায়। উপস্থিত শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন রথীন মৈত্র, নীরদ মজুমদার ও আরও অনেকে। শিল্পীদের কিছু কথা জানতে পারব—এই লোভে সেখানে গিয়েছি। প্রকৃতির ছবি আঁকতেন গোপাল ঘোষ, শুধু এটুকুই জানতাম। একজন বললেন, 'প্রকৃতি আঁকতেন গোপাল ঘোষ, মানুষদের পিঁপড়ের আকারে আঁকতেন, গাছপালা পাহাড়পর্বত বনজঙ্গলের ছবি আঁকতেন অনেক বড় করে। আমরাও প্রকৃতিকে আঁকি, অমন ফারাক দেখাতে সাহস হয় না।'

আকারের অতো বেশি রকমফের ঘটিয়ে ছবি আঁকতেন না যদিও ধীরেনকৃষ্ণ, প্রকৃতিকে নিবিড় করে রং তুলিতে ফুটিয়ে তুলতেন। মানুষ আঁকছেন যখন, কেমন যেন মনে হত, প্রকৃতির অংশ হিসেবেই সে ছবির ইজেলে ধরা পড়েছে। ছবির কিছু শিরোনাম থেকে শিল্পীর মেজাজ আমরা অনুভব করতে পারব। 'ছায়াচ্ছন্ন গাছের নীচে', 'হাওড়া নদী (আগরতলা)-র পাশে বাজার হাট', 'আমাদের বাড়ির ছোট্ট এক কোণে', 'সাঁওতাল মেয়েদের ঘাস সংগ্রহ', 'ডিম বিক্রেতা', 'বস্তিতে মুদীর দোকান', 'জল বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ত্রিপুরার আদিবাসী নারী', 'বাঁশবাজার (আগরতলা)', 'ঝাঁকা মাথায় গাঁয়ের মেয়েরা', 'সাপুড়ে', 'শীতের সকালে সাঁওতাল মেয়ে' এইসব আরও অনেক একইরকমের দৃশ্যকল্প।

কলাভবনের অধ্যক্ষ প্রবীর বিশ্বাস আলাপচারিতায় জানালেন, 'টেম্পেরায় ধীরেনদার কোন তুলনা ছিল না। হাত মুঠো করলে আঙুলের ভাঁজগুলো পর্যন্ত তিনি ছবিতে তুলে আনতে পারতেন।' শিল্পীর প্রত্যক্ষ ছাত্রী সংঘমিত্রা

নন্দী জানালেন, একটা ছবি আঁকতে গিয়ে ছোট কোন বিশেষ জিনিসের উপর 'হাইলাইট' করতে বলতেন। চিত্রকর্মতো আর নিছক ফটোগ্রাফি নয়। (যাঁরা আলো রঙের মায়া দিয়ে ছবি তুলেন, তাঁরা কি শুধু চিত্রগ্রাহক? তাঁদেরতো আমরা শিল্পীই বলি)। প্রকৃতির দৃশ্যে কেমন জীবনকে তুমি 'হাইলাইট' করছো তার উপর শিল্পীর জীবনবীক্ষা ফুটে উঠবে। কথাটা শুনে শিল্পী গোপাল ঘোষের কথা মনে পড়েছিল। পিঁপড়ের মতো মানুষ আর উঁচু উঁচু প্রকৃতি দেখলে শিল্পীর জীবনবোধইতো আমাদের কাছে স্পষ্টরূপে ধরা পড়ে।

ধীরেনকৃষ্ণের কাজ পৃথিবীর বহুদেশে প্রদর্শিত হয়েছে। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ইজিপ্ট, রাশিয়া, মেক্সিকো ও লাতিন আমেরিকার বহু দেশে তাঁর শিল্পসামগ্রী চিত্ররসিক মানুষেরা দেখেছেন। কলাভবনে তাঁর ছবির প্রদর্শনীর বেলায় যে পরিচিতি প্রকাশিত হয়েছিল সেখানে 'Staff and Students of Kala-Bhavana'—এর পক্ষ থেকে লেখা হয়েছে ঃ

'ভারতের খুব কম শিল্পী এমন দাবি করতে পারবেন যে তাঁরা ধীরেনকৃষ্ণের মতো পৃথিবীর এতো বেশি দেশ ভ্রমণ করেছেন। ভারতের খুব কম শিল্পী এমন দাবি করতে পারবেন যে তাঁরা ধীরেনকৃষ্ণের মতো পৃথিবীর এতো সংখ্যক বড়মাপের শিল্পী ও শিল্প বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। অথচ এসব কথা কোথাও তিনি মুখ ফুটে বলেননি। বলতে চান না। মাঝে মাঝে তাঁর লেখালিখিতে ইতিউতি চোখে পড়ে।'

বইয়ের অলংকরণের কাজে ধীরেনকৃষ্ণ সময় দিতেন। ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত সাহিত্যপত্র 'রবি'র একাধিক প্রচ্ছদ এঁকেছেন ধীরেনকৃষ্ণ। পত্রিকাটি একসময় সম্পাদনা করতেন অসামান্য গায়ক নরেন্দ্র দেববর্মন। দিনু ঠাকুরের ছাত্র। শিল্পীর সঙ্গে তাঁর চিঠি লেখালেখিও হত। অলংকরণের কথা বললেই তিনটি বইয়ের কথা মনে পড়ে। 'রাজমালা'। যা ছোটদের উপযোগী করে চিত্রশিল্পী রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর অগ্রজ ভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী রচনা করেছিলেন। বইয়ে প্রচুর চিত্র রমেন্দ্রনাথ আর সন্তোষ লাহিড়িমশায় এঁকেছেন। একটি উঁচুমাপের কাজ ছিল ধীরেনকৃষ্ণের। ভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কথা এই প্রসঙ্গে খানিকটা বলতে হয়।

ভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। বাবা শীতলচন্দ্র চক্রবর্তী। 'রবি' (নবপর্যায়) পত্রিকায় (১৩৬৮ সাল) রাজ্যেশ্বর মিত্র লিখছেন, 'উমাকান্ত একাডেমির অধ্যাপক ভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় ১৯২৬/২৭ সালে আমাদের ইস্কুলে রবীন্দ্রনাথের বহু বিখ্যাত গান শেখাতে আরম্ভ করেন। ভূপেন্দ্রবাবুর মত অসাধারণ ব্যক্তি

আমি খুব কমই দেখেছি। আগরতলার মত জায়গার মধ্যে তিনি কিছু বেশি পরিমাণে অগ্রসর ছিলেন। এই কারণে তাঁর প্রতিভার তেমন সমাদর হয়নি। কিন্তু আজ বুঝি তিনি কত বিষয়ে আমাদের ভাবতে শিখিয়েছিলেন। শুধু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত ও সাহিত্য সম্বন্ধেই নয়, সংস্কৃতির নানা বিষয়েই তিনি বহুভাবে আমাদের উৎসুক্য জাগ্রত করেছিলেন।' ত্রিপুরায় জনশিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম নেতা নীলমণি দেববর্মা লিখছেন, 'তখন উমাকান্ত একাডেমীর হেডমাস্টার ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। নিষ্ঠাচারী, গম্ভীর। কোন কথাই বলতেন না। ছাত্ররাও শ্রদ্ধায়, ভয়ে চুপচাপ বসে থাকতো।'

'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' পুস্তকে ভূপেন্দ্রচন্দ্রের কাছে লেখা রবীন্দ্রনাথের তিনটি চিঠি সংকলিত হয়েছে। একটি চিঠি ১৩২৭ বাংলায় নিউইয়র্ক শহর থেকে লেখা। বাংলাভাষার গরিমা বিষয়ে লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩৪ সালের ৩১ অক্টোবর বাবা শীতলচন্দ্রের মৃত্যুতে ভূপেন্দ্রচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ মাদ্রাজ থেকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। ভূপেন্দ্রচন্দ্র রচিত 'রাজমালা'র বিদ্যালয় সংস্করণ একসময় ত্রিপুরায় ছাত্রছাত্রীদের দ্রুত পঠন হিসেবে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিশিষ্ট বিজ্ঞান সাহিত্যিক ও ধীরেনকৃষ্ণের আশ্রম-স্কুলের মাস্টারমশাই ছিলেন জগদানন্দ রায়। তাঁর দু'খানাা বইয়ের ভূমিকায় আমরা শিল্পী ধীরেকৃষ্ণের উল্লেখ দেখতে পাই।

নিবেদন

প্রথম বই 'মাছ ব্যাঙ্ সাপ'। ১৩৩০ সালের আশ্বিন মাসে শান্তিনিকেতনের ঠিকানায় জগদানন্দ বইয়ের 'নিবেদন' রচনা করেছেন।

'বইখানির নাম "মাছ ব্যাঙ্ সাপ" হইলেও ইহাতে কুমীর, কচ্ছপ, টিকটিকি ও গিরগিটি প্রভৃতি আরো অনেক প্রাণীর বৃত্তান্ত আছে। বালক-বালিকারা যাহাতে এইসব প্রাণীর পরিচয় গ্রহণ করিতে পারে তাহার জন্য সরল ভাষায় পুস্তকখানি লিখিবার চেষ্টা করিয়াছি। তাহারা পুস্তকপাঠে আনন্দ ও শিক্ষালাভ করিলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

বিশ্বভারতীর অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে শ্রীমান্ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমান ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব-শর্ম্মা এই পুস্তকের কয়েকখানি ছবি আঁকিয়া দিয়াছেন। এই সুযোগে তাঁহাদিগের নিকটে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।'

শ্রী জগদানন্দ রায়

'তখন মুক্ত দ্বার পথে ত্রিপুরসেনা গড়ের মধ্যে ঢুকিতে লাগিল।'
ভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী রচিত 'রাজমালা'য়
ধীরেনকৃষ্ণের অলঙ্করণ

খেয়াল রাখতে হয় আমাদের, তখন ধীরেনকৃষ্ণ কলাবিভাগের ছাত্র। বিনোদবিহারীও তাই।

পরের বইটি 'পাখী'। বাংলা ১৩৩১ সালে প্রকাশিত হয়। বর্ধমান মহারাজ বিজয়চাঁদ মহাতাবকে বইটি জগদানন্দ উৎসর্গ করেছিলেন। এই বইয়ের মুদ্রক হিসেবে যে ঠিকানা প্রকাশিত ছিল তা খুবই আকর্ষণীয়। 'Printed by Kartik Chandra Bose for U. Ray & Sons, Printers, 100 Gurpar Road, Calcutta.'

বইয়ের নিবেদন আমরা সংক্ষেপে পেশ করেছি।

নিবেদন

'পাখী' প্রকাশিত হইল। ....সুবিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় এবং বিশ্বভারতীর কলাবিভাগের ছাত্র শ্রীমান্ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব-শর্ম্মা এই পুস্তকের কয়েকখানি ছবি আঁকিয়া দিয়াছেন। এই সুযোগে তাঁহাদের নিকটে এবং পুস্তক-প্রকাশক মহাশয়দিগের নিকটে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

শান্তিনিকেতন
বৈশাখ, ১৩৩১

শ্রীজগদানন্দ রায়

সুরের ভুবনে চারুকারিগর

ধীরেনকৃষ্ণ এস্রাজ বাজাতেন চমৎকার। বাঁশি, পিয়ানো ও বেহালা বাজাতে পারতেন খুব ভাল। মন্টেগু সাহেব যখন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছাত্র ধীরেনকৃষ্ণের সেখানে ডাক পড়েছিল। সাহেবকে বাঁশি বাজিয়ে শোনাতে হবে। এস্রাজের কথা বলতেই ধীরেনকৃষ্ণের লেখা কয়েকটি লাইন মনে পড়ল।

একদিনের সকালবেলা। দোতলায় রথীন্দ্রনাথের বসবার ঘরে গুরুদেব এস্রাজ নিয়ে ধীরেন্দ্রকৃষ্ণকে যাবার জন্য ডেকে পাঠালেন। ঘরে তখন বসে রয়েছেন রাইচাঁদ বড়াল। আজমির থেকে এসেছেন ওস্তাদ মংগীলাল। ঘরে ঢুকতেই পরিচয়ের পর 'গুরুদেব আমাকে এস্রাজ বাজিয়ে শোনাতে বললেন। গুরুদেবের কয়েকটি গান বাজিয়ে শোনালাম। (সঙ্গীতজ্ঞদের আগমন, স্মৃতিপটে, পৃ : ১৩৩)'।

রবীন্দ্রনাথ শিল্পীকে একবার বীণা শিখতে বলেছিলেন। শিল্পীরও সোজাসরল জবাব, 'বীণা শিক্ষায় রেওয়াজের পরিশ্রমের কথা ভেবে আর সাহস করিনি।'

রবীন্দ্রনাথ জয়সিংহ। দিনেন্দ্রনাথ রঘুপতি। 'বিসর্জন' নাটকের একটি অভিনয় ১৯২৩ সালে কলকাতার এম্পায়ার থিয়েটার মঞ্চে হয়েছিল। সাহানা দেবীর গান দিয়ে নাটক শুরু হয়। গানের সঙ্গে পিয়ানো বাজিয়েছিলেন ধীরেনকৃষ্ণ। কবি যখন 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' এ গান রেকর্ড করতে যেতেন, ধীরেনের এস্রাজ ছাড়া আর কারও কথা ভাবতেই পারতেন না। কবির বিখ্যাত গান 'অন্ধজনে দেহ আলো...' কবির গলায় যাঁরা শুনেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই এস্রাজের অনুসঙ্গ বিস্মৃত হননি। শিল্প ও সঙ্গীতপ্রতিভার এই যুগল মিলন আমরা ধীরেন্দ্রকৃষ্ণের নিকটাত্মীয় অনিলকৃষ্ণের মধ্যেও দেখতে পাই। ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ আর অনিলকৃষ্ণ ছিলেন দুই সহোদর ব্রজকৃষ্ণ আর রাধাকৃষ্ণ দেববর্মনের সন্তান। অনিলকৃষ্ণের নিবিড় বন্ধু ছিলেন কিংবদন্তী সঙ্গীতসাধক ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ। চিত্রকর হিসেবেও অনিলকৃষ্ণের কাজ দেখে আমাদের বিস্মিত হতে হয়। ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ তেমনি চিত্রকর্মে প্রকাশিত হলেন বেশি। দক্ষতা সত্ত্বেও সঙ্গীত সাধনাকে অন্তরালে লালন করেছিলেন। অনিলকৃষ্ণের জীবনকথার এক

অন্তরঙ্গ পরিচিতি আমরা তাঁর কনিষ্ঠপুত্র ধবলকৃষ্ণের লেখালেখি থেকে পেয়ে যাই। নানা রকমের বাদ্যযন্ত্র বানাতে পারতেন অনিলকৃষ্ণ। নিজের হাতে তৈরি করে একটি এস্রাজ তিনি এক বছরের অনুজ ধীরেন্দ্রকৃষ্ণকে দিয়েছিলেন। শামুকের মুখের অনুকৃতি ছিল এই এস্রাজ যন্ত্রের। এস্রাজের প্রথম হাতে খড়ি তাঁর অনিলকৃষ্ণের কাছেই সম্পাদিত হয়।

কলাভবনে যখন ধীরেনকৃষ্ণ ছাত্র তখন ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে এস্রাজ বাজাতেন। সব ছাত্র ও মাস্টারমশায়েরা মিলে সেই বাজনা উপভোগ করতেন। রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে। নন্দলালের চিঠিতে আমরা শিল্পীর এস্রাজের উল্লেখ দেখতে পাই।

১৩৩২ সালের ১০ই বৈশাখ। শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ ধীরেনকৃষ্ণকে লিখলেন,

'ধীরেন, এবার বসন্ত উৎসবের অভিনয়ে তোর এসরাজের ছড়ির কথাটা বারবার মনে এসেছিল।'

ধীরেনকৃষ্ণের এস্রাজবাদন কলাভবনে কতটা ভালোবাসার হয়ে উঠেছিল আমরা সমরেশ বসুর 'দেখি নাই ফিরে'র একটি আখ্যান উল্লেখ করতে পারি।

'ধীরেন্দ্র দেববর্ম্মা তাঁর তুলি ডুবিয়ে দিলেন জলের পাত্রে। বাকিরা সবাই যে-যার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলো। নন্দলাল তাঁর তুলি জলের পাত্রে ডুবিয়ে ধীরেন্দ্রর দিকে হেসে তাকালেন, "এবার তাহলে একটু হোক?"

"সাধু সাধু"! অর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় আর সত্যেন্দ্র এক সঙ্গে উচ্চারণ করে, তাদের তুলি ডুবিয়ে দিল জলের পাত্রে।

সবাই একে একে জলের পাত্রে তাঁদের তুলি ডুবিয়ে দিলেন। কী শুরু হবে? রামকিঙ্কর ধীরেন্দ্র দেববর্মার দিকে অবাক জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো। ধীরেন্দ্র তাঁর পাশের রাখা এস্রাজ আর ছড় তুলে নিলেন। কোলের বাঁ দিকে এস্রাজ বুকে ঠেকিয়ে রেখে, ছড়ের বালামে, রজন ঘষে নিলেন। হেসে তাকালেন সকলের দিকে, "কারো কোনো ডিম্যান্ড আছে?"

"মেঘের পরে মেঘ জমেছে"। নন্দলাল খোলা দরজা দিয়ে, বারান্দার দিকে তাকালেন।"

শুরু হল বাজনা। শুরু হল ইন্দুলেখার গান। "মেঘের পরে মেঘ জমেছে আঁধার করে আসে..."।'

সমরেশ বসু লিখছেন তারপর, '... গান থামলো না। এস্রাজের বাজনাও থামলো না। ধীরেন্দ্র দেববর্মার নরুনচেরা দু চোখ মুদ্রিত। যেন সুরের মধ্যে

সঙ্গীতাচার্য অনিলকৃষ্ণের উপহার এই এস্রাজ।
সুরের ভুবনে মগ্ন ধীরেনকৃষ্ণ

ডুবে গিয়ে বাজাচ্ছেন। ইন্দুলেখার গান থামতেই, ধীরেন্দ্র দেববর্মার এস্রাজে নতুন আর একটি গানের সুর বেজে উঠলো। "এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না / মন উড়েছে উড়ুক না রে মেলে দিয়ে গানের পাখনা।..." এস্রাজের বাজনা গানকে দিল এক নতুন দ্যোতনা। আবার গান। নন্দলালের স্বরে হাসি ঝরা উচ্ছ্বাস বেজে উঠলো, "আমার বীণায় গান ছিল / আর তোমার ডালায় ফুল ছিল...।'

কাহিনি এখনও অন্যদিকে বাঁক নেয়নি। বাজনা ও ইন্দুলেখার গান থামতেই "ছোটখাটো ফরসা বিনোদবিহারীর গম্ভীর স্বর বেজে উঠলো, "তিনেতে থামতে নেই। শত্তুর হয়।"

"ঠিক, বিনোদের কথা মানতেই হয়।" নন্দলাল ঘাড় ঝাঁকিয়ে হেসে সায় দিলেন। সকলেই সায় দিল "সাধু, সাধু।"

ধীরেন্দ্র দেববর্মার এস্রাজ সুরে বেজে উঠলো। ইন্দুলেখা গাইলেন, "আমার মন মানে না, দিন রজনী। আমি কী কথা স্মরিয়া এ তনু ভরিয়া / পুলক রাখিতে নারি।"...

ধীরেনকৃষ্ণের এস্রাজের সুর শুনতে রামকিঙ্করেরও মন পড়ে থাকত। একদিনের ঘটনা। স্বর্ণপদক পেয়েছেন রামকিঙ্কর। সবাই খুশি। হাসি ঠাট্টা হচ্ছিল সবাই মিলে। নন্দলাল, বিনোদবিহারী, রামকিঙ্কর, ধীরেনকৃষ্ণ রয়েছেন। কথায় কথায় ধীরেনকৃষ্ণ বললেন, "আজ কলাভবনের গৌরবের দিন। মাস্টারমশাই আমাদের গুরু। কিন্তু রামকিঙ্কর মাত্র সেইদিন এসেছে। এক বছরও পুরো হয় নাই। সেও যে স্বর্ণপদক পেয়েছে, সেটা সব চেয়ে বড় কথা।"

"ঠিক বলেছো ধীরেন।" নন্দলাল হেসে মাথা ঝাঁকালেন, "এখন কী ভাবে সেলিব্রেট করা যায় তোমরাই বল।"

নানা প্রস্তাব আসছিল। রামকিঙ্করের পছন্দ নয়। নিজেই বললেন রামকিঙ্কর, "তার চেয়ে ধীরেনদা এস্রাজ বাজান।" ...নন্দলাল খুশি হলেন, "রামকিঙ্কর শিল্পীর মতোই কথা বলেছে। মানপত্র নয়। ধীরেনের একটু এস্রাজের বাজনা, আর ইন্দুলেখাদির গান। এই তো শিল্পীর পুরস্কার!" "তা হলে আগে গান শুরু হোক।" ধীরেন দেববর্মন হেসে তাঁর পাশ থেকে এস্রাজ তুলে নিলেন।... ধীরেন্দ্র দেববর্মনের এস্রাজের ছড়ের টানে গানের সুর উঠলো বেজে। রামকিঙ্কর নত মুখে, গানের কথা উচ্চারণ করলো, "... নইলে কী আর

শিল্পী-কৃত 'রবি'র প্রচ্ছদ

পারব তোমার / চরণ ছুঁতে।" ওর ভিতরের আনন্দে কেন যেন অশ্রুধারা টলটলিয়ে উঠছে।

ইন্দুলেখা প্রথম গানের পরে দ্বিতীয় গান ধরলো, "জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ / ধন্য হল ধন্য হল মানব জীবন।" ...ধীরেনদা'র এস্রাজ ইন্দুলেখাদির গলার স্বরে সুর মিলিয়ে বাজলো। ...সাবিত্রী যেন তৈরি ছিল। ...ধীরেনদা সাবিত্রীর গুণগুণানি শুনেই এস্রাজের তারে ছড় ছুঁইয়ে সুর তুললেন। সাবিত্রী গাইলো, "কবে তুমি আসবে বলে, রইব না বসে / আমি চলব বাহিরে / শুকনো ফুলের পাতাগুলি পড়তেছে ঝরে / আমার সময় নাহিরে...।" সাবিত্রী তার দ্বিতীয় গানে, নতুন সুরে দিল ভাসিয়ে, "আজি এনেছি তাঁহারি আশীর্বাদ প্রভাত কিরণে / পবিত্র করপরশ পেয়ে ধরণী লুটিছে তাঁহারি চরণে..."। ধীরেন্দ্র দেববর্মনের এস্রাজ ঠিক সুরটি জুড়ে দিল সাবিত্রীর গলার মিষ্টি স্বরে। ...ধীরেন্দ্র বর্মন একবার এস্রাজের তারে ছড় টেনে, সামান্য একটু সুর তুললেন, "জয় হোক মাস্টারমশাইয়ের, জয় হোক রামকিঙ্করের।"

'দেখি নাই ফিরে' ও শিল্পী ধীরেনকৃষ্ণ

শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজের জীবননির্ভর উপন্যাস 'দেখি নাই ফিরে।' লেখক সমরেশ বসু। অসমাপ্ত এই উপন্যাসে ধীরেনকৃষ্ণের কথা বারবার আলোচিত হয়েছে।

'প্রবাসী'-র সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পরিকল্পনামাফিক বাঁকুড়ার ছেলে রামকিঙ্কর শান্তিনিকেতনে এসেছেন। মাস্টারমশাই নন্দলাল বসুর সঙ্গে দেখা হল। নন্দলাল তাঁর চায়ের কাপ তুলে চুমুক দিলেন, 'হ্যাঁ, বসো হে রামকিঙ্কর। এখন থেকে তুমি কলাভবনের একজন। এরা সবাই তোমার বন্ধু। ধীরেন অবিশ্যি শিক্ষক। ঐ ওর নাম ধীরেন্দ্রকুমার দেববর্মা—কলাভবনের একজন শিক্ষক।'

সমরেশ বসু লিখছেন, 'রামকিঙ্কর...তাকালো ধীরেন্দ্রকুমার* দেববর্মার দিকে। উনি কি বাঙালী? ফর্সা মুখ, চেরা চোখ। নাক তোলা বটে। গালের হনু দুটো কিঞ্চিৎ উঁচু। চীনা চীনা ভাব।

দেববর্মা দু' হাত কপালে ঠেকিয়ে হাসলেন, "কাজের সময় ভাল করে পরিচয় হবে।" এরপর 'প্রবাসী' পত্রিকায় ছবি বেরোনো নিয়ে কথা হচ্ছিল। পরিচয়ের পালা চলছে যখন, কলাভবনের ছাত্র 'সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় ধীরেন দেববর্মার দিকে হাত তুলে দেখালো, "ধীরেনদার ছবি"? "দেখ্যেচি।" রামকিঙ্কর তাকালো ধীরেন্দ্র দেববর্মার দিকে। চোখের সামনে ভেসে উঠলো, ওঁর আঁকা, 'প্রবাসী' পত্রিকার ছবি। বুদ্ধদেব বসে আছেন গাছতলায়। অদূরে সুজাতা—পূজারিণী। মাথায় মাটির পাত্র, বাঁ হাতে ফুলফলের সাজি।' রামকিঙ্করের সঙ্গে পরপর অর্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, হীরাচাঁদ দুগার, মণীন্দ্র দাশগুপ্ত, বীরভদ্র রাও, বিনায়ক মাসোজী—সবার সঙ্গেই পরিচয় হল। নন্দলাল বসু তো ছিলেন-ই। সমরেশ লিখছেন, নন্দলাল হঠাৎ অস্থির হয়ে নিজের বকবক করা নিয়ে নিজেকেই তিরস্কার করলেন। 'বকছি তো বকছিই।' আমরা দেখব, মাস্টারমশাইকে তাঁর ছাত্ররা কেমন চোখে দেখছেন। ধীরেন্দ্র দেববর্মা কি বলেছিলেন তখন?

---

* ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ

"মাস্টারমশাই, আরো বকুন, আরো শুনি।" ধীরেন্দ্র দেববর্মা জোড় হাত বুকের কাছে তুলে ধরলেন, 'একটা সারাদিন, অন্য কাজ রেখে, আপনি এমনি করে বলুন, আমরা শুনব।...'

নন্দলাল ধীরেনকৃষ্ণের উপর কতটা আস্থা রাখতেন তার পরিচয়ও আমরা সমরেশের এমন আখ্যান থেকে পেশ করতে পারি।

কেমন ছবি আঁকে রামকিঙ্কর তা বোঝানোর জন্য বাড়ি থেকে সে তেলরঙের ছবি এনেছে। খুলে সবাইকে দেখিয়েছে। সবার চোখ ছানাবড়া। তেলরঙ দেখলে যে মাস্টারমশাই রেগে যান। ওমা, রাগলেন কই! কারও মুখেই বিশেষ রা সরে না। এরপর সরাসরি লেখা থেকে লিখছি।

'নন্দলাল হেসে মুখ ফেরালেন ধীরেন্দ্র বর্মার দিকে। "তুমি কলাভবনের একজন শিক্ষক। আমরা কেন তেলরঙের ছবি চর্চা করিনে, রামকিঙ্করকে তুমিই সেটা বুঝিয়ে বল।" যদিও বিনয়ী ধীরেনকৃষ্ণ জবাব দিয়েছিলেন, 'মাস্টারমশাই, আপনি থাকতে আমি কেন বুঝিয়ে বলব? আপনিই বলুন, আমরাও শুনি।' তবে ধীরেনকৃষ্ণকেই শেষ অব্দি বলতে হল।

"আচ্ছা, আমিই রামকিঙ্করকে বলছি। মাস্টারমশাইয়ের এটা আদেশ বলেই আমি মনে করি। তবে তোমাদের সবাইকে আমার নতুন করে কিছু বলার নেই। রামকিঙ্কর ছাড়া, তোমরা অনেকেই অনেক ছবি এঁকেছ। পত্রিকায় ছবি ছাপা হয়েছে। আর সে-সব ছবিই ভারতীয় পদ্ধতিতে আঁকা। ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটির, আমাদের শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কন রীতির আন্দোলনের নেতৃত্ব আমরা গ্রহণ করেছি।"

রামকিঙ্কর কথাগুলো গভীরভাবে শুনছিলেন। 'ধীরেন্দ্র দেববর্মা আর একবার আস্তে গলা খাঁকারি দিলেন, "ভারতবর্ষের হাজার হাজার বছর অতীতের শিল্পীরাই আমাদের আদর্শ। তাঁদের সৃষ্ট শিল্প আমাদের গৌরব, দেশের গৌরব। তাঁরা কোনো কালে তেলরঙ আঁকেননি। অজন্তা বা বাঘগুহার গুহাচিত্র তেলরঙে আঁকা হয়নি, কিন্তু আজও সেইসব গুহাচিত্র একেবারে নষ্ট হয়ে যায়নি। তবে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে যদি নষ্ট হতে আরম্ভ করে, সে দোষ অতীতের শিল্পীদের নয়। সে দোষ বর্তাবে আমাদের ওপর। এ দেশের শাসকের ওপর। ইওরোপের শিল্পীদের তেলরঙে আঁকা সব শিল্প অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে রক্ষা করা হয়। অবশ্য এদেশের শাসকও আমাদের গুহাচিত্র রক্ষার ব্যাপারে অবহেলা করছে না। বুদ্ধের জন্মের পাঁচশো বছর

চিত্রকর ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা

পরেও যদি অজন্তার চিত্র আঁকা হয়ে থাকে, তা হলে প্রায় দু' হাজার বছর আগের আঁকা গুহার ছবি দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। তা হলে, আমাদের দেশের শিল্পীরা এমন রঙ তৈরির পদ্ধতি জানতেন, যা হাজার বছরের চেয়েও বেশি কাল অবিকল থাকে। তবে আমরা কেন বিদেশের তেলরঙ...।'

বিস্ময়ের পালা বাড়ছিল রামকিঙ্করের। ধীরেনকৃষ্ণ তাঁর বলার কথা তখনও শেষ করেননি।

"চীন, জাপান, এশিয়ার কোনো দেশই, পশ্চিমের তেলরঙ তাঁদের শিল্পে ব্যবহার করেননি।...আমাদের দেশের জয়পুর বা রাজপুত বা মোগল চিত্রেও তেলরঙ ছিল না। আমাদের অঙ্কন পদ্ধতি হওয়া উচিত একান্ত ভারতীয়। ভারতীয় রঙের এই যুগ যুগান্তের রহস্য নিয়ে নানান আলোচনা, আর পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। একই কথা ভারতীয় ভাস্কর্য সম্পর্কেও। ইলোরার পাথর কাটা অনবদ্য মূর্তিগুলো তার প্রমাণ। অনেক মন্দিরের পাথরের গায়ে, ভাস্কর্যের নিদর্শন তার প্রমাণ। আমাদের দেশের শিল্পীরা অষ্টধাতুর কাজও জানতেন; অনেক দেবদেবীর মূর্তি তৈরি করেছেন, করেছেন কষ্টিপাথরের কাজ। মার্বেল আর ব্রোঞ্জকাস্টই পৃথিবীতে ভাস্কর্যের একমাত্র পদ্ধতি বা আদর্শ হতে পারে না। ওই সময়ে কলাভবনে ধীরেনকৃষ্ণ অতোটাই সবার আপন যে নবাগত রামকিঙ্কর বুঝতে পারছিলেন না, "এখানে কে ওর গুরু?...ধীরেন্দ্র দেববর্মা? নন্দলাল বসু?"

নন্দলাল যে তাঁর গুরু, এই নিয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। অবশ্য মাঝে মাঝে দেখি, বড়োরা বলছেন, সত্যিই কি কেউ গুরু ছিলেন কিঙ্করের? যাক সে আলাদা কথা। তবে নন্দলাল কলাভবনে না থাকলে কিঙ্করের দায়ভার ধীরেনের হাতেই দিয়ে যেতেন। একটা চিঠিতেও নন্দলাল ধীরেনকে এমন কথা বলেছেন। এসব জানতে পেরেই সমরেশ লিখেছিলেন, 'ধীরেন্দ্র দেববর্মা ওর আঁকা দেখছেন। মাঝে মাঝে বলেছেন, "ডিজাইন কর, ডেকোরেটিভ ডিজাইন। একদিন ডিজাইন করবে। আর একদিন কম্পোজিশন করবে।"

পাঠক জানেন, রামকিঙ্কর রামকিঙ্কর-ই। সবার ভালোবাসা পেয়েছেন। লেখাপড়া না জানা মানুষ, লেখাপড়া বেশি জানা মানুষ—কেউই তাঁকে অবহেলা করতে পারতেন না। আমরা দেখেছি, কলাভবনের যাঁরাই ইতিহাস ও চিত্রভাস্কর্য চর্চা নিয়ে স্মৃতিচারণ করেছেন, রামকিঙ্কর তাঁদের আলোচনায়

সিংহভাগ জায়গা দখল করতেন। সত্যিকারের 'বর্ণময় মানুষ' বলতে রামকিঙ্করকেই বোঝায়।

রামকিঙ্করের কাজ যখন কলাভবনের আলোচনার বিষয়, নন্দলাল যখন ধীরে ধীরে তাঁর এই ছাত্রকে একটু বেশি ভালোবেসে ফেলছেন, ছবির প্রকৃতি নিয়ে ধীরেনকৃষ্ণের অভিমতকে মাস্টারমশাই গুরুত্ব দিতেন। একবার কিঙ্করের একটা ছবি দেখে আলোচনা শুরু হয়। কেউ বলেছিল র‍্যাফেলের মা আঁকতে, কিঙ্কর আপন মনে যা এঁকেছে তা লব কুশের মা সীতা। কোন তুলনা চলে না এমন ছবির। ছবি নিয়ে যখন কথা হচ্ছে, 'ধীরেন্দ্র দেব মাথা নাড়লেন, "মাস্টারমশাই, আমি বলব?"

"বল"। নন্দলালের মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হলো।

ধীরেন্দ্র দেব সকলের দিকে একবার দেখলেন। তাঁর মুখ গম্ভীর ও চিন্তাশীল, "আসলে মাস্টারমশাইয়ের কথার জবাবটা আমি দিচ্ছি। কেবলমাত্র দেশাত্মবোধ থেকে শিল্পীর ভাবের জগতে কোনো ছবির সৃষ্টি হয় না। দেশাত্মবোধ খুব বড় কথা। ওটা তো জন্মগত। গুরুদেবের অনেক লেখা, বিশেষ করে গান দিয়েই তা আমরা বুঝেছি। দেশাত্মবোধের ভাবনা থেকে, শিল্পীর মনোজগতে সে একটি ছবি আঁকে। ঐ মনোজগৎই হল অমর্ত্যলোক। ভাবলোক। সেখানে যে ছবিটি আঁকা হয়, সেটি বাস্তবের সঙ্গে হুবহু মেলে না। একটা অন্য মাত্রা পায়, যা বাস্তবের হুবহু ছবি থেকে অনেক সুন্দর। ওটা হলো শিল্পীর আঁকা ছবি। ঐ ছবিতেই শিল্পীর নিজস্ব পরিচয় মেলে। এবার তোমরা ভাবো, গগনেন্দ্রনাথের ছবির কথা। আমাদের শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের ছবির কথা, তাহলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে।"

এইখানেই সুযোগ পেয়ে আমরা ধীরেনকৃষ্ণের অন্য একটা গুণের কথা বলে ফেলি। মূর্তি গড়তে জানতেন ধীরেনকৃষ্ণ। মাটি দিয়ে মূর্তি গড়তে পারতেন। উজির বাড়িতে দীর্ঘকাল ধরে দুর্গাপুজো হয়। আরও অনেকের সঙ্গে তিনিও ছোটবেলা থেকে মূর্তিগড়া দেখেছেন। একবছরের বড় খুড়তুতো ভাই অনিলকৃষ্ণের সঙ্গে এই নিয়ে কাজ করেছেন। জনশিক্ষা আন্দোলনের সময় চম্পকনগরের 'লোকশিক্ষালয়'-এ যখন পড়াতেন তিনি, আদিবাসী ছাত্রদের মডেলিং শেখাতেন। এখনও তাঁর দু'চার জন ছাত্র সেখানে রয়েছেন। চম্পকনগর এলাকায় গেলে বোঝা যায়, সাধারণ জিনিস থেকে ভাস্কর্য গড়ে তোলার একরকমের অভিব্যক্তি আজও সেইসব মানুষের মনে ভেসে বেড়ায়।

আবার চলে যাই 'দেখি নাই ফিরে'-র পাতায়। রামকিঙ্কর যখন প্রতিমা

গড়লেন, কলাভবনের সবাই অবাক। ছবি আঁকে সে দুরন্ত। প্রতিমাও গড়ে নাকি? যখন তাঁর প্রতিমা নিয়ে কথা হচ্ছিল, নন্দলাল বলছিলেন, "...ও যে এতো ভালো প্রতিমা গড়তে পারে, এ ধারণা আমার ছিল না। মাটি নিয়ে একটু ঘাঁটাঘাঁটি করার অভ্যেস আমার আর ধীরেনের আছে। সে অভ্যেস রামকিঙ্করের মতো এমন পুরো প্রতিমা গড়া নয়। এর দায়িত্ব অনেক বেশি। এটি পুতুল খেলা নয়।"

একজন চিত্রশিল্পী একজন ভাস্কর হতে পারেন। দু'জনেরই স্বপ্ন দেখতে জানতে হয়। রঙ চাপাতে আর মনের অন্দরমহলে অবয়ব গড়তে জানতে হয়। স্বপ্ন বাদ দিয়েও তো কিছু প্রথামাফিক কাজকর্ম থাকে। কিছু উপায় ও প্রকরণ জানতে হয়। ধীরেনকৃষ্ণ দুটো পথেই যে ওয়াকিবহাল ছিলেন যথেষ্ট, এই নিয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নেই।

আমরা আলখাল্লা পরে হাজির হতাম

আমার কিশোর বয়সের নরম মনের ওপর পৌষ মেলার যে স্মৃতি ধরা আছে তা আজও মলিন হয়নি। কালের অতল গর্ভ থেকে আমায় হাতড়ে হাতড়ে পৌষ মেলার স্মৃতিকে টেনে আনতে হয় না। এখন অবশ্য এই অশক্ত শরীরে ভিড় ঠেলে মেলায় যাওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু পৌষ মেলার কথা ভাবলেই শরীরে অদ্ভুত একটা রোমাঞ্চ জাগে।

ছোটবেলায় কিন্তু আমার দেখা পৌষ মেলার চেহারাটা ছিল অন্যরকম। এখনকার মতো এত ঔজ্জ্বল্য বা চাকচিক্য ছিল না। গ্রামীণ ভাবটা পুরোপুরি ফুটে উঠত একদিনের ওই মেলাতে। প্রথম দিকে তো মেলা একদিন হত। কিন্তু পূর্বপল্লীর মাঠে মেলা স্থানান্তরিত হওয়ার পরই শহর এসে গ্রামকে বেশ কিছুটা গ্রাস করে নিল।

আমি এখানকার ব্রহ্মচর্য স্কুলে পড়তাম। সেই সময় আমাদের প্রত্যেকেরই একটা করে গেরুয়া রঙের আলখাল্লা থাকত। মেলার দিন আমরা ওই আলখাল্লা পরে সারিবদ্ধভাবে শালবীথিকার মধ্যে দিয়ে মেলায় আসতাম। ওই অল্প বয়েসেও মন্দিরে উপাসনা আমাদের ভীষণ আকর্ষণ করত।

স্কুলে আমরা দু'জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল—একজন হচ্ছে বীরেন কাওয়া অপরজন প্রমথনাথ বিশি। বীরেনকে আমরা কাওয়াদি বলে ডাকতাম। আর ও আমাকে বলত ল্যাংচাকুকি। আসলে আমরা আগরতলার লোক বলেই এই কথা বলত।

একবার মেলার দিন সকালে বীরেন ক্রমাগত আমায় ল্যাংচাকুকি বলে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ সহ্য করার পর কাওয়াকে শালগাছে ঠেসে দু'হাত দিয়ে চেপে ধরলাম। বীরেন তখন অনুনয় বিনয় করতে শুরু করেছে।

বীরেন, প্রমথ, আমি এবং অন্যান্য ছাত্ররা মেলার জন্য উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করতাম। তখন মন্দিরের পাশে যে রাস্তা সেই জায়গাটা সুন্দর করে সাজানো হত, দোকানপাটও বসত। খাবারের দোকানই অবশ্য বেশি থাকত। খাওয়া, মেলা ঘোরা ও গুরুদেবের উপাসনা আমাদের মন্ত্রমুগ্ধের মতো আকর্ষণ করত।

ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মনের জীবনাবসান

দেবীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়: শান্তিনিকেতন, ১০ সেপ্টেম্বর — শান্তিনিকেতনের প্রবীণতম আশ্রমিক-শিল্পী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মন শনিবার সন্ধ্যায় প্রয়াত হয়েছেন। বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। মৃত্যু সংবাদ শুনে প্রবীণ শিল্পী প্রভাস সেন, সোমনাথ হোর, দিনকর কৌশিক, কে জি সুব্রহ্মণ্যম শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আসেন তাঁর বাসভবনে। বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে মরদেহে পুষ্পার্ঘ্য করেন উপাচার্য দিলীপ সিংহ। কলাভবনের চত্বরে মরদেহ রাখা হয়। সেখানে ছাত্রছাত্রীরা শেষ শ্রদ্ধা জানান। জন্ম ১৯০১ সালে ত্রিপুরা রাজ্যের সম্মানিত উজির পরিবারে। ১৯১১ থেকে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র। ১৯২৭ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মালয় সিঙ্গাপুর জাভা ও বালিদ্বীপ ভ্রমণ
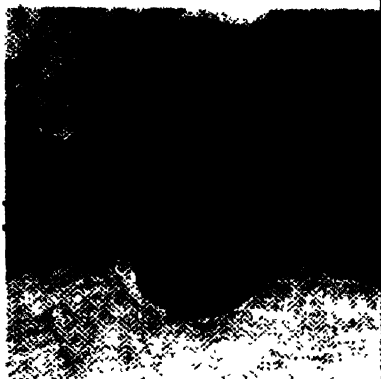
সংবাদপত্রের পাতায় শিল্পীর প্রয়াণসংবাদ

গ্যালারী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ

আয়োজিত

শিল্পাচার্য
ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ স্মরণ

১৭সেপ্টেম্বর সাড়ে ছ'টায়

কৃষ্ণায়ণ, এডভাইসার চৌমুহনী

শিল্পীর বাসভবনে তাঁরই স্মৃতিসভা

আগরতলা : প্রয়াত কৃতী শিল্পী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণের স্মৃতিতে তাঁরই সাবেক বাসভবন অধুনা কৃষ্ণনগরস্থিত 'কৃষ্ণায়ন'-এ শিল্পীর এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় গত ১৭ই সেপ্টেম্বর। 'গ্যালারি ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ' ছিল এর উদ্যোক্তা। সভার সূচনায় গ্যালারির সম্পাদক শম্ভু রক্ষিত শিল্পীকে গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বহুধা বিস্তৃত শিল্পীর শিল্পচর্চার ইতিহাস ঐতিহ্য ও অবদানের কথা উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে কৃষ্ণনগর প্রধান রাস্তাটিকে প্রয়াত শিল্পীর নামে নামাঙ্কিত করার জন্যও এক সর্বসম্মত প্রস্তাবও গৃহীত হয়। স্মরণসভায় সংগীত পরিবেশন করেন আলো ভট্টাচার্য, সংঘমিত্রা নন্দী। বক্তব্য রাখেন বিপুলকান্তি সাহা, প্রণব বর্ধন, প্রশান্ত সেনগুপ্ত। সকলেই তাদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রয়াত শিল্পীর জীবন ও দর্শন ব্যাখ্যা করেন।

[illegible]রেন্দ্র[illegible]ষ্ণ দেববর্মণের [illegible]সভা অনুষ্ঠিত

[illegible]
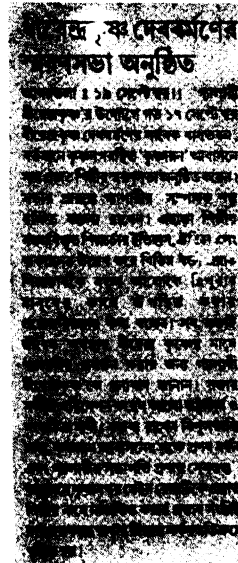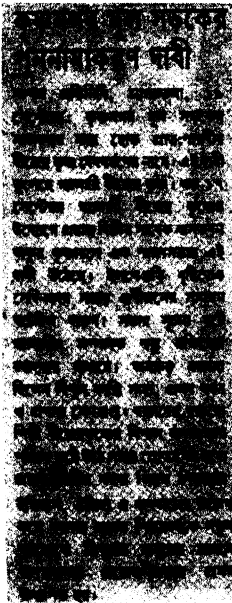
ত্রিপুরার মাটিতে ধীরেনকৃষ্ণ স্মরণ

উপাসনার দিন সকালে গুরুদেব মন্দিরের গেট পার হয়ে সিঁড়িতে উঠেই গম্ভীর আওয়াজে ঘন্টাটা বাজাতেন। ওই শব্দ শোনার পরই আলখাল্লা পরিহিত আমরা সারিবদ্ধভাবে এসে গুরুদেবকে প্রণাম করে মন্দিরে প্রবেশ করে নিজেদের জায়গায় বসে পড়তাম। শুরু হত উপাসনা ও গান। উপাসনা শেষ করে গুরুদেব মন্দিরের দরজা থেকেই তাঁর গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন মেলার দিকে। তারপর ধীর পদক্ষেপে হেঁটে ফিরে যেতেন।

গত বছর তিনেক আর ভরা মেলায় যেতে পারি না। তবে আগে এই মেলা উপলক্ষে পুরনো ছাত্রদের সঙ্গে দেখা হত। বহুদিন বাদে দেখা হওয়ার ফলে উভয়পক্ষের মধ্যেই আবেগের আতিশয্যটা বেশি থাকত কিন্তু এখন আর কারও সঙ্গে দেখা হয় না। স্মৃতি রোমন্থনও করতে পারি না। তবে আমি প্রায় একুশ বছর শান্তিনিকেতনের বাইরে ছিলাম। কাজের সূত্রে বিদেশ যেতে হয়েছিল। তবে গুরুদেব বা মাস্টারমশাই-এর সঙ্গে সময় পেলেই দেখা করে যেতাম। ১৯৫১ সালে আবার শান্তিনিকেতনে ফিরে আসি। এবং এরপর থেকেই পৌষ মেলা আমাকে আরও জড়িয়ে ধরল। কোনও দায়িত্বভার বহন না করলেও মেলাকে কেন্দ্র করে আমি সকলের মতোই আনন্দে মেতে উঠতাম।

রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে আগরতলায় 'ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদ' বলে একটি প্রতিষ্ঠানের উন্মেষ ঘটে। অধ্যাপক বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী ছিলেন তার প্রধানতম প্রাণপুরুষ। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মন। ব্রজেন্দ্রকিশোরের প্রয়াণের পর ধীরেনকৃষ্ণ এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন।
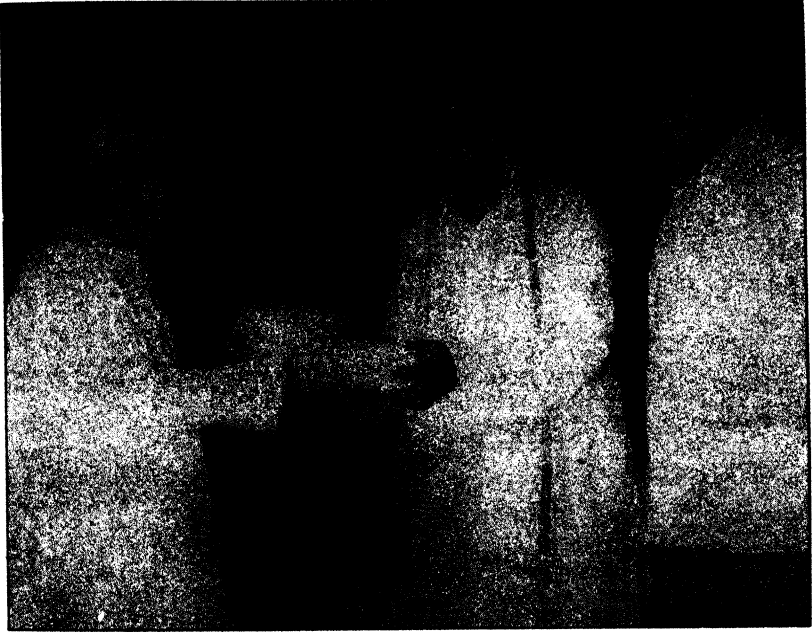
ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের কর্মীরা
শিল্পীকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন

শিল্পীর নির্বাচিত রচনা

রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার মহারাজাদের মধ্যে এমন কী রাজোচিত গুণাবলীর পরিচয় পেয়েছিলেন যার জন্য বৃদ্ধ বয়সেও মহারাজাদের প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ? তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে উত্তরায়ণে শ্যামলী গৃহে যখন দেখা করতে গিয়েছিলাম তখন কথাপ্রসঙ্গে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "ভারতের বহু রাজা মহারাজাদের দেখেছি, ভারতীয় পুরাণ কাব্য পাঠ করে প্রাচীন কালের রাজাদের সম্বন্ধে যে উচ্চ ধারণা মনে জন্মায় সেই-সব গুণ তোদের ত্রিপুরার মহারাজাদের মধ্যে দেখেছি। সম্পদে হয়তো ত্রিপুরার চেয়ে অনেক ধনী মহারাজারা ভারতে থাকতে পারেন কিন্তু রাজার যথার্থ গুণের অধিকারী ত্রিপুরার মহারাজাদের মতো খুব কমই দেখেছি।"

রবীন্দ্রনাথ-লিখিত 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যটি ১২৮৮ সালে প্রকাশিত হয়। মহারাজা বীরচন্দ্র তাঁর প্রিয়তমা প্রধানা মহিষী ভানুমতীর (১২৮৯ সালে) মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকাহত হয়ে পড়েন। এই সময়ে 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যটি পাঠ করে তিনি মুগ্ধ হন। কাব্যের লেখক রবীন্দ্রনাথকে তাঁর প্রশংসা জানাবার জন্য মহারাজার একান্ত সচিব রাধারমণ ঘোষকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে প্রেরণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : "সেই সময়ে আমাকে এবং আমার লেখা সম্বন্ধে খুব অল্প লোকেই জানতেন। আমার পরিচয় তখন কেবলমাত্র আমার আত্মীয়স্বজন নিকটতম বন্ধুজনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। একদিন, এই সময়ে ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুরের দূত আমার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন। বালক আমি, সসঙ্কোচে আমি তাঁকে অভ্যর্থনা করলাম। আপনারা হয়তো অনেকেই দূত মহাশয়ের নাম জানেন—তিনি রাধারমণ ঘোষ। মহারাজ তাঁকে সুদূর ত্রিপুরা হ'তে বিশেষভাবে পাঠিয়েছিলেন কেবল জানাতে যে, আমাকে তিনি কবিরূপে অভিনন্দিত করতে ইচ্ছা করেন। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় বালক কবির বিস্ময়ের সীমা রহিল না।" এই ঘটনার পর থেকেই মহারাজ বীরচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে ওঠে, যদিও উভয়ের মধ্যে বয়সের অনেক ব্যবধান ছিল। তখন বীরচন্দ্রমাণিক্যের বয়স ৪৩ বৎসর এবং রবীন্দ্রনাথের ১৯/২০ বৎসর বয়স।

জানা যায় মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের পূর্বে তাঁর পিতা কৃষ্ণকিশোরমাণিক্যকে একবার প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সাহায্যপ্রার্থী হতে হয়েছিল। দ্বারকানাথের প্রভাব রাজপুরুষ ও কলকাতা সমাজে তখন অপ্রতিহত। তাঁরই সহায়তায় কৃষ্ণকিশোরমাণিক্য সেই সংকট থেকে উদ্ধার পেয়েছিলেন। এই যোগসূত্রকেই রবীন্দ্রনাথ নিবিড়ভাবে চিরস্মরণীয় করেছিলেন পরবর্তীকালে। ত্রিপুরার অতীত ইতিহাসের ঘটনাকে অবলম্বন করে 'রাজর্ষি', 'মুকুট' ও 'বিসর্জন' লিখে রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরাকে সাহিত্যজগতে চিরস্থায়ী করে গেছেন। 'রাজর্ষি' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১২৯৩ সালে মাঘ মাসে। 'বিসর্জন' প্রকাশিত হয় ১২৯৭ সালে।

ত্রিপুরার প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণের অন্যতম কারণ এই রাজ্যের রাজভাষা হচ্ছে বাংলা। মহারাজাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে-সব পত্রালাপ হয়েছিল সেইসব সুলিখিত পত্রের শব্দবিন্যাস এত সুন্দর ছিল যার জন্য তিনি উচ্চ প্রশংসা করতেন। বীরচন্দ্রমাণিক্য নিজে একজন সুকবি এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি কতগুলি কাব্যগ্রন্থ এবং সংগীতও রচনা করেন। পূর্বে এক সময়ে আগরতলায় বীরচন্দ্রমাণিক্যের রচিত সংগীত সংকীর্তনে বা হোলি ইত্যাদি উৎসবে গাওয়া হত। রাজপরিবারের মধ্যে বাংলা সাহিত্যচর্চার প্রচলন একসময় বেশ ছিল। মহারাজ বীরচন্দ্রের কন্যা রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী ত্রিপুরার সুপরিচিত কবি ছিলেন। তাঁর লিখিত তিনখানি কাব্যগ্রন্থ ত্রিপুরায় এবং ত্রিপুরার বাইরে বাংলা সাহিত্যজগতে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেছে। এই পরিবেশে প্রতিভাবান কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে মহারাজ কবি বীরচন্দ্র অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। ১৩০১ সালে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য বীরচন্দ্রমাণিক্য কার্সিয়াং যান। সেই সময় রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করে সঙ্গে নিয়ে যান। কবির মুখে কবিতাপাঠ ও গান শুনে মহারাজ বীরচন্দ্র অত্যন্ত আনন্দবোধ করতেন। কবি বলেছিলেন মহারাজ বীরচন্দ্র একজন অসাধারণ সংগীতবিশারদ, তাঁর সামনে গান গাওয়া খুবই সংকোচের বিষয় কিন্তু তাঁর স্নেহের প্রশ্রয় পেয়ে গান গাইতে সাহস পেতেন। কলকাতায় যখনই বীরচন্দ্র আসতেন তখন রবীন্দ্রনাথকে ডেকে নিতেন এবং সৌম্যদর্শন কবির মুখে কবিতা আবৃত্তি, গান শুনতেন। দ্বিতীয়বার ১৩০৩ সনের কার্তিক মাসে মহারাজ বীরচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ কার্সিয়াং যান। নবীন কবির সাহিত্যপ্রতিভা মহারাজ বীরচন্দ্র ইতিমধ্যেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি কবির নিকট ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে তাঁর সম্পাদনায় বৈষ্ণব পদাবলী ও সাহিত্যের যথাসম্ভব সম্পূর্ণভাবে সংগ্রহ ও প্রকাশ করবার জন্য। এই কাজের দায়িত্ব

গ্রহণে রবীন্দ্রনাথ সম্মতি জানান। আর্থিক ব্যয়ভার মহারাজা বহন করবেন বলে স্থির হয়। এই অভিপ্রায়ে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করবার সংকল্প তাঁর ছিল। কিন্তু তারপরই তাঁর সহসা মৃত্যু হওয়াতে সে সংকল্প সফল হতে পারেনি। অগ্রহায়ণ মাসে মহারাজা বীরচন্দ্রের মৃত্যু হয়। কার্সিয়াঙে দ্বিতীয়বার অবস্থানের সময়ে একটি ঘটনার কথা বলতে গিয়ে মহিম ঠাকুর উল্লেখ করছেন : "রাত প্রায় ১০টা বাজিয়া যাইত, অবিশ্রামভাবে মহারাজ রবীন্দ্রনাথকে লইয়া সংগীত এবং কাব্য আলোচনায় মগ্ন থাকিতেন।"

মহারাজ বীরচন্দ্রের সুযোগ্য পুত্র রাধাকিশোর রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন, ১৮৯৭ ইংরাজী সনে। রাধাকিশোরমাণিক্য রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী ছিলেন। পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব ও প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞানে নতুন আবিষ্কার করবার পর বিলাতে গিয়ে সেই সম্বন্ধে প্রচার করবার সুযোগ পাচ্ছিলেন না অর্থাভাবে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জগদীশবাবুর বন্ধুত্ব ছিল। বিজ্ঞানী বন্ধুর অর্থাভাব মোচনের অভিপ্রায়ে কবি একবার আগরতলায় এলেন। মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য তাঁকে অতি সমাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। মহারাজার সঙ্গে আলাপের সময় সুবিধা বুঝে রবীন্দ্রনাথ জানালেন যে তিনি ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে মহারাজের নিকট এসেছেন। কবির এই উক্তি শুনে মহারাজ কবিকে বললেন, "আপনি কবিমানুষ, আপনার হাতে বীণা বা একতারা মানায়, ভিক্ষার ঝুলি নয়। আমি হচ্ছি সত্যিকার ভিক্ষুক, আমার কোনো আয় নেই। প্রজারা দয়া করে যদি আমাকে খেতে দেয় তবেই আমি দু'মুঠো অন্ন খেতে পাই।" কবি তখন উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেন, "বিজ্ঞানী জগদীশ বসু তাঁর নব আবিষ্কার বিলাতে প্রচার করতে পারছেন না অর্থাভাবে। এ বিষয়ে মহারাজের সাহায্য প্রার্থনা করি।" কবির মুখে এই কথা জেনে মহারাজ বললেন, "আমাদের দেশের গুণী পণ্ডিত ব্যক্তিরা অর্থের অভাবে নিজেদের বিদ্যাপ্রচারে বিদেশে যদি না যেতে পারে এটা তো আমাদের সকলের পক্ষে লজ্জাকর ব্যাপার, আমরা রাজা মহারাজারা আছি কিসের জন্য।" কবিকে মহারাজা অর্থ দিতে চাইলেন জগদীশ বসুর জন্য তবে একটি শর্তে, এই অর্থসাহায্যের কথা কোথাও প্রচার করা চলবে না। কবি শর্ত মেনে নিলে মহারাজা কবির হাতে বেশ কয়েক হাজার টাকা বিজ্ঞানী বন্ধুর জন্য প্রদান করেছিলেন। এ কথাও বলেছিলেন যে ভবিষ্যতে প্রয়োজনমতো আরো অর্থসাহায্য করবেন। জগদীশ বসু যখন দ্বিতীয় বার বিলাত গিয়েছিলেন

রাধাকিশোরমাণিক্য তখনো অর্থসাহায্য করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলে মনে করি।

রাধাকিশোরমাণিক্যের নাতি বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য রাজসিংহাসনে অধিরোহনকালে বেশ ঘটা করে অভিষেক উৎসব পালিত হয়। আগরতলায় বিরাট অভিষেকপ্যাণ্ডেলে সেদিন সকাল থেকে আমন্ত্রিত বহু জ্ঞানী গুণী ব্যক্তির সমাবেশ হয়। রাজদরবারীদের সকলেই সুন্দর পোশাকে সজ্জিত হয়ে উপস্থিত ছিলেন। আমিও সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলাম। স্যার জগদীশচন্দ্র বসুও বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমরা দুজন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিলাম। স্যার জগদীশ বসু আমাকে বললেন, "দেখুন, বহু পূর্বে ত্রিপুরার মহারাজ রাধাকিশোমাণিক্য আমাকে যে অর্থ সাহায্য করেছিলেন সেই কথা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতে পারি নি কারণ আমরা তাঁর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম। আজ তো সেই মহারাজ নেই, তাই আমি আজ মুক্তকণ্ঠে সকলকেই বলব একদিন ত্রিপুরা মহারাজ আমাকে কী ভাবে অর্থসাহায্য করেছিলেন।" তাঁর এই উক্তিতে সেদিন খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম।

১৩১২ সনের ১৭ আষাঢ় ত্রিপুরা-সাহিত্যসম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা দিবসে উমাকান্ত অ্যাকাডেমী স্কুলগৃহে সন্ধ্যার দিকে শহরের জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা এসে মিলিত হন। মহারাজা রাধাকিশোরমাণিক্য বন্ধু কবি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখেন সভার স্থানে দুটি আসন পাতা হয়েছে। একটি উচ্চাসন ও অপরটি সকলের সমান করে পাতা। সভার উচ্চ স্থানে রবীন্দ্রনাথকে বসিয়ে রাধাকিশোরমাণিক্য নীচের আসনে গিয়ে বসেন। সসংকোচে রবীন্দ্রনাথ মহারাজকে উচ্চাসনে বসবার জন্য অনুরোধ করতে থাকেন। তখন মহারাজ কবিকে বললেন, "দেখুন এটা একটা সাহিত্যসভা, এ সভায় আপনারই উচ্চাসনে বসা উচিত, এখানে আমার আসন নিচুতে।"

৭ই পৌষ, ১৩০৮ সালে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়। বিদ্যালয়ের আদর্শ কী হবে তাই নিয়ে অনেক জল্পনাকল্পনা হয়। মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য এই সময়ে বিদ্যালয়ের সাহায্যে পাঁচ হাজার টাকা প্রদান করেছিলেন। তা ভিন্ন বাৎসরিক এক হাজার করে টাকা দিতেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই টাকা দীর্ঘকাল ধরে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের এবং পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্বভারতী হওয়ার সময়েও নিয়মমতো পাওয়া গিয়েছিল। রাধাকিশোরমাণিক্য ব্রহ্মবিদ্যালয় দর্শনে ১৩১১ সনে একবার এসেছিলেন। তাঁর ইচ্ছায় আগরতলা থেকে অনেক ছাত্র রাজবৃত্তি লাভ করে ব্রহ্মবিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য আসে। মহারাজ রাধাকিশোর
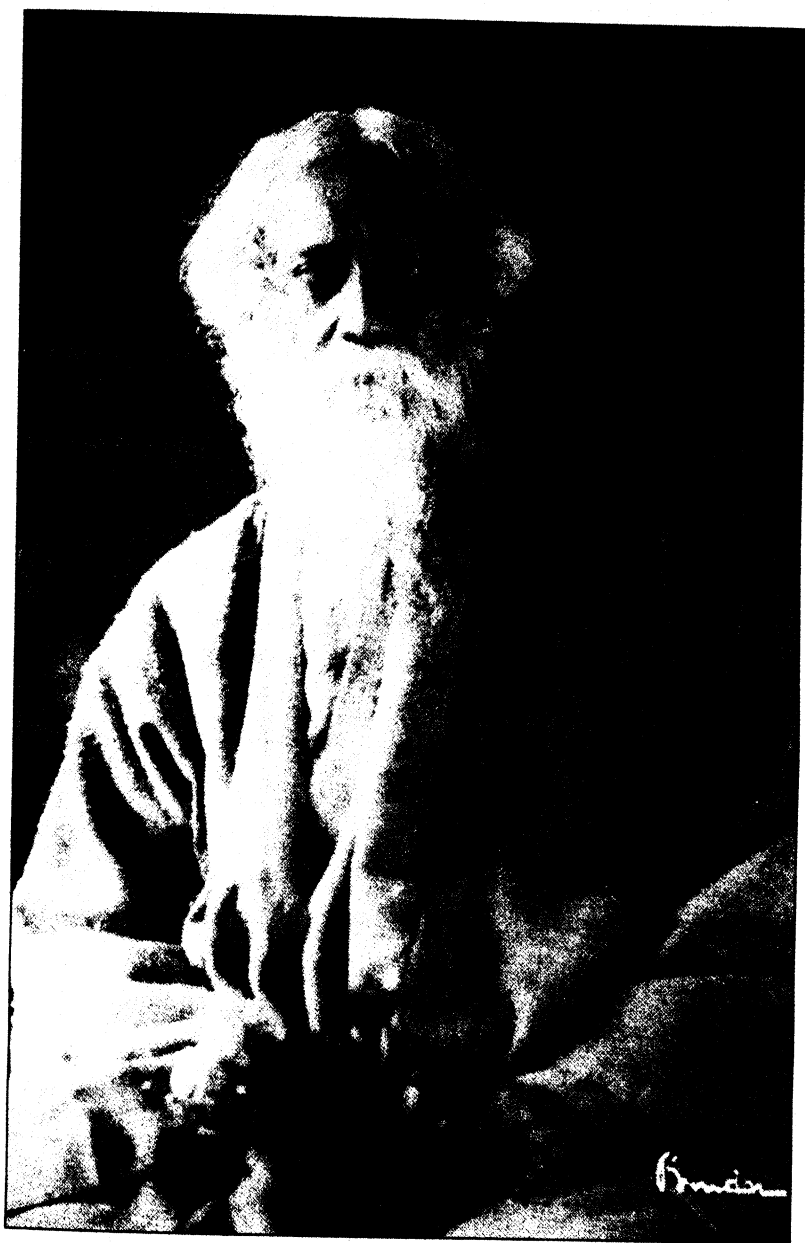
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আগরতলায় একটি অবৈতনিক কলেজ স্থাপন করেন। তিনি বলতেন দেশের রাজা বিদ্যা বিক্রি করে না কিন্তু বিদ্যা দান করে। আগরতলার কাছেই কুমিল্লা কলেজ, আগরতলায় অবৈতনিক কলেজ হওয়াতে তার প্রতিক্রিয়া কুমিল্লা কলেজে দেখা দেবে—এই অজুহাতে আগরতলায় অবৈতনিক কলেজ করবার বিষয়ে ইংরেজ শাসক আপত্তি জানাল। মহারাজ বিরক্ত হয়ে কলেজের কাজ বন্ধ করে দেবার আদেশ দিলেন এবং বিজ্ঞান বিষয়ে সমস্ত মূল্যবান যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রাদি রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মবিদ্যালয়কে প্রদান করলেন। ব্রহ্মবিদ্যালয়ে নিচু ক্লাসেও বিজ্ঞান পড়ানো হত। অধ্যাপক সন্তোষ মজুমদার একবার আমাদের বিজ্ঞান ক্লাসের যন্ত্রপাতি ও আসবাবসমূহ দেখিয়ে বলেছিলেন এই সমস্তই ত্রিপুরার মহারাজার কাছ থেকে পাওয়া। পুরোনো ধরনের একটি কাঠের তৈরি দূরবীনও এইসব সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। অধ্যাপক জগদানন্দ রায় এই দূরবীন দিয়ে আমাদের গ্রহনক্ষত্র দেখাতেন।

মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্যের পরে তাঁর পুত্র বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্যের রাজত্বকালেও রবীন্দ্রনাথ আগরতলায় কয়েকবার আসেন। কুঞ্জবন প্রাসাদে অথবা মালঞ্চাবাসে অবস্থান করতেন। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে তিনি মুগ্ধ হন। কবির পক্ষে স্বাভাবিক, মনে গান রচনার প্রেরণা জাগায়, তিনি "দোলে প্রেমের দোলনচাঁপা", "ফাগুনের নবীন আনন্দে", "এসো আমার ঘরে" ইত্যাদি কয়েকটি গান রচনা করেন। মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরের বাড়িতে মণিপুরী নৃত্য দেখে কবি মুগ্ধ হন এবং শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের এই নৃত্য শিক্ষা দানের অভিপ্রায়ে প্রথমে মণিপুরী রাজকুমার বুদ্ধমন্ত সিংকে শান্তিনিকেতনে ১৯১৯ সালে নিয়ে আসা হয়। তিনি কিছুকাল পরে চলে গেলে তাঁর স্থানে নবকুমার সিং এই নৃত্য শিক্ষাদানের জন্য আসেন। এই নৃত্যশিক্ষকের মধ্যে শিল্পীর গুণপনা রবীন্দ্রনাথ দেখতে পেলেন। রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে মণিপুরী নৃত্যের সংযোগ এবং নূতন নূতন নৃত্যের উদ্ভাবনার ক্ষমতা নবকুমারের মধ্যে থাকায় রবীন্দ্রনাথ খুবই আনন্দিত হন। তাঁর নামকরা কতগুলি গীতিনাট্যের নৃত্যাদি নবকুমারের শিক্ষায় বিশেষভাবে সুন্দর ও সাফল্য লাভ করে। নটীর পূজা, শাপমোচন, চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা, শ্যামা ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরায় শেষবারের মতো আসেন ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। তারপর আর ত্রিপুরায় পদার্পণ করেননি। কুঞ্জবন রাজপ্রাসাদে কবি অবস্থান করেছিলেন। কবির পরিণত বয়স, কবি দার্শনিক সংগীতস্রষ্টা চিত্রশিল্পী

বলে জগৎজোড়া খ্যাতি। মহারাজ বীরবিক্রমমাণিক্যের অভিপ্রায়ে আগরতলা থেকে উমাকান্ত অ্যাকাডেমি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শান্তিনিকেতনে এলেন এবং অতি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে উত্তরায়ণে গিয়ে ত্রিপুরার মহারাজপ্রদত্ত "ভারত ভাস্কর" মানপত্রটি বিশ্বকবির হাতে তুলে দিলেন। কীভাবে এই অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হল আশ্রমবাসী আমরা অনেকেই জানতেই পারলাম না। রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিকে এই মানপত্র আরো সুন্দর, শোভন ও উপযুক্তভাবে দেওয়ার ব্যবস্থা হতে পারত বলে অনেকে তখন মন্তব্য করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আমন্ত্রণে মহারাজ বীরবিক্রম সপারিষদ ৭ জানুয়ারি ১৯৩৯ সালে শান্তিনিকেতনে আসেন। উত্তরায়ণে মহারাজার থাকার ব্যবস্থা হয়। আম্রকুঞ্জে মহারাজকে গুরুদেব সমস্ত আশ্রমবাসীসহ উপযুক্তভাবে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে গুরুদেব তার ভাষণে বীরচন্দ্রমাণিক্য, রাধাকিশোরমাণিক্যের পুরোনো স্মৃতির কথা উল্লেখ করেছিলেন। রাত্রে উত্তরায়ণে 'চণ্ডালিকা' গীতিনাট্য অভিনীত হয়। আমার ক্যামেরা দিয়ে গুরুদেব ও মহারাজের এবং সপারিষদ মহারাজ ও গুরুদেবের কয়েকটি ফোটো তুলেছিলাম। সংগীতভবনের অনুষ্ঠান-মঞ্চ বা স্টেজ-তৈরি বাবদ ব্যয়ের জন্য মহারাজ ২০ হাজার টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি তখন দিয়েছিলেন। মহারাজ দুদিনের বেশি শান্তিনিকেতনে অবস্থান করতে পারেন নি কারণ তাঁর ব্রহ্মদেশ ভ্রমণের তারিখ পূর্বেই স্থির করা ছিল।

ত্রিপুরার পরম সৌভাগ্য, রবীন্দ্রনাথের মতো মহান ব্যক্তির বন্ধুত্ব চারজন মহারাজার আমল ধরে পেয়েছিল। তা ছাড়া কলকাতার বহু শ্রেষ্ঠ গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সংস্পর্শে মহারাজাদের আসার সুযোগ হয়েছিল যাঁরা রবীন্দ্রনাথের বন্ধু ব্যক্তি বা আত্মীয়স্বজন ছিলেন। যার জন্য রাধাকিশোরমাণিক্য বলেছিলেন অর্থবলের চেয়ে বন্ধুবল অনেক বেশি কাম্য। মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য রবীন্দ্রপ্রতিভা সর্বপ্রথমে উপলব্ধি করে বয়সের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে তুলেছিলেন। উভয়েই কবি ছিলেন বলে যখনই মিলিত হতেন তখন কাব্যালোচনা, কবির মুখে কবিতা আবৃত্তি গান ইত্যাদি শুনে পরম তৃপ্তি লাভ করতেন। রাধাকিশোরমাণিক্য ও রবীন্দ্রনাথ সমবয়সী ছিলেন বলে উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বের বিস্তার বহু বিষয়ে ছিল। রাজ্য পরিচালনা থেকে শুরু করে সাংসারিক, সন্তানদের লেখাপড়া, আরো অনেক বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সুপরামর্শ সাদরে গ্রহণ করতেন। এইসব বিষয়সংক্রান্তে রবীন্দ্রনাথের বহু পত্রাদি রাধাকিশোরমাণিক্যের নিকটে ছিল। শুনতে পাওয়া যায় এইসব চিঠিপত্র

সযত্নে বাণ্ডিল করে লালফিতার দ্বারা বেঁধে রাখতেন। কিন্তু বড়োই দুঃখের বিষয় পরবর্তীকালে এইসব অমূল্য পত্রাদির আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। রবীন্দ্রপ্রতিভা তাঁর কাব্যে, সাহিত্যে, সংগীতে, চিত্রে প্রকাশিত হয়েছে। ঐ-সব পত্রাদি যদি পাওয়া যেত তবে রাজ্য পরিচালনায়ও রবীন্দ্রপ্রতিভার নূতন পথের সন্ধান দিতে পারত। মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরকে লেখা কিছু পত্রাদিতে এইসব বিষয়ের নিদর্শন আমরা দেখতে পাই। বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরার মহারাজাদের মধ্যে যে আন্তরিক বন্ধুত্ব ও শ্রদ্ধার সম্বন্ধ ছিল তার থেকে অনায়াসে বলা চলে রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরা রাজ্যের সত্যিকারের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

আশ্রম-বিদ্যালয় ও রবীন্দ্র-স্মৃতি-লিখন

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম আজ শুধু ভারতবর্ষে নয়, ভারতের বাইরে বিদেশের সর্বত্র খ্যাতিলাভ করেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কুল ও কলেজের অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্র-অঙ্কন, কারুশিল্প শিক্ষারও সুব্যবস্থা আছে। শিক্ষার জন্য ভারতের নানা প্রদেশ হতে ছাত্রছাত্রীগণ এখানে আসে, আবার বহু বিদেশী ছাত্রছাত্রীও শিক্ষালাভ করে থাকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে।

কবিগুরু যখন বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শান্তিনিকেতনে আশ্রম-ব্রহ্মবিদ্যালয় নামে এই বিশ্বভারতী বিদ্যালয়ের গোড়া পত্তন করেন তখন একমাত্র বাংলা দেশেই ইহার সামান্য খ্যাতি ছিল। তখনকার দিনে অনেকের ধারণা ছিল যে দুরন্ত ছেলেদের পড়াবার জন্য এই বিদ্যালয়ে পাঠালে তাদের চরিত্রের সংশোধন হয়, ভাল ছেলে গড়ে উঠে। ভারতবর্ষের প্রাচীন তপোবনের শিক্ষার আদর্শের প্রতি দৃষ্টি রেখে তখনকার ব্রহ্মবিদ্যালয়ের শিক্ষা ও পরিচালনার নিয়মাদি রচিত হয়েছিল। ছাত্রগণ প্রাচীনকালের গুরুশিষ্যের সম্বন্ধকে স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব বলে আখ্যা দিয়েছিল। সেই অবধি তিনি আমাদের সকলের নিকট গুরুদেব বলে বরাবর শ্রদ্ধা ও ভক্তি পেয়ে এসেছেন। তখনকার ব্রহ্মবিদ্যালয়ের পরিবেশ ছিল ঠিক প্রাচীন তপোবনেরই মত। গাছপালার ঘন ছায়ায় আবৃত নিস্তব্ধ, সংযত বিদ্যালয়টি। গুরুদেব চেয়েছিলেন এই শিক্ষার স্থানটি হবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দ্বারা পরিবেষ্টিত, সহরের কোলাহল থেকে দূরে অবস্থিত, এই পরিবেশের মধ্যে যাতে সকলে শিক্ষার সঙ্গে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে ও বুঝতে পারে। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে ছাত্রগণ পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ করে শুধু পাশ করাকে যেন জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ না করে, তাদের শিক্ষা যেন সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নত ধরণের হয়। শারীরিক, মানসিক উন্নতি শিক্ষার দ্বারা হওয়া চাই। তখনকার দিনে স্কুল শিক্ষার সঙ্গে ভারতের কোন বিদ্যালয়ে সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্র-অঙ্কন শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবিদ্যালয়ের আরম্ভের সঙ্গে এইসব শিক্ষার প্রয়োজন বোধে তার ব্যবস্থা করেছিলেন। তবে উপযুক্ত শিক্ষকের যথেষ্ট অভাব দেশে ছিল।

১৯১১ ইংরেজি সনের কথা মনে হচ্ছে। তখন আগরতলা সহর হতে মহিম কর্ণেলের বাড়ী ও দুই চারিটি বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বাড়ীর ছেলেরা শান্তিনিকেতনে অধ্যয়ন করত। পূজার ছুটির পরে তাদের সঙ্গে আমি ও আমার বড় ভাই শান্তিনিকেতনে ভর্ত্তি হতে এলাম। তখনকার শান্তিনিকেতনের আয়তন বর্ত্তমানের চেয়ে অনেক ছোট ছিল। কিন্তু তবু কেন জানি স্থানটিকে খুব বড় বলে মনে হত এবং খুব ভাল লেগেছিল। গাছপালা ও পাখীর সমাবেশ আমার ছোট্ট মনকে অত্যন্ত আকৃষ্ট করেছিল। বিশেষ করে বিদ্যালয়ের চতুষ্পার্শ্বের দিগন্তবিস্তৃত মাঠ আর লাল মাটির ঢেউ-খেলান খোয়াই। আলো বাতাসকে এমন নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করবার যেন পূর্বে কখনও সুযোগ হয়নি।

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বয়সানুসারে তিনটি বিভাগে তাদের ভাগ করা হত। ছোট ছেলেদের শিশুবিভাগে, মাঝারিদের মধ্যবিভাগে এবং বড়দের আদ্যবিভাগে রাখা হত। প্রত্যেক বিভাগের ছাত্রাবাস ভিন্ন ভিন্ন ছিল। বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট দৈনিক-পালনীয় নিয়মাবলী প্রত্যেক ছাত্রকেই পালন করতে হত। আমি শিশুবিভাগের একটি ঘরে থাকার স্থান পেলাম। একত্রে আমরা কুড়ি পঁচিশ জন ছাত্র ছিলাম ঐ গৃহে এবং শিক্ষক মহাশয় দুইজন আমাদের সঙ্গে থাকতেন। ঝগড়া ও বন্ধুত্বের সংমিশ্রণে আমাদের ছাত্রজীবন বড় আনন্দে অতিবাহিত হত। গুরুদেবকে বিদ্যালয়ের সভা-সমিতিতে সভাপতিত্ব এবং উৎসবাদিতে পৌরোহিত্য করতে দেখতাম। দিনের প্রথম সাক্ষাতে অন্য ছাত্রদের সঙ্গে মিলে গুরুদেবকে তাঁর পাদস্পর্শ করে প্রণাম করতাম। তবে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপের সুযোগ তখন হত না। আমরা ছিলাম নিম্ন শ্রেণীর ছাত্র, তাই বলে বিজ্ঞান ক্লাশ আমাদের বাদ যেত না। একদিন বিজ্ঞান ক্লাশ ঘরে শিক্ষক সন্তোষ মজুমদার আমাদের ক্লাশ নিচ্ছিলেন। কথার প্রসঙ্গে তিনি আমাকে বল্লেন, "পাশের ঘরে কাঁচের যে সব আলমারী রয়েছে সেগুলি ও বড় যে টেলিস্কোপ দেখছ এইগুলি সবই ত্রিপুরার মহারাজের দান।" তাঁর নিকটেই প্রথম জানতে পারলাম যে ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোরমাণিক্যের সঙ্গে গুরুদেবের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। ত্রিপুরা-দেশের লোক বলে সেদিন আমার এ সংবাদে বড় আনন্দ বোধ হয়েছিল।

কয়েক বছর পরে শিশুবিভাগ ত্যাগ করে মধ্যবিভাগে উন্নীত হয়ে এলাম। শালবীথিকার পাশে নাট্যগৃহ, এইখানে তখন থাকতাম। সন্ধ্যা উপাসনার পর এবং রাত্রের খাওয়ার ঘণ্টার পূর্ব পর্য্যন্ত আমরা খানিকটা সময় পেতাম

নিজেদের আগামীকালের ক্লাশের পড়া তৈরী করবার। এই সময়টাতে সাধারণত সকলেই বই পড়তাম, তবে কেউ কেউ একটু আধটু খেলাও করত। এমনি এক সন্ধ্যায় ছেলেরা না পড়ে কি কারণে গণ্ডগোল করছিল। আমাদেরই একজন হঠাৎ জানলা দিয়ে দেখতে পেল গুরুদেব জানলার বাইরে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা এ কথা জানবামাত্র সকলেই চুপ করে নিজেদের আসনে বই নিয়ে বসে গেলাম। ভাবলাম গুরুদেব হয়ত এসে আমাদের বকুনি দেবেন। তিনি কিন্তু ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করে কাউকে বকলেন না। মুখে তাঁর প্রশান্ত হাসি, আমাদের সকলকে ডেকে বল্লেন একরকম খেলা আমাদের সঙ্গে খেলবেন। আমরা তাড়াতাড়ি ঘরের মেঝের উপর সতরঞ্চি ও আসন পেতে দিলাম তাঁর বসার জন্য। তিনি প্রথমে খেলাটা আমাদের বুঝিয়ে দিলেন এই বলে যে আমাদের মধ্যে কেউ একজন বিদ্যালয়ের কোন এক ব্যাক্তির নাম বা কোন বিশেষ জিনিষের নাম মনে মনে রাখবে, তাকে অন্য যে কেউ সর্বাপেক্ষা কম প্রশ্ন করে যেই নামটি বের করতে পারবে সেই খেলায় জিতবে। গুরুদেব খুব কম প্রশ্নে আমাদের নিকট হতে লোকের নাম বা জিনিষের নাম বের করে দিচ্ছিলেন। ছাত্রদের সঙ্গে নানা রকম নূতন নূতন খেলা খেলতেন। অবশ্য এই খেলাগুলি সবই তাঁরই আবিষ্কার। খেলার মাঠের ধারে বেণুকুঞ্জ ঘরটিতে একবার শিক্ষকদের সঙ্গে গুরুদেবের কি একটা সভা হচ্ছিল। সভার শেষে তিনি বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন, আমরা কয়েকটি ছেলে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে বল্লেন "বলত এটা কি?" এই বলে দু'হাত দিয়ে নিজের দু'কান চেপে আবার ছেড়ে দিলেন। আমরা অনেক কিছু বল্লাম, তিনি শুনে বল্লেন "একটিও হয়নি, এটা হচ্ছে চাপকান।" আমরা ভাবলাম তাইত কান দুটিকে চেপে ধরলেন তাইতেই চাপকান হল।

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ক্লাশে বই পড়াতে গুরুদেব ভালবাসতেন। আমরা তাঁর নিকট ইংরেজি ও বাংলা পড়েছি। খুব সম্ভব তখন আমরা পঞ্চম কিম্বা চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। রাস্কিনের লেখা আমাদের পক্ষে একটু কঠিন বুঝতে কিন্তু এই কঠিন বিষয়ও এই সব শ্রেণীতে পড়াতে তিনি দ্বিধা বোধ করতেন না। পূর্বেই বলেছি, খুব নিম্ন শ্রেণীতেও এই বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান পড়ান হত। গুরুদেবের মত হচ্ছে কঠিন বিষয়কেও যদি সহজ করে বুঝাবার ক্ষমতা শিক্ষকের থাকে তবে তরুণ ছাত্রছাত্রীগণ অনায়াসে এই সব বিষয় বুঝতে ও আয়ত্ত করতে পারবে। প্রথমে কোন ভাল ইংরেজি লেখার বাংলা অনুবাদ

ক্লাশের ছাত্রদের দ্বারা করাতেন। দৈনিক যতটুকু অনুবাদ হত তাকে গুছিয়ে পরিষ্কার ও নির্ভুলভাবে লিখিয়ে আশ্রমের ছাপাখানায় ছাত্রগণ নিজেরা কাগজে ছাপাত। এইভাবে অনুবাদের সংখ্যা যখন বেশ কিছু হল তখন এইগুলিকে পুস্তকাকারে নিজেদেরই বাঁধাতে হত। এই বাংলা লেখাগুলিকে আবার ইংরেজিতে অনুবাদ করা হত। এমনিভাবে তাঁর অনুবাদ-চর্চা পুস্তকখানি লিখিত হয়। বাংলা পড়েছিলাম একটু উঁচু শ্রেণীতে উঠে। গৌর প্রাঙ্গণের পূর্ব সীমান্তে একটি বড় বটগাছ ছিল। এর গোড়ায় একটি খড়ের চালাযুক্ত চারি পাশ খোলা গোল ঘর ছিল। গুরুদেব এইখানে মাটির বেদির উপর আসন পেতে বসতেন ও ছেলেদের ক্লাশে পড়াতেন। আমাদের বাংলা ক্লাশ যখন হ'ত তখন দেখতাম বিদ্যালয়ের অনেক অধ্যাপকেরা এসে আমাদের পাশে বসতেন। ক্ষিতিমোহন বাবু প্রতিদিনই এই ক্লাশে যোগ দিতেন। গুরুদেবের নিকট তাঁর বিখ্যাত বলাকা ও অন্যান্য কবিতা পড়েছিলাম। কবির নিজ মুখে তাঁর কবিতা ও লেখার ব্যাখ্যা শুনার যাঁদের সৌভাগ্য হয়েছে তাঁরা জীবনে হয়ত কখনও এই ক্লাশগুলির কথা ভুলবেন না। আমরা তন্ময় হয়ে তাঁর নিজ কবিতার ব্যাখ্যা শুনতাম।

বিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায়ই ছবি আঁকা ও লেখার একটু চেষ্টা করতাম। শান্তিনিকেতনের এই বিদ্যালয়টি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নামেও পরিচিত ছিল। আমরা সাধারণত আশ্রমই বলতাম। একবার আশ্রম জননী নাম দিয়ে একটি লেখা লিখেছিলাম। যত প্রকার ভাব ও কবিত্ব সমাবেশের কোনো ত্রুটি করিনি এ লেখাটায়। মনে মনে ভাবলাম লেখাটি খুব অপূর্ব হয়েছে। একদিন প্রাতে সোজা গুরুদেবের নিকট গিয়ে উপস্থিত লেখাটি নিয়ে। তিনি তখন কি একটা লেখায় ব্যস্ত ছিলেন। লেখাটি তাঁকে দেখাব বলে এনেছি বলাতেই তিনি নিজের লেখা বন্ধ করে আমার লেখাটি নিয়ে পড়ে দেখতে লাগলেন। লেখাটির বিশেষ কিছু সংশোধন করলেন না কেবল কোথায় 'ড়' হবে আর কোথায় 'র' হবে সেইটুকু সংশোধন করে আমাকে সেইটি ফেরত দিয়ে মন্তব্য করলেন, "লেখাটি হয়েছে বেশ, তবে তুই যে একটি বাঙ্গাল তার প্রমাণ তোর 'ড়' আর 'র' ব্যবহার থেকেই বুঝতে পারা যায়।" এখন মনে হয় কি দুঃসাহসিকের কাজই না তখন করেছিলাম।

মধ্যবিভাগের ছাত্র, নাট্যগৃহে বাস করি। মাটি দিয়ে গুরুদেবের এক পার্শ্বের একটি চেহারা গড়েছিলাম। এই সংবাদটি আমাদের ঘরেরই একজন ছাত্রের নিকট হতে শিক্ষক সন্তোষ মজুমদার পেলেন। একদিন দ্বিপ্রহরের পর

সন্তোষবাবু আমাকে বল্লেন, "চল মাটির কাজটি গুরুদেবকে দেখিয়ে আসি।" আমি একটু লাজুক ছিলাম, গুরুদেবের নিকট যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলাম। সন্তোষবাবু আপত্তি শুনলেন না। মাটির কাজটি সহ আমাকে গুরুদেবের নিকট নিয়ে চল্লেন। গুরুদেব তখন দোতলা ছোট্ট বাড়ী "দেহলীতে" বাস করতেন। তিনি মাটির কাজটি দেখে আমার খুব প্রশংসা করলেন এবং সন্তোষবাবুকে বল্লেন যাতে ভাল করে ড্রইং ও মডেলিং শিক্ষা করি। সেইদিনকার তাঁর প্রশংসা ও উৎসাহদান আমাকে শিল্পী হবার অনেক পাথেয় জুগিয়েছিল। এইভাবে ছোটকাল হতে বহুবার তাঁর নিকট হতে শিল্পবিষয়ে উৎসাহ ও প্রশংসা লাভের সৌভাগ্য হয়েছে।

ছোটকালে বাঁশী বাজাতাম। সভা-সমিতিতে কখনও বাজাইনি। খোলা মাঠে, খোয়াইয়ে ঘুরে ঘুরে বাজাতেই বেশী ভালবাসতাম। গুরুদেব জানতেন যে আমি ভাল বাঁশী বাজাই। মন্টেগু ভারতবর্ষে এলেন ১৯১৬ ইংরেজি সনে। তিনি ছিলেন ভারত সচিব। ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা নির্দ্ধারণ করার উদ্দেশ্যে এখানে আসা। ভারতীয় মনীষী ও রাজনীতিজ্ঞদের সঙ্গে মন্টেগু সাহেব আমাদের দেশের তখনকার অবস্থা নিয়ে আলোচনা করবার চেষ্টা করেন। তিনি যখন কোলকাতায় এলেন তখন গুরুদেবের সঙ্গে আলোচনা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। গুরুদেব শান্তিনিকেতন থেকে কোলকাতায় গেলেন দেখা করবার জন্য। সেখানে গিয়ে একটি টেলিগ্রাম পাঠালেন যাতে আমি অবিলম্বে আমার বাঁশী নিয়ে কোলকাতায় রওনা হই। গুরুদেবের কোলকাতার বাড়ী জোড়াসাঁকোতে সাহেবের সঙ্গে দেখা হবে। এই উপলক্ষে ঐ বাড়ীর একটি অংশে সুন্দর একটি ছবি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল—বিচিত্রা নামে লাল বাড়ীটিতে। আমার জীবনে ছবি প্রদর্শনী এই প্রথম দেখা। কি আগ্রহ সহকারে ছবিগুলি দেখেছিলাম তখন, প্রত্যেকটি ছবি যেন এক একটি আনন্দের উৎস বলে মনে হয়েছিল। শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ প্রদর্শনীর ঘরে ঘুরে ঘুরে দেখছেন, ছবির ভালমন্দের বিষয়ে মন্তব্য করছেন। এই বিখ্যাত শিল্পী ভ্রাতৃদ্বয়কে ঐ প্রথম দেখেছিলাম। মন্টেগু সাহেব জোড়াসাঁকো বাড়ীতে এলেন। গুরুদেবের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেলে আমাকে তিনতলায় গুরুদেবের ঘরে ডেকে পাঠালেন। আমি গুরুদেবের রচিত দু'তিনটি গান বাঁশীতে বাজিয়ে সাহেবকে শুনালাম। এই ধরনের বহু ছোটখাট ঘটনার বিষয় যখন ভাবি তখন স্পষ্ট দেখতে পাই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে লেখাপড়া ভিন্ন আরো অন্য সব গুণ বা ক্ষমতা—যেমন সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্র অঙ্কন ইত্যাদি

থাকলে সেইগুলি যাতে আরো স্ফুরিত হয়, প্রকাশ পায় তার সুযোগ গুরুদেব সর্বদা ছাত্রদের দেবার ব্যবস্থা করতেন। সর্বদা সেইসব ছাত্রদের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন ও উৎসাহ প্রদান করতেন। গুরুদেবের উৎসাহে ও সংস্পর্শে এসে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিখ্যাত অভিধান লেখক হলেন। জগদানন্দ রায় হলেন বিজ্ঞান বিষয়ে লেখক। নন্দলাল বসু ভারতীয় শ্রেষ্ঠ শিল্পী হলেন। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর হলেন রবীন্দ্রগানের ভাণ্ডারী ও রবীন্দ্র সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ গায়ক। গুরুদেব যেন স্পর্শমণি ছিলেন, তাঁর সংস্পর্শে অনেকে অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন। মানুষকে তিনি কখনও ছোট করে দেখেননি, তাই মানুষের শ্রেষ্ঠত্বকে ফুটিয়ে তোলবার তাঁর ক্ষমতা ছিল। তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষার দ্বারা মানুষের মনের সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা ও উন্নতি কিন্তু আংশিক উন্নতি নয়। এই বিশ্বাসেই মানুষের সকল বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের আয়োজন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে করেছিলেন। লেখাপড়া করে কয়েকটি বিষয়ে পাশ করাকে পূর্ণ শিক্ষার যথার্থ উদ্দেশ্য বলে তিনি গ্রহণ করেন নাই। শিক্ষার বিষয়ে তাঁর মতামত তাঁর বহু লেখায় প্রকাশ করে গেছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে আমাদের সময়ে বাগান করার প্রচলন ছিল। প্রত্যেক ছাত্রাবাসের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য প্রতিদিন বিদ্যালয়ের সাধারণ "ক্যাপটেইন" নম্বর দিত। মাসান্তে নম্বর যোগ করে যে গৃহ বেশী নম্বর পেত সেই গৃহের ছাত্রদের পুরস্কৃত করা হত। আমরা যখন নাট্যগৃহের বাসিন্দা তখন সেই গৃহের সংলগ্ন জমিতে তিন চার জন ছাত্র মিলে সুন্দর একটি বাগান করেছিলাম। শীতের মরশুমী ও অন্যান্য ফুল ফুটে খুবই সুন্দর দেখতে হয়েছিল বাগানটি। গুরুদেব জাপান ভ্রমণ থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরেছেন। প্রতিদিন ভোর বেলাতে লম্বা জোব্বা গায়ে দিয়ে শালবীথিকায় ও ছাত্রাবাসের আসে পাশে ঘুরে বেড়াতেন। আমাদের বাগান দেখে তিনি খুব খুশী হলেন। তখন প্রতিমাসে একবার সন্ধ্যা উপাসনার পরে সাহিত্য সভা হত। গুরুদেব এমনি একটি সভায় সভাপতিত্ব করছিলেন। সভাপতির ভাষণে তিনি বল্লেন যে নাট্যগৃহের সুন্দর বাগানটি দেখে খুবই আনন্দিত হয়েছেন এবং যে সব ছাত্র এই বাগান করেছে তাদের জাপান থেকে সংগৃহীত একটি সুন্দর পুষ্পপাত্র তিনি পুরস্কার দিচ্ছেন। এই পুষ্পপাত্রটি আমাদের নিকট বহুদিন ছিল। তাঁর নিকট হতে উৎসাহ পেয়ে প্রতি বছরই আমরা সুন্দর বাগান করতাম।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে মহাত্মা গান্ধী তাঁর ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে ভারতবর্ষে এলেন। এই দেশে কোথায় এসে উঠবেন তার কোন কিছু ঠিক

হল না। গুরুদেব মহাত্মা গান্ধীকে শান্তিনিকেতনে এসে থাকবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। তখন ১৯১৪ ইংরেজী সন, মহাত্মা গান্ধী তাঁর ছাত্রগণ সহ আশ্রমে বসবাস করবার জন্য এলেন। তাঁর ছাত্রদের পরনে ছোট হাতাযুক্ত মোটা কাপড়ের জামা, ছোট ধুতি বা "হাফ্‌পেন্ট", মাথায় ছোট করে কদম ছাঁটা চুল। সকলকে বেশ সংযত বলে মনে হল তাদের চালচলনে। মহাত্মা গান্ধীর আসার কিছুদিন পরেই একটি বুধবারে প্রাতে মন্দির উপাসনার পরে পিয়ার্সন সাহেব ও গুরুদেবের জামাতা নগেন গাঙ্গুলী বিদ্যালয়ের সাধারণ রান্নাঘরে আসলেন; আমরা কয়েকজন ছাত্রও তাঁদের পিছনে ঐখানে এলাম। তাঁরা রান্নাঘরের পাচক ঠাকুরদের ও চাকরদের ডেকে বল্লেন তাদের কার্য্য হতে বিদায় দেওয়া হবে এবং ছাত্রগণই নিজেরা রান্না করবে। এদের মধ্যে অনেকেই বহুদিন ধরে এই রান্নাঘরে কাজ করে আসছে। কাজ হতে তাদের বিদায় দেওয়ার সংবাদে তারা খুবই মর্মাহত হল। রান্নাঘরের কাজে শিক্ষক মহাশয়গণ ছাত্রদের কার উপর কী কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হল তার একটি ফর্দ বের করলেন। রান্নাঘরে প্রয়োজনে প্রচুর জল কূয়া থেকে উঠাতে হয় এবং বেশ কিছুদূরে বহন করে নিতে হয়—এটা একটা শক্ত কাজ। আরেকটি শক্ত কাজ হচ্ছে রান্নার শেষে বিরাট বিরাট হাঁড়িকুঁড়ি, ডেকচী, কড়াইগুলি মেজে ঘষে পরিষ্কার করা। স্বাস্থ্যবান ছেলেদের বেছে বেছে এই দুইটি কাজের ভার তাদের উপর দেওয়া হল। বাসন মাজার কাজে আমার নাম ছিল। আহারের অব্যবহিত পরেই ঐ বিরাট বাসনগুলি মাজার কাজে আমাদের বেশ পরিশ্রম করতে হত। এই কাজ যখন শেষ করতাম তখন দেখতাম আমাদের আবার বেশ খিদে পেয়ে গেছে। রান্নার ব্যাপার নিয়ে আমাদের সকল ছাত্রের মধ্যে বেশ একটি স্ফূর্তির সাড়া পড়ে গিয়েছিল। ভোর থেকে সুরু করে রাত্রের আহারের শেষ হওয়া পর্য্যন্ত একদল জলখাবার তৈয়ের করছে, কোনদল স্তূপীকৃত আলু তরকারী ইত্যাদি বঁটি দা দিয়ে কাটছে, হৈ চৈ করে কড়াই, খন্তা নেড়ে রান্না চলেছে—এ যেন উৎসবের বাড়ী। বৈশাখ মাসে আশ্রমের আমগাছগুলিতে কচি আমে ডাল নুইয়ে পড়েছে। গ্রীষ্মের দারুণ গরমে দুপুর বেলায় কচি আম পুড়িয়ে সরবত করা হত আর মনের আনন্দে তা পান করা হত। বিকেল বেলাকার জলখাবার হত চীনাবাদামভাজা, কলা আর খেজুর। কলাগুলি প্রায়ই পচাধরা থাকত। রোজ বিকেলে একই ধরনের জলখাবার খেয়ে খেয়ে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। এই বিষয়ে আমাদেরই একজন বেশ একটি ব্যঙ্গপূর্ণ গান রচনা করেছিল। তার প্রথম ছত্রটি হচ্ছে

"পচাকলা তিনটে দুটো, মাংকী নাট্‌স্ মুঠো মুঠো।" বিকেল বেলাকার জলখাবারের সময়ে সকলেই প্রায় এই গানটি মহানন্দে গাইতাম। ছাত্রদের দ্বারা রান্না করাবার সংবাদ অভিভাবকেরা পেতে লাগলেন। তাঁদের অধিকাংশই অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। কোন ছাত্র বোধহয় তার মাকে লিখেছিল যে আজকাল আমরা শান্তিনিকেতনে রান্না শিক্ষা করছি ইত্যাদি। তার মা নাকি উত্তরে লিখেছিলেন যে "পড়া ছেড়ে যদি রান্নাই শিখতে হয় তবে বাড়ীতে চলে এস, আমার নিকট ভাল রান্না শিখতে পারবে।" আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বহু অভিভাবকের পত্র এল তাঁদের ছেলেদের বাধ্য হয়ে শান্তিনিকেতন হতে নাম কাটিয়ে নিয়ে যেতে হবে। গুরুদেব খুবই চিন্তিত হলেন। ইতিমধ্যে গান্ধীজি বিশেষ কাজের জন্য অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। ধীরে ধীরে পুরানো ঠাকুর চাকরেরা আবার এসে রান্নাঘর দখল করল আর আমাদের রান্নার ব্যাপারও উঠে গেল। গান্ধীজির এই স্মৃতিকে রক্ষা করবার জন্য এখনও প্রতি বছর এপ্রিল মাসে গান্ধী পুণ্যাহদিন বিশ্বভারতীতে পালিত হয়।

শান্তিনিকেতন আশ্রম-বিদ্যালয়ের সাম্বৎসরিক ও প্রধান উৎসব হচ্ছে ৭ই পৌষের উৎসব। গুরুদেবের পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দীক্ষার এই দিনটি। ৭ই পৌষ হতে আরম্ভ করে তিন দিন এই উৎসব পালন করা হয়। উৎসব প্রারম্ভের বেশ কিছু পূর্বের থেকেই আরম্ভ হয়ে যায় আশ্রম পরিষ্কার করা, ছাত্রদের গৃহগুলির সংস্কার ও চূণকাম করা, সুষ্ঠভাবে উৎসব যাতে পালন করা হয় তার জন্য শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে কাজ বন্টন ইত্যাদি। আশ্রমের এই সব কাজ তখন আনন্দের সঙ্গে ছাত্রগণই সম্পন্ন করত। এখনকার মত মজুর নিয়োগ করা হত না। সেই সময়ে ছাত্রদের মধ্যে আনন্দ ও উদ্দীপনার সাড়া পড়ে যেত। সাধারণত প্রতি বছরই মন্দির সাজাবার দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করা হত। ৬ই পৌষের ভোরবেলায় আমরা তিন চারটি দলে বিভক্ত হয়ে বিছানার চাদর নিয়ে উৎসবের জন্য ফুল সংগ্রহে বের হতাম। শান্তিনিকেতনের পার্শ্ববর্ত্তী সাঁওতাল গ্রামগুলিতে তখন প্রচুর গাঁদা ফুল ও অন্য দু'তিন রকমের ফুল পাওয়া যেত। সাঁওতালদের নিকটে শান্তিনিকেতন তখন কাঁচ বাংলা নামে পরিচিত ছিল। উপাসনার মন্দিরটির গায়ে নানারঙের কাঁচ বসান আছে, এরই থেকে এদের নিকট কাঁচ বাংলা হল আশ্রমটি। কাঁচ বাংলার জন্য ফুল নিচ্ছি বল্লে সাঁওতালেরা ফুল দিতে কিছুমাত্র আপত্তি করে না। সংগৃহীত সমস্ত ফুল মন্দিরে এনে জড় করা হত। তারপর মন্দির সাজাবার কাজে যে সব ছাত্রদের নাম থাকতো তারা সকলে বিকেলের দিকে মন্দিরে

এসে একত্রিত হয়ে ফুলের মালা, সুতলিতে আমপাতা বেঁধে মালার মত করা, মন্দিরের ফটকটিকে দেবদারু পাতা দিয়ে সাজানোর কাজে লেগে যেত। সব কাজ শেষ হত না তাই রাত্রের আহারের পর আমরা তিন চারিটি ছেলে কম্বল নিয়ে মন্দিরে এসে বাকী সাজানোর কাজ সমাপ্ত করতাম। রাত একটা বা দু'টো বেজে যেত কাজ করতে। বাকী রাতটা মন্দিরেই কম্বল-গায়ে শুয়ে কাটাতাম। ৭ই পৌষের ভোর চার ঘটিকায় বৈতালিক গান গেয়ে গেয়ে একদল ছাত্র আশ্রম প্রদক্ষিণ করত। বৈতালিক পরিচালনা করতেন দিনেন্দ্রনাথ। তাঁর দরাজ গলা সকল গলার উর্দ্ধে শুনা যেত। আমরা কয়েকজন অতি উৎসাহী ছাত্র বৈতালিকের পূর্বেই শেষ রাত্রির অন্ধকারে কূয়া থেকে জল টেনে স্নান করে নিতাম। খোলা জায়গায় পৌষের শেষ রাত্রির ঠাণ্ডা হাওয়া আমাদের স্নানের উৎসাহকে কিছুমাত্র দমিয়ে দিতে পারত না। শিক্ষক ও ছাত্র সকলেই ভোরবেলায় স্নান সমাপন করে পরিষ্কার ও শুদ্ধ হয়ে গৈরিক রঙের লম্বা আলখেল্লা গায়ে দিয়ে উৎসবে যোগ দিতেন। উপাসনা মন্দিরের ফটকের উপরে বড় একটি ঘণ্টা ঝুলান ছিল। গুরুদেব তারই সংলগ্ন একটি দড়ি ধরে মন্দিরে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে উপাসনার ঘণ্টা বাজাতেন। আলখেল্লা-পরিহিত আমরা ছাত্রের দল পংক্তিবদ্ধ হয়ে ধীরে ধীরে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হতাম। এই দৃশ্য প্রাচীনকালের তপোবনের ব্রহ্মচারীদের কথা মনে করিতে দিত। মন্দিরের ফটক পেরিয়ে ছাত্রগণ একে একে গুরুদেবকে পাদস্পর্শ করে প্রণাম জানিয়ে শান্ত ও ঋজু হয়ে মন্দিরের ভিতরে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করত। গুরুদেব উপাসনার সময়ে যে আসনে বসতেন তার সম্মুখে তিনটি শ্বেত পাথরের ছোট ছোট টেবিল থাকতো, সেইগুলিকে ফুল দিয়ে সাজিয়ে তারই সামনে ধূপধুনা জ্বালান হত। উপাসনার কাজ আরম্ভ হবার পূর্বে সমবেত কণ্ঠে ধর্ম্মসঙ্গীত গাওয়া হত। দিনেন্দ্রনাথ গান পরিচালনা করতেন আমি সঙ্গে এস্রাজ বাজাতাম। গুরুদেব উপাসনার ভাষণে ৭ই পৌষ উৎসবের মর্ম্মার্থ বুঝিয়ে দিতেন। তিনি ভাষণ দিতে দিতে তন্ময় হয়ে উচ্চ কণ্ঠে গান গেয়ে উঠতেন। এই মন্দিরের উপাসনা ৭ই পৌষ উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ও প্রাণ ছিল। এর জন্য কোলকাতা হ'তে রবীন্দ্রভক্ত একদল গুণী ও মনীষী ব্যক্তি আসতেন। এই সব ভাষণ শুনবার যাঁদের সৌভাগ্য হয়েছে, আশা করি, তার স্মৃতি তাঁরা কখনও ভুলতে পারবেন না। উপাসনার শেষে নীরবভাবে আমরা ঐ স্থান ত্যাগ করে আসতাম। এর পর মেলা দেখার পালা সুরু হত। মেলার পরিধি তখন অনেক ছোট ছিল এবং মিষ্টির দোকানের সংখ্যাই বেশী থাকত।

যাত্রাগান হত গ্রামের জনসাধারণের জন্য। ৭ই পৌষ মেলার সময়ে কয়েকটি ঘটনা আমাদের চোখে খুব পড়তো। শান্তিনিকেতনের প্রাচীন দু'তালা বাড়ীর উত্তরাংশের নীচের বারান্দায় গুরুদেবের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র দ্বীপেন্দ্রনাথ রাশভারী ব্যক্তি আসর জমিয়ে বসতেন, সঙ্গে থাকত তাঁরই বন্ধুব্যক্তি রায়পুরের বিখ্যাত সিংহ পরিবারের এক ভদ্রলোক। আজ তাঁর চেহারার খুঁটিনাটি কিছুই মনে পড়ছে না, কিন্তু তাঁর বিরাট কাল গোঁফজোড়াটা এখনও চোখে ভাসছে। এঁরা দুইজনে আরো দু'চারটি সহায়ক নিয়ে উৎসব ব্যবস্থাপনার আসরটিকে গরম করে রাখতেন। মনে হত এঁরা যেন পূজাবাড়ীর কর্ত্তাব্যক্তি। এই উৎসবে যোগ দেবার জন্য বাহির থেকে যে সব অতিথি ও অভ্যাগত আসতেন তাঁদের সুখ সুবিধা দেখাশুনা করার জন্য পর্য্যায়ক্রমে ছাত্রদের অতিথিসেবার কার্য্যভার অর্পণ করা হত। তখনকার দিনে আশ্রমের অতিথিসেবার বেশ সুনাম ছিল।

আশ্রম-বিদ্যালয়ের সাহিত্যসভা ও অভিনয়াদির প্রতি আমাদের একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। যে গৃহে সভা হবে তাকে সাজাবার জন্য সেই সময়কার ফুল সংগ্রহ করে আনতাম। কখনও শতদল পদ্ম, কখনও শুভ্র কাশফুল দিয়ে সুন্দরভাবে সভাগৃহটিকে সাজান হত। ধূপধুনা ও ফুলের সুগন্ধ মিশে এক অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি হত। সভাতে ছাত্রদের দ্বারা লিখিত প্রবন্ধ, কবিতা পাঠ ও তাদেরই অঙ্কিত চিত্রাদি প্রদর্শন সভার প্রধান আকর্ষণ ছিল। গুরুদেব অনেক সময় এই সব সভায় সভাপতিত্ব করতেন। নাট্যগৃহে অভিনয়াদি হওয়ার ব্যবস্থা ছিল। রঙ্গমঞ্চ এখনকার মত নীল লাল কাপড় দ্বারা সাজানো হত না, দেবদারু পাতা দিয়ে ফুল দিয়ে, সাজানো হত। এই কাজে আমরা একদল ছাত্র ছিলাম উৎসাহী। এই নাট্যগৃহে শারদোৎসব, ফাল্গুনী, অচলায়তন, বিসর্জন, মুকুট, ডাকঘর আরো অনেক গুরুদেবের লিখিত ভাল ভাল নাটকের অভিনয় হয়েছে। অধিকাংশ অভিনয়ে গুরুদেব প্রধান অভিনেতা রূপে অংশ গ্রহণ করতেন। অভিনয়ের পক্ষে নাট্যগৃহটি বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চের তুলনায় খুবই ছোট ছিল। আশ্রমের শিক্ষক, ছাত্র ও অন্যান্য আশ্রমবাসীর সংখ্যা তখন এত অল্প ছিল যে সকলেরই বসার স্থান এই গৃহে হয়ে যেত।

প্রকৃতির কোলে গুরুদেব শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই উদ্দেশ্য নিয়ে যাতে ছাত্রগণ সহজে প্রকৃতির সকল প্রকাশকে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারে। শরৎকালের বাতাসে শুভ্রাকাশের আলোড়ন, নীল আকাশে উড়ন্ত শুভ্র বকের সারি, বসন্তের রাঙা রঙের স্পর্শ, বর্ষায় দিগন্ত

বিস্তৃত প্রান্তরের শেষে কাজল মেঘের ঘনঘটার সমাবেশ ছাত্রদের কচি মনে যেন ছাপ দিতে পারে, রং ধরিয়ে দিতে পারে। পাঠ্য পুস্তকের শিক্ষার চেয়ে প্রকৃতির এই প্রকাশের সঙ্গে নিবিড় মনের যোগে যে শিক্ষা ছাত্রগণ পাবে তা কোন অংশে অন্য শিক্ষার চেয়ে কম নয়। সৌন্দর্য্যের এই অভিব্যক্তিকেই ত গুরুদেব তাঁর গানে, কবিতায়, লেখায় আমাদের নিকট প্রকাশ করেছেন। বর্ষায় যখন আকাশ ভেঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টির ধারা নেমে আসতো তখন ছেলেরা কেউ ঘরে বসে থাকতে পারত না। সব দল বেঁধে বৃষ্টির জলে ভিজতে বের হত। খোয়াইয়ের মাঝ দিয়ে বৃষ্টি জলের ধারা খরস্রোতারূপে কল কল করে বয়ে যেত। আমরা সেই গৈরিক রঙের কাদাজলে গা ভাসিয়ে দিতাম। বহুদূর পর্য্যন্ত জলে ভেসে ভেসে গোয়ালপাড়া যাবার রাস্তার পুলের নিকট গিয়ে জল ত্যাগ করে উঠে আসতাম। ভিজে কাপড়ে গান গাইতে গাইতে আশ্রমে ফিরে আসতাম। খুব বৃষ্টি হচ্ছে, এমনি সময়ে গুরুদেব একবার আদ্যবিভাগের গৃহে এলেন ভিজতে ভিজতে। গায়ে তার গেঞ্জি হাতে একটি লম্বা লাঠি। ছোট ছেলেদের বাদ দিয়ে বড় ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে ভিজতে ভিজতে কোপাই নদীতে গেলেন। কোপাই নদীর ধারের বনে যখন পলাশ গাছের রঙের আগুন ফুলগুলিতে ধরত তখন ছাত্রদের বনভোজনের আয়োজন হত ঐ নদীর পাড়ে। ছাত্রগণ বনে বনে ঘুরে পলাশের সৌন্দর্য্য উপভোগ করত। এইখানকার প্রকৃতির রুদ্রমূর্ত্তি ঝড়ও উপভোগ করার মত। সাধারণত বৈশাখ মাসেই এখানে ঝড় হয়। সমস্ত আকাশ, খোলা প্রান্তর, বিদ্যালয়ের ঘর বাড়ীর উপর দিয়ে বালির প্রবল ঝড় বইতে থাকে, চোখে ভাল করে কিছু দেখা যায় না, সবই অন্ধকার ঝাপসা হয়ে আসে। আশ্রমের গাছপালাগুলি ঝড়ের উত্তাল বেগে আন্দোলিত হতে থাকে। সেই সময়ে খোয়াই অঞ্চলে ঘুরে বেড়ান এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ। প্রবল বাতাসের বেগে বিতাড়িত কাঁকড় খণ্ডগুলি ক্রমাগত গায়ে আঘাত হানতে থাকে, চুল বালিতে আর বাতাসে উস্ক-খুস্ক হয়ে অপরূপ আকার ধারণ করে, গায়ের কাপড় ধরে রাখা এক সমস্যা, কিন্তু তবু এতে অদ্ভুত আনন্দ পাওয়া যায়। বালির কুয়াশায় যেন সমস্ত আবৃত করে দেয়। নিজের এক হাত দূরে কি আছে দেখা যায় না। তারপরই নেমে আসে শীতল করা বর্ষণধারা; মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রকৃতির এমন রূপপরিবর্ত্তন সত্যিই অবাক করে দেয়। প্রকৃতি যেন বিচিত্ররূপে ডালা সাজিয়ে আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়।

আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কথা যখন মনে আসে তখন দেখতে পাই

সেই সব ছাত্র ছিল শান্ত সংযত, তাদের বেশভূষা ছিল রুচিমার্জিত। অকারণে ও অযথা চীৎকার হৈ-চৈ করা, লঘু সঙ্গীত গাওয়া, বিলাসিতা তাদের ছিল না। কোন ক্ষুদ্র মতবাদের গোঁড়ামিতে নিজেদের বিচারবুদ্ধির ভারসাম্য হারাত না তারা। তারা ছিল শ্রদ্ধাশীল, উৎসাহী, শিক্ষার প্রতি অনুরাগী, সুরসিক, সৌন্দর্য্য উপভোগে পারদর্শী। তখনকার দিনে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করেই আশ্রম-বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত হত।

শান্তিনিকেতন আশ্রম-বিদ্যালয়ের পরিণতি হচ্ছে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ হয় ৩রা জুলাই, ১৯১৯ ইংরেজি সনে। এর পূর্বেই বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা গুরুদেবের মনে স্থান পেয়েছিল। আমেরিকার শিকাগো শহর হতে ১৯১৬ ইং সনে তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথকে যে পত্র লিখেছিলেন তাতে তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র করে তুলবার জন্য। বিশ্বভারতীর কার্য্যারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাভবন, কলাভবন, সঙ্গীতভবনের গোড়াপত্তন হল। বিদ্যাভবনে ভারতীয় ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বহু ভাষা শিক্ষার ও অনুশীলনের আয়োজন হল। কলাভবনে ভারতীয় চিত্র-অঙ্কন, মূর্তিগঠন শিল্প, কারুশিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা ও সঙ্গীতভবনে রবীন্দ্রসঙ্গীত, মার্গসঙ্গীত, নৃত্য, বাদ্যযন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা হল। আশ্রম-বিদ্যালয়ে এতদিন ছাত্রগণ শিক্ষালাভ করত; এখন বিশ্বভারতী হওয়ায় পূর্ণতর শিক্ষালাভ ও আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেল। গুরুদেবের প্রেরণায় শিক্ষার ও সৃষ্টি কার্য্যের যেন জোয়ার এল বিশ্বভারতীতে। বিদেশ হতে মহাপণ্ডিত ব্যক্তিদের সমাবেশ হতে লাগল। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উইন্টারনীজ এলেন, টুচি আর সিলভেঁন লেভী এলেন, এঁদের ছাড়াও আরো দু'চারজন এই ধরনের পণ্ডিত এখানে এলেন। এঁদের ক্লাশের ছাত্র হলেন এইখানকার অধ্যাপকেরা ও কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও অনুশীলনের ছাত্রগণ। গুরুদেব এই সব ক্লাশে উপস্থিত থাকতেন। প্রথমের দিকে অতি উৎসাহের জন্য ছাত্রসংখ্যা এত বেশী হল যে সকলের স্থান হওয়াই অসুবিধা হল, তার পর ধীরে ধীরে অপণ্ডিতের দল সরে পড়তে লাগলো। শেষপর্য্যন্ত দেখা গেল ছয় সাতজন যথার্থ বিদ্যার্থীই ক্লাশে রয়ে গেছে। সিলভেঁন লেভী গুরুদেবের নিকট বাংলা শিখতেন।

কলাভবন আরম্ভ হবার কিছু পূর্বে ১৯১৬ ইং সনে সুরেন্দ্রনাথ কর ড্রইঙের শিক্ষক হয়ে শান্তিনিকেতনে এলেন। আমরা তখন বিদ্যালয়ের ছাত্র, সুরেনবাবু আমাদের ড্রইং শেখাতেন। অসিতকুমার হালদার এলেন ১৯১৭ বা ১৯১৮

সনে এবং নন্দলাল বসু এলেন ১৯১৯ সনে। এই তিনজন শিক্ষককে নিয়ে কলাভবনের কার্যারম্ভ হল ১৯১৯ সনে। কলাভবনের গোড়ার দিকে দক্ষিণ ভারতীয় একটি ছাত্র নাম তার রামানুজ শান্তিনিকেতনে এল চিত্র অঙ্কন শিখবে বলে। নন্দবাবু শান্তিনিকেতনের কার্য্যে তখনও ঠিকভাবে যোগ না দিলেও প্রতি সপ্তাহে একবার এখানে আসতেন। রামানুজকে শিক্ষা দিতে লাগলেন। কলাভবন ঠিকমত আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে এই ছাত্রটিকে আর দেখতে পাইনি। কোলকাতার গভর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলের ছাত্র অর্দ্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরাচাঁদ ডোগার ও কৃষ্ণকিঙ্কর এবং শান্তিনিকেতন থেকে আমি কলাভবনের প্রথম ছাত্ররূপে যোগ দিয়েছিলাম। এর কিছুদিন পরে বিনোদ মুখোপাধ্যায়, তারপরে সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, ভি. আর. চিত্রা, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, পি. হরিহরণ, বিনয়ক মাসোজী, শ্রীমতী হাতীসিং কলাভবনে যোগদান করেন। অসিতবাবুকে পূর্বেও আশ্রম বিদ্যালয়ে এসে বাস করতে ও ছাত্রদের চিত্রবিদ্যা শিখাতে দেখেছি। বিদ্যালয়ে ছাত্রবস্থায় থাকার সময়ে তাঁর নিকট কয়েকবার ছবি আঁকতে গিয়েছিলাম। কলাভবনের প্রথম দিকে আরেকজন ছাত্র ছবি আঁকা শিখতে এসেছিল তার নাম ওয়ারীয়র। খুব সম্ভব দক্ষিণ ভারতীয় ছিল। মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে কিছুদিন পরেই কোথায় চলে গেল। অবিলম্বেই কলাভবনে চিত্রাঙ্কনের একটি অপূর্ব আবহাওয়ার সৃষ্টি হল। নন্দবাবু, অসিতবাবু, সুরেনবাবু একের পর এক ছবি এঁকে চল্লেন, ছাত্রগণও কম যায় না, তারাও গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চল্ল। কোলকাতায় প্রতি ডিসেম্বর মাসে অরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটিতে ছবির প্রদর্শনী হত। কলাভবনের শিক্ষক ও ছাত্রদের ছবি নিয়ে কোলকাতায় শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথকে দেখিয়ে প্রদর্শনীর জন্য সোসাইটিতে দিয়ে আসতাম। ভোরবেলা যখন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর দিকে ছবিগুলি নিয়ে অগ্রসর হতাম তখন প্রথমেই নীচের তলাকার বারান্দায় অতি পুষ্ট একটি ভেড়া ও উদরসর্ব্বস্ব এক বলিষ্ঠ দারোয়ানের দর্শন মিলত। তারপর দোতালায় যাবার সুন্দর কাঠের সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছালে মোহিত করা খাম্বিরা তামাকের ঘ্রাণ নাকে আসত। অবনীন্দ্রনাথের বাড়ীটি শিল্পবস্তুর দ্বারা সুন্দরভাবে সাজান ছিল। দোতালার বড় হল ঘরটি সুন্দর সুন্দর আসবাবপত্রের দ্বারা সুরুচিপূর্ণভাবে সাজান, দেয়ালের ছোট বড় বহু চিত্র টাঙ্গান থাকত। অধিকাংশ চিত্রগুলিই অবনীন্দ্রনাথের, গগনেন্দ্রনাথের ও নন্দলালের দ্বারা অঙ্কিত, তবে ভাল ভাল প্রাচীন রাজপুত ও মুঘল চিত্রও কিছু ছিল। দোতালার প্রশস্ত দক্ষিণ বারান্দায় পাশাপাশিভাবে ইজিচেয়ারে তিন ভাই গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ

পাশে গুড়গুড়ি হুক্কা নিয়ে বসে থাকতেন। তাঁরা যেমন মহান শিল্পী তেমনি বড় মজলিসীও ছিলেন। কলাভবনের ছবিগুলি দেখার কি আগ্রহ তিন ভাইদের মধ্যে দেখেছি। ছবির নাম ও মূল্য দুই-ই তাঁরাই নির্দ্ধারিত করতেন এবং ছবিগুলির দোষগুণ বলে দিতেন। ছবিগুলির প্রতি তাঁদের একটি দরদ ও মমতা দেখতে পেতাম। এইখান থেকে ছবিগুলিকে নিয়ে সোসাইটিতে পৌঁছিয়ে দিতাম।

কলাভবন এখন অনেক বড় হয়েছে, অনেক নিয়ম কানুনের দ্বারা বাঁধা হয়েছে, নির্দ্ধারিত শিক্ষার ধারা প্রবর্ত্তন, সিলেবাস ও শিক্ষার সময় নিরূপণ করা হয়েছে। শিক্ষা সম্পূর্ণ হলে ডিপ্লোমা প্রদানেরও ব্যবস্থা হয়েছে। কলাভবনের প্রথম যুগে এই সব কিছুই ছিল না, শুধু ছিল অফুরন্ত প্রেরণা আর উদ্দীপনা। শিক্ষক, ছাত্র সকলেই ভাবত আমরা শিল্পী, এই মূলমন্ত্রই তাদের সকল শিক্ষায় প্রেরণা যোগাত। নন্দলাল শুধু মহান শিল্পী নন, তিনি একজন মহান শিক্ষকও বটে। যথার্থ শিক্ষক হওয়ার সকল গুণই তাঁর মধ্যে আছে। ছাত্রদের ড্রইং শুধু তিনি সংশোধন করতেন না, সেই ড্রইং বা ছবিটিকে উন্নত রূপ দান করতেন। তাঁর সংস্পর্শ ছাত্রদের শিল্পক্ষেত্রে মানসিক উন্নতি, প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ, উদার চরিত্র লাভের সহায়তা করত। নন্দলালের মধ্যে একত্রে ছাত্রেরা পেয়েছিল শিক্ষাগুরু, দরদী সঙ্গী ও বন্ধু, মমতাপূর্ণ আত্মীয়। তাঁর মত গুরু লাভ করা ছাত্রদের পক্ষে খুবই সৌভাগ্যের বিষয়। ছাত্রদের ছবি সংশোধন করে, নিজে ছবি এঁকে তবে শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, শিক্ষক তাঁর নিজের সৃষ্টির কাজ হ'তে যেন বিরত না হয়। প্রতিদিন শিল্পী তাঁর শিল্পসৃষ্টির দ্বারা যেমন আনন্দ লাভ করবেন তেমনি প্রতিদিনই নূতন নূতন করণ কৌশলের অভিজ্ঞতা আয়ত্তও করবেন। ছাত্রদের ভাল ভাল মূলচিত্র ও ছাপান ছবি দেখিয়ে নানা বিষয়ে বুঝিয়ে দিতেন। ছাত্রদের সঙ্গে নিজেও স্কেইচ্ করবার জন্য বাইরে বেরুতেন। কোপাই নদীর পাড়ে বনভোজন, ছুটির দিনে গরুর গাড়ী চড়ে দূর দূরান্তরে শিক্ষাভ্রমণে বের হওয়া—এই সব আয়োজনের মধ্যে একমাত্র ধ্যান ধারণা ছিল শিল্প। সকলেরই ভাব দেখে মনে হয় যেন শিল্পরসে তন্ময় হয়ে আছে। এতে যে কি আনন্দ এতো ভাষার দ্বারা প্রকাশ করা অসাধ্য। গুরুদেবের সঙ্গীত, কাব্য, তাঁর ভাষণ, কলাভবনের প্রতি তাঁর দরদ আমাদের সকলের শিল্পীমনা হবার, ভাবুক হবার প্রেরণার উৎসস্থল ছিল। কলাভবনে রবীন্দ্রনাথের ও নন্দলালের মণিকাঞ্চন যোগাযোগ হয়েছিল। এই সৌভাগ্য লাভের সুযোগ অন্য কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের হতে পারে না। কলাভবনে চিত্র

অঙ্কনের সঙ্গে সঙ্গীতেরও সংযোগ ছিল। ছবি আঁকার আসনেই আমার এস্রাজ থাকতো, ছবি আঁকছি তারই মাঝে মাঝে এস্রাজের বাজনাও চলত। সঙ্গীত ভবনের একটি ছাত্র বামন ক্ষিরোদকার তার বীণাযন্ত্রটি নিয়ে কলাভবনেই বসত। গান হ্‌ত, বাজনা চলত, সমস্ত আবহাওয়া যেন সুরের মূর্চ্ছনায় ভরপুর হয়ে আছে। গুরুদেব কলাভবনে আসতেন যখনই শুনতেন যে কারোর ভাল একটি ছবি আঁকা হয়েছে। ছবি দেখে তাঁর মতামত প্রকাশ করতেন। ছবির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেয়ে আমরা যেন বেঁচে গেলাম।

এই সময়ে গুরুদেবের লেখনী যেন বসন্তকালের মঞ্জরীর মত অফুরন্ত সঙ্গীত রচনায় চলেছে। নূতন গানের কথা ও সুর দেওয়া হয়ে গেলেই গানের ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথের খোঁজ হ্‌ত। দিনুবাবুকে গানটি শিখিয়ে তবে গুরুদেব নিশ্চিন্ত হতেন। বিলম্ব হলে গানের দেওয়া সুর গুরুদেব ভুলে যাবেন বলে ভয় করতেন। দিনুবাবু একবার সুরটি শিখে নিলে সেটি হারিয়ে যাবার আর উপায় ছিল না, অদ্ভুত তাঁর ক্ষমতা। রোজ সন্ধ্যাবেলার সময়টুকুর জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতাম কি গান নূতন হল তা শেখার জন্য। উত্তরায়ণের কোনার্ক বাড়ীতে ঐ সময়ে নূতন গানগুলি গুরুদেব নিজে শেখাতেন। যাঁরা গান শিখতেন তাঁদের মধ্যে দিনুবাবু, সঙ্গীত ভবনের শিক্ষক ভীমরাও শাস্ত্রী, তেজেশবাবু, বাছাই-করা সঙ্গীতের ছাত্ররা থাকতেন। আমি তখন এস্রাজ বাজাতাম। ক্ষিতিমোহনবাবু, নন্দবাবু ঐ সময়ে সেখানে রোজই থাকতেন। গান শেখান হয়ে গেলে ছাত্ররা রাত্রের আহারের জন্য চলে যেত। অন্যেরা সকলেই বসে থাকতেন। গুরুদেব তখন সঙ্গীত বা অন্য বিষয়ে আলোচনা করতেন। ক্ষিতিমোহনবাবু নানা রকম সরস সরস ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা শুনাতেন। সেইবারে গুরুদেবের বহু ভাল ভাল গান রচিত হয়েছিল। একদিন কেমন জানি আকাশ মেঘলা করে আছে, শীতের আগমন প্রায় হয় হয়, ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, মনটা আপনি বড় উদাস হয়ে যায়। সন্ধ্যায় গুরুদেবের নিকট গান শিখতে গিয়ে দেখি যে গানটি আজ শেখাবেন তার প্রথম পংক্তি হচ্ছে "আজ কিছুতেই যায় না মনের ভার, দিনের আকাশ মেঘে অন্ধকার।" মনে হ্‌ল, এত আমারই মনের কথা তিনি তাঁর গানে প্রকাশ করছেন। দিনের সমস্ত কাজের মধ্যে গানগুলি ছেলেদের কণ্ঠে গুঞ্জরিত হ্‌ত। গানের ভিতর দিয়ে ভুবনকে দেখার আনন্দ ও সৌভাগ্য হয়েছিল।

অভিনয় ও ঋতু উৎসব প্রথমে শান্তিনিকেতনেই হ'ত তারপর কোলকাতায় হয়েছিল। ফাল্গুনীর অভিনয় কোলকাতায় খুব সাফল্য লাভ করল, দর্শকদের

প্রশংসায় চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠেছিল। বেশ কিছুদিন পরে বিচিত্রা বাড়ীর পিছন প্রাঙ্গণে বিরাট একটি প্যাণ্ডেল তৈয়ারী হল, সেখানে প্রথম বর্ষামঙ্গল গীতোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বহু লোকের সমাবেশ হয়েছিল। নির্মল সিদ্ধান্তের স্ত্রী ছোট ঝুনু নামে পরিচিতা, তিনি একক কয়েকটি অপূর্ব গান গেয়েছিলেন সেইদিন। সঙ্গে এস্রাজ আমি বাজিয়েছিলাম। নৃত্য ও সঙ্গীতে সকল দর্শকই বিমোহিত হয়েছিল। তারপর কয়েক বছর অন্তরই কোলকাতায় বর্ষামঙ্গল গীতোৎসব কোন না কোন রঙ্গমঞ্চে অনুষ্ঠিত হত। ম্যাডান থিয়েটারের মঞ্চে বসন্তোৎসব একবার হয়, তখন উৎসবের শেষ গানটি "সবার সাথে রং মিশাতে হবে, ওগো আমার প্রিয় তোমার রঙ্গিন উত্তরীয়", যখন গাওয়া হল তখন আমরা সকলেই রঙ্গিন চাদর উড়িয়ে গানের সঙ্গে নাচতে লাগলাম। গুরুদেব, দিনুবাবু, এল্‌ম্‌হার্স্ট সাহেব এই নাচে যোগ দিয়েছিলেন। এই মঞ্চে ভিন্ন সময়ে বিসর্জন নাটক অভিনীত হয়। দিনুবাবু রঘুপতির এবং গুরুদেব জয়সিংহের পাঠ অভিনয় করেছিলেন। গুরুদেবের শুভ্র চুল ও দাড়ি কালো করে কি ভাবে তরুণ জয়সিংহ সাজান যায় এ নিয়ে একটি সমস্যা হল। কালো রঙে চুল, দাড়ি কালো করা চলে বটে, তবে অভিনয়ের শেষে এই রং জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে গিয়ে গুরুদেবের হয়ত ঠাণ্ডা লাগার সম্ভাবনা আছে; তখন ছিল শীতকাল। তাঁকে সাজাতে গিয়ে নন্দবাবু, সুরেনবাবু চিন্তিত হয়ে পড়লেন, সেই সময়ে কোথা থেকে অবনবাবু এসে উপস্থিত। তিনি সমস্যার কথা জানতে পেরে বল্লেন "এর জন্য এত ভাবনা, চিন্তা করার কোন কারণ নেই, শুধু বাজার থেকে কালো রঙের ক্রেপ কাপড় কিনে নিয়ে এস।" কালো কাপড় এলে তাই দিয়ে চুল দাড়িকে মুড়ে কাল করা হল, রাত্রে অভিনয়ের সময়ে গুরুদেবকে খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিল। অভিনয়ের একটি জায়গায় রঘুপতি গোবিন্দমাণিক্যের আদেশে মন্দিরে বলি বন্ধের সংবাদ শুনে খুব ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত হয়ে যখন ভুবনেশ্বরীর মন্দির দ্বারে এসে পৌঁছাল তখন জয়সিংহ গুরুর জন্য পাদ্য-অর্ঘ্য নিয়ে এল। গুরু কিন্তু শিষ্যের প্রতি বিরক্ত ও রূঢ় ব্যবহার করল। জয়সিংহ মর্মাহত হয়ে গুরুর চরণে নত হয়ে পড়লো। গুরুদেব জয়সিংহরূপে যখন রঘুপতির চরণে নত হলেন তখন রঘুপতিরূপে অভিনেতা দিনুবাবু হঠাৎ গুরুদেবকে ধরে উঠালেন এবং বল্লেন, "জয়সিংহ, এমনি ভাবে অবসাদে নত হয়ে পড়লে চলবে না, উঠ।" রঙ্গমঞ্চে পর্দার আড়ালে যখন দু'জনেই এলেন তখন গুরুদেব দিনুবাবুকে বল্লেন, "দিনু, তুই আমাকে রক্ষা করেছিস, না ধরে উঠালে

আমি উঠতেই পারছিলাম না।" অভিনয়ের এই জায়গায় জয়সিংহকে 'উঠ' বলে ধরে উঠাবার কোন কথা ছিল না। বলি বন্ধের সংবাদে রঘুপতি রেগে হাত নেড়ে বলছে, "ক্ষত্রিয়ের বাহুবল রাহুসম ব্রহ্মতেজ গ্রাসিবারে চায়," দিনুবাবুর বিশাল ও বলিষ্ঠ হাতের ঝাঁকুনিতে তাঁর গলার রুদ্রাক্ষের মালা গেল ছিঁড়ে। ছিন্ন রুদ্রাক্ষগুলি হাতে নিয়ে কি একটা উক্তিসহকারে দর্শকদের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। দর্শকদল অভিনয় দেখে খুব বাহবা ও হাততালি দিল। পর্দার পিছনে যখন দিনুবাবু এলেন, গুরুদেবকে বল্লেন যে "রুদ্রাক্ষের মালা ছিঁড়ে গেল তখন আর কি করি, দর্শকদের দিকেই ছুঁড়ে দিলাম।" রঘুপতির পাঠে দিনুবাবুর মত ভাল অভিনয় করতে আমি আর কাউকে দেখিনি। অভিনয় বা ঋতু উৎসব রঙ্গমঞ্চে অনুষ্ঠিত হবার বেশ কিছুদিন পূর্বে অংশগ্রহণকারী ছাত্র, অধ্যাপকের দল কোলকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে গিয়ে উঠত। অভিনয় বা গানের মহড়া চলত অবনবাবুদের বাড়ীর দোতালার বড় হলঘরটিতে প্রাতে বা সন্ধ্যায়। গুরুদেব নির্দেশ দিতেন কি ভাবে অভিনয় করতে হবে, গান কি ভাবে হবে ইত্যাদি। অবনবাবু তাঁর এস্রাজ নিয়ে আমাদের সঙ্গে গানে যোগ দিতেন। গগনবাবু, সমরবাবু আরো ঠাকুরবাড়ীর কেউ কেউ তখন উপস্থিত থাকতেন। মহড়ার পর বাকী সময়টাতে গল্পগুজবে আমাদের সময় বেশ আনন্দে অতিবাহিত হত। ভোরের দিকে মহড়ার পূর্বে যে সময়টুকু পাওয়া যেত তখন নন্দলালবাবু ও আমি প্রায়ই অবনবাবুর বাড়ীতে গিয়ে তাঁর পাশে বসে ছবি-আঁকা দেখতাম। তিনি ছবি এঁকে যেতেন আবার মধ্যে মধ্যে একটু একটু গল্পও করতেন।

ভারতীয় সঙ্গীত বর্ত্তমান যুগে ধন্য হল রবীন্দ্র সঙ্গীতের অবদানে। কথা, সুর আর ভাব এ তিনের সম্পূর্ণ মিশ্রণ অন্য সঙ্গীতে সব সময় পাওয়া যায় না। নৃত্যের দিকেও তাঁর দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রথম দিকে যখন অভিনয়ের বা ঋতু উৎসবের সঙ্গে নৃত্যের যোগাযোগ সুন্দররূপে দেবার চেষ্টায় ছিলেন তখন সঙ্গীতের তালে তালে হস্ত ও পদ সঞ্চালনের দ্বারা নৃত্যের চেষ্টা করেছিলেন। তবে তিনি অনুভব করেছিলেন যে নৃত্য নূতন ধরনের হলেও তার মধ্যে পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা, প্রচলিত বিশেষ পদ্ধতির কিছু কাঠাম থাকা প্রয়োজন। সেই জন্য তিনি আমাকে মণিপুরী নৃত্যশিল্পীর খোঁজ করতে আদেশ দিয়েছিলেন। আগরতলায় খোঁজ করে নৃত্যশিল্পী ঠাকুর নবকুমার সিংহের সন্ধান পাওয়া গেল। তিনি কিছুদিন পরে সঙ্গীত ভবনে মণিপুরী নৃত্য-শিক্ষকরূপে বিশ্বভারতীর কার্য্যে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর

পরিচালনায় গুরুদেবের সঙ্গীতের সঙ্গে মণিপুরী নৃত্যের সংমিশ্রণে একটি নূতন নৃত্যপদ্ধতির প্রচলন হয়। পরবর্ত্তীকালে অবশ্য সঙ্গীত ভবনে কথাকলি, ভরত নাট্যম এবং সিংহলী নৃত্যের শিক্ষার ব্যবস্থা হয়।

গুরুদেব একবার কোলকাতা হতে শান্তিনিকেতনে সংবাদ পাঠালেন যে কোলকাতায় "হিজ মাষ্টার্‌স্ ভয়েসের ষ্টুডিওতে" তিনি রেকর্ডে গান দেবেন, এই গানের সঙ্গে আমাকে এস্রাজ বাজাতে হবে। তাঁর গানের সঙ্গে এস্রাজ বাজাতে হবে—এতো খুবই গৌরবের বিষয় তবু কিন্তু একটু চিন্তিত হলাম, তার কারণ তিনি যখন নিজের গানই নিজে গান তখন অনেক সময় সুরের কোন কোন জায়গায় ইচ্ছা করেই সামান্য সুরের অদল বদল করে ফেলেন। শেখা সুরে বাজাতে গিয়ে কোন অসুবিধা না করে ফেলি এই হল আমার ভাবনা। যাই হোক, নির্দিষ্ট সময়ে কোলকাতার চিৎপুর রোডে "হিজ মাষ্টার্‌স্ ভয়েসের ষ্টুডিওতে" গিয়ে গুরুদেবের সঙ্গে উপস্থিত হলাম। ঐখানকার কর্মীরা তাঁকে খুবই খাতির ও সম্মান সহকালে অভ্যর্থনা করলো। প্রথমে ইংরেজি গীতাঞ্জলি বই হতে দুই একটা কবিতা আবৃত্তি রেকর্ড করা হল, তারপর "অন্ধজনে দেহ আলো মৃতজনে দেহ প্রাণ", "শেষ পারানীর কড়ি কণ্ঠে নিলেম", এ ছাড়াও আরো দুই-তিনখানা গান রেকর্ডে দিলেন। গুরুদেবের গানের সঙ্গে আমি এস্রাজ ও সঙ্গীত ভবনের শিক্ষক ভীমরাও শাস্ত্রী বীণা বাজিয়ে ছিলেন। ষ্টুডিওর সাহেব কর্মীরা গুরুদেবের ইংরেজি উচ্চারণের খুবই প্রশংসা করেছিলেন।

কলাভবনের প্রথম যুগে যখন শিক্ষক, ছাত্রদের মধ্যে শিল্পরচনার প্রেরণা প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিল তখন গুরুদেব ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে কলাভবনের ছাত্রগণ শুধু চিত্রবিদ্যা আয়ত্ত করার কার্য্যে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলে চলবে না, এর সাথে অর্থলাভের বিদ্যাও প্রত্যেক ছাত্রকে শিক্ষা করতে হবে। তাঁর ইচ্ছানুসারে কারুশিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা হল কলাভবনে। তখনকার দিনে এই বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্র খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁত, গালার কাজ—এই ধরনের আরো কয়েকটি কারুশিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা হল। এই কার্য্যে প্রধান উদ্যোক্তা হলেন গুরুদেবের পুত্রবধূ শ্রদ্ধেয়া প্রতিমা দেবী, সঙ্গে রইলেন ফরাসী চিত্রশিল্পী মাদাম কার্প্লেস। কলাভবনের ছাত্রসংখ্যা মোট হবে তখন আট নয় জন। কেউ তাঁত, কেউ অন্য বিষয়ে শিক্ষালাভ করছে। আমি ও বিনোদ মুখোপাধ্যায় গালার কাজ শিখবো বলে মনস্থ করলাম। গালার শিক্ষক ছিলেন শান্তিনিকেতন থেকে বার চৌদ্দ মাইল দূরে অবস্থিত ইলামবাজার নামক স্থানের লোক।

ঐ স্থানের গালার কাজের জন্য ঐ অঞ্চলে বেশ খ্যাতি ছিল। শিক্ষকটি সরল গ্রাম্য লোক, তবে একটু রাগী স্বভাবের। ক্লাশে শেখাতে শেখাতে হঠাৎ রেগে হয়ত অতি নিকট সম্বন্ধ সম্বোধন করে হেঁকে উঠতেন। আমরা দেখলাম এতো বড় বিপদ, শিক্ষকের আর ছাত্রদের মধ্যে ব্যবহারে ত একেবারে ভদ্রতার বালাই নেই। একদিন নন্দলালবাবুর নিকটে গিয়ে এই সব বিষয় জানালাম। তিনি শুনে প্রথমে একটু চুপ করে রইলেন, শেষে বল্লেন, "দেখ, শিক্ষকের নিকট কোন বিদ্যালাভ করতে হলে সবই সইতে হয়। তোমাদের গালি দেয়, আবার তার সঙ্গে বিদ্যাও তো দিচ্ছে।" তারপর থেকে আমরা ভিন্ন পথ ধরেছিলাম। শিক্ষককে খুব তোয়াজ করতাম, তাতে ফলও ফলেছিল খুব ভাল। বুধবারে শান্তিনিকেতনের সাপ্তাহিক ছুটির দিন। মঙ্গলবার বিকেলে কারুশিল্পের সব ছাত্রদের প্রতিমা দেবী তাঁর উত্তরায়ণ বাড়ীতে চা খাওয়াতেন। সাধারণত চা পানের অর্থে আমরা যা বুঝি তার চেয়ে ভোজন একটু গুরুতর হত। সপ্তাহের সকল দিনগুলির মধ্যে মঙ্গলবারের বিকেল বেলাটা আমাদের নিকট খুবই লোভনীয় ছিল। গুরুদেব মাঝে মাঝে এসে আমাদের কাজকর্ম দেখে যেতেন। অনেকদিন ধরে এই কারুশিক্ষার ক্লাশগুলি বেশ ভালই চলেছিল, তারপর কি কারণে জানি না ধীরে ধীরে উঠে গেল।

এর বেশ কিছুদিন পরের ঘটনা, তখন আমি আগরতলায় আছি। হঠাৎ টেলিগ্রাম পেলাম জোড়াসাঁকোর বাড়ী থেকে শীঘ্র গোছগাছ করে কোলকাতায় রওনা হবার জন্য, কারণ গুরুদেব শীঘ্রই জাভা, বালিদ্বীপ ভ্রমণে যাবেন, তাঁর সঙ্গে যেতে হবে। এই সংবাদে আমি খুবই আনন্দিত হলাম। এর পূর্বে বিদেশ যাওয়ার আমার কখনও সুযোগ হয়নি। দিন কয়েক পর কোলকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলাম। পোষাক ইত্যাদি জামাকাপড় কিছু তাড়াতাড়ি করাতে হল। গুরুদেবের এই ভ্রমণে সঙ্গী হচ্ছেন সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ কর, আরণ্যকম, ডাচ্ বাকে দম্পতি এবং আমি। ফরাসী জাহাজ আঁবোয়াজ ধরতে হবে মাদ্রাজের বন্দর থেকে, তাই গুরুদেবের সঙ্গে আমরা ১২ই জুলাই, ১৯২৭ ইং সনে ট্রেন ধরে কোলকাতা ত্যাগ করি। মাদ্রাজে একজন ধনী ব্যক্তি ও তথাকার হাইকোর্টের যশস্বী আইনজীবী, টি.ভি. রামস্বামীর ভবনে গিয়ে উঠলাম। সেইদিন সেই বাড়ীতে একটি বিয়ে ছিল। সানাই, ঢাক, ঢোলের বাজনা খুব চলেছিল। তারপর ১৪ই জুলাই আঁবোয়াজ জাহাজ ধরে জাভা বালিদ্বীপের উদ্দেশ্যে মাদ্রাজ ত্যাগ করলাম। জাহাজের কেপ্টেনের পাশের সব চাইতে ভাল একটি "কেবিনে" গুরুদেবের থাকার

ব্যবস্থা হল। যে কদিন এই জাহাজে ছিলাম খুব আনন্দে ও আরামের মধ্যে দিনগুলি কেটেছিল। গুরুদেবের লেখার কাজ রোজই চলত, মাঝে মাঝে আমাদের পড়ে শুনাতেন। জাহাজটি মাদ্রাজ ত্যাগ করে কোথাও না থেমে সোজা সিঙ্গাপুরে এসে ২০শে জুলাই পৌঁছাল। জাহাজ জেটিতে বিপুল জনসমাবেশ হয়েছিল গুরুদেবকে অভ্যর্থনা করার জন্য। বহু ইংরেজ, ভারতীয়, স্থানীয় চাইনীজ ও মুসলমান সেই সময় উপস্থিত ছিল। সিঙ্গাপুর হতে আরম্ভ করে মালয় দেশের প্রধান প্রধান সহরগুলিতে দিন কয়েক করে অবস্থানের পর সদলবলে গুরুদেব কোয়ালালামপুরে এসে উপস্থিত হলেন। একেবারে সমুদ্রের ধারের একটি বাড়ীতে আমাদের সকলের থাকার ব্যবস্থা হল। এই ভ্রমণকালে আমরা বিলেতি পোষাক পরতাম। গলায় টাই বাঁধার অভ্যেস তখনও সহজ হয়নি। এই কাজে একটু উদ্বেগ বোধ করতাম। সুনীতিবাবু আর আমি পরামর্শ করে ঠিক করলাম যে ভোরবেলায় স্নান করে তারপর গলায় টাই বেঁধে পোষাক পরে নেব আর রাত্রে শোয়ার পূর্বে খোলা যাবে। ঠাণ্ডা জলে ভোরবেলায় স্নান করায় আমার বুকে ঠাণ্ডা লেগে গেল। বুকে ভয়ানক ব্যথা বোধ করতে লাগলাম। গুরুদেবের নিকট ঔষধ আছে জেনে তাঁকে আমার ব্যথার কথা জানালাম। তিনি সব শুনে গম্ভীর হয়ে বল্লেন যে "এ ব্যথা সারাবার ঔষধ আমার নিকট নেই। এ হচ্ছে বিরহের অন্তর বেদনা।" আমি কিছুদিন পূর্বে নূতন বিয়ে করেছিলাম, আমার নববধূটি[১] তাঁর নাত্নী-সম্পর্কীয়া, তাই ঐ কৌতুক আমার সঙ্গে। অবিশ্যি পরে তাঁর ঔষধেই আরোগ্য লাভ করেছিলাম। কোয়ালালামপুর ত্যাগ করে আমরা পিনাং সহরে এসে উপস্থিত হলাম। সমুদ্রের খুব নিকটে স্থানীয় বিত্তশালী এক চাইনীজ ভদ্রলোকের মনোরম একটি বাড়ীতে সকলের থাকার ব্যবস্থা হল। বাড়ীটির বারান্দায় এসে দাঁড়ালে সামনের উন্মুক্ত সীমাহীন সমুদ্র, পাড়ের রাশি রাশি লম্বা নারিকেল বৃক্ষশ্রেণী দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সত্যিই এক অপরূপ দৃশ্য। সমুদ্রের খুব নিকটে বাড়ীটি অবস্থিত হওয়ায় সমুদ্রজলের আঁশ্‌টে গন্ধ নাকে পাওয়া যেত। বিজয়াদশমীর দিনে আমরা পিনাংএ ছিলাম। গুরুদেব সমস্ত দিন ধরেই বিজয়ার বহু চিঠি লিখাতে ব্যস্ত ছিলেন। সন্ধ্যার দিকে ফুটফুটে জ্যোৎস্না, সমুদ্র পাড়ের বালির উপর নারিকেল গাছের কাল কাল ছায়া পড়ে অতি সুন্দর দেখাচ্ছিল। সুনীতিবাবু ও আমি সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেলাম।

'১' কবির পুত্রস্থানীয় মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরের কন্যা সরযূ দেবী।

ফিরে এসে সকলে মিলে রাত্রের আহার সমাপ্ত করে কিছুক্ষণ পরে সকলে বিছানায় গেলাম। চোখে একটু ঘুম এসেছে, তন্দ্রার মধ্যে যেন কিসের একটা গোঁঙান আওয়াজ শুনতে পেলাম। ভাল করে যখন শব্দটি বুঝবার চেষ্টা করছি তখন মনে হল গুরুদেবের ঘরের থেকে আওয়াজটি হচ্ছে। সুনীতিবাবু ও সুরেনবাবুকে জাগিয়ে আমরা গুরুদেবের ঘরের দিকে ছুটে গিয়ে দেখতে পেলাম গুরুদেব তাঁর বিছানার উপরে মূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়ে আছেন ও মুখ দিয়ে আওয়াজ করছেন, শুনে মনে হল যেন কষ্ট বোধ করছেন। তিনি বোধহয় খাওয়া দাওয়ার পর আবার চিঠি লেখায় বসেছিলেন। পায়ের মোজা ও গায়ের জোব্বা জামাটি খুলে ভাল করে শুইয়ে দেওয়া হল। মাথায় বাতাস করা ও পায়ে হাত বুলিয়ে দেওয়ায় যেন একটু সুস্থ বোধ করলেন। জ্ঞান ফিরে এলে চোখ খুলে বল্লেন, "কেমন জানি বড় ক্লান্ত ও কষ্ট বোধ করছিলাম।" আমরা সকলে যে তাঁর সামান্য সেবা করছি তাতে যেন তিনি অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করছিলেন, আমাদের বল্লেন, "এখন আমি বেশ ভাল, তোমরা সকলে ঘুমোতে যাও।" কিছুতেই সেবা নেবেন না। আমরা অগত্যা নিজ নিজ বিছানায় এলাম কিন্তু উদ্‌গ্রীব হয়ে কান পেতে রইলাম আর কোন কিছু হয় কিনা। আমরা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম কারণ ধারে পাশে লোকের বসতি নেই, সহরও বহু দূরে, ডাক্তারের প্রয়োজন হলে পাওয়া খুবই অসুবিধা হত।

মালয়দেশে অবস্থানের সময়ে গুরুদেব বহু অভিনন্দন, অভ্যর্থনা ও সম্মান পেয়েছেন, তাঁকে অনেক সভায় বক্তৃতা দিতে হয়েছে। আমাদের চলাফেরায় লক্ষ্য করেছি ঐ দেশের রাস্তাগুলি খুবই ভাল। রাবারের বাগানও অনেক এবং এইগুলির অধিকাংশের মালিক হচ্ছেন ইংরেজ সাহেবরা। বহুদূর পর্য্যন্ত একস্থান হতে অন্য স্থানে আমাদের গাড়ী করে যেতে হত। রাস্তার দুই পাশে শুধু রাবারের গাছ, এই দৃশ্য দেখে দেখে গুরুদেব ক্লান্ত হয়ে বলেছিলেন, "এই রাবারের স্মৃতিকে রাবার দিয়ে ঘষে মুছে ফেলতে হবে।" ১৬ই আগষ্ট মালয়দেশ ত্যাগ করে দুদিন পরে জাভাদেশে এসে পৌঁছলাম।

জাভাদেশটি তখন ওলন্দাজ গভর্ণমেন্টের অধীনে ছিল। স্থানীয় গভর্ণমেন্ট ও কয়েকজন জাভানীজ রাজা গুরুদেবকে খুবই সম্মান ও খাতির দেখিয়ে অভ্যর্থনা করেছিলেন। দেশটি খুবই সুন্দর এবং প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহাসিক বহু স্থাপত্যকীর্ত্তি ও সভ্যতার নিদর্শন তখনও ঐ দেশে রয়ে গেছে। বহু প্রাচীনকালে ভারতীয়েরা জাভায় রাজ্যবিস্তার করেছিল। এই দেশটির প্রধান সহর হচ্ছে বাটাভিয়া। এর মাঝখান দিয়ে বেশ একটি বড় জলের কেনেল

চলে গেছে। দুই পাড় ইট পাথর দিয়ে বাঁধান। সকাল, সন্ধ্যায় মেয়েদের অবগাহন, কাপড় কাচা, গল্পে-গুজবে কেনেলের দু'পার মুখরিত হয়ে উঠে। জাভার যে দুই-একটি রাজবাড়ীতে গুরুদেবের সঙ্গে আতিথ্যগ্রহণের সুযোগ আমরা পেয়েছিলাম সেই সব স্থানে বিখ্যাত জাভানীজ নৃত্য দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। রাজপরিবারের কন্যারাই অধিকাংশ নৃত্যে যোগ দিতেন। তাঁদের অঙ্গসৌষ্ঠব, হাত ও পায়ের অপূর্ব ভঙ্গি, চলনছন্দ ও রূপসজ্জা নৃত্যগুলিকে এক অনির্বচনীয় রসসৃষ্টিতে পরিণত করেছিল। গামেলাং বাজনার তালে তালে নৃত্যের সমস্ত গতি মনকে মুগ্ধ করে দেয়। জাভানীজ নৃত্য সত্যিই অপূর্ব। ওআয়াং নামক ছায়া অভিনয় দেখার মত। এই ছায়া অভিনয়ের বিষয় হয়েছে প্রধানত মহাভারতের আখ্যানকে অবলম্বন করে। চামড়া কেটে চেপ্টাভাবে মূর্ত্তি তৈয়ের করে এক একটি কাঠির সঙ্গে সংলগ্ন করে দেওয়া হয়। মূর্ত্তিগুলির মধ্যে থাকে অর্জুন, ভীম, ঘটোৎকচ ইত্যাদি। শাদা পর্দার কিছু দূরে একটি প্রদীপ ঝুলিয়ে দেওয়া হয় এবং মূর্ত্তিগুলিকে প্রদীপ ও পর্দার মাঝামাঝিতে ধরে তার ছায়াটাকে পর্দায় ফেলে। মূর্ত্তির হাত পা সঞ্চালিত করে গল্প বলে যায় আর তার সঙ্গে থাকে গামেলাং বাদ্য। দর্শকেরা চুপটি করে গল্পের আসরে যেন গল্প শুনতে থাকে। এই দেশের প্রধান দুইটি প্রাচীন মন্দির হচ্ছে প্রাম্বানাম ও বড়বুদুর। প্রথমটি হচ্ছে হিন্দুমন্দির যার পাথরের প্রাচীরগাত্রে সমস্ত রামায়ণের ঘটনা খোদিত আছে এবং দ্বিতীয় মন্দিরটি বৌদ্ধযুগের, তার পাথরের প্রাচীরগাত্রে বুদ্ধের জীবনী ও ঘটনা খোদাই করা হয়েছে। ভারতীয় স্থাপত্যের ও শিল্পের অপূর্ব কীর্ত্তি এই দুইটি মন্দির। গুরুদেব জাভায় পদার্পণ পরে এই দেশের উদ্দেশ্যে একটি সুন্দর কবিতা লিখেছিলেন, সেইটি ইংরেজি ও ডাচ্ ভাষায় অনুবাদ করে সেইখানে ছাপান হয় ও গুণী ও প্রধান ব্যক্তিদের নিকট বিলি করা হয়। কবিতাটির নাম "শ্রীবিজয়লক্ষ্মী", গুরুদেবের 'জাভাযাত্রীর পত্র' নামক পুস্তকে ইহা ছাপান হয়। এই দেশের অন্যান্য কয়েকটি প্রধান সহর দেখেই গুরুদেব সদলবলে বালিদ্বীপের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

বালিদ্বীপে পৌঁছান ২৫শে আগষ্ট, ১৯১৭ ইং সনে। এইটি একটি ছোট্ট দেশ। পুরাকালে জাভা ও বালির অধিবাসীরা ধর্মে হিন্দু ছিল। তারপর আরবরা এই দেশে ব্যবসা বাণিজ্য করতে আসে ও জাভার অধিবাসীদের ইসলামধর্মে দীক্ষিত করে। বালিদ্বীপের অধিবাসীরা কিন্তু হিন্দুই রয়ে গেল। এখনও সেই দেশে ব্রাহ্মণরা পূজা, পার্বণে ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য

করে থাকে। সংস্কৃত মন্ত্র এদের দ্বারা উচ্চারিত হয় তবে তার বিকৃত অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। সুনীতিবাবু অনেক মন্ত্রের শুদ্ধ উচ্চারণ ওদের বলে দিয়েছিলেন। ঐ দেশের লোকেরা যখন শুনল যে মহাভারতের রামায়ণের দেশ ভারতবর্ষ থেকে আমরা এখানে এসেছি তখন ওরা খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিল। এইখানকার লোকদের সঙ্গে আলাপ হলে দুই-একজন নিজেদের বাড়ীতে আমাদের নিয়ে গিয়েছিল ও তালপাতায় লিখিত প্রাচীন মহাভারত পুঁথি আমাদের দেখিয়েছিল। হিন্দু হলেও তাদের আচার-ব্যবহার, সামাজিক জীবনের সঙ্গে ভারতীয় হিন্দুদের অনেক জায়গায় অমিল দেখা যায়। গো-মাংস ভক্ষণ ঐ দ্বীপবাসীদের নিকট প্রচলিত। এই দেশের সঙ্গীত ও নৃত্যের খুব খ্যাতি আছে। আমরা যে সময়ে ঐ দেশে গিয়েছিলাম তখন পাশ্চাত্য সভ্যতার কিছুমাত্র প্রভাব সেখানে দেখি নাই। অতি সরল জীবন তারা পালন করত। দেশে প্রচুর শস্য জন্মে। খাওয়া পরার বেশী ভাবনা নেই। সঙ্গীত আর নৃত্যেই যেন জীবন ভেসে চলেছে।

বালিদ্বীপে গুরুদেবের আসার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাঙলী নামক স্থানে রাজা বা 'পুংগবে'র এক আত্মীয়ের শ্রাদ্ধোৎসব দেখার জন্য। সমস্ত দেশ জুড়ে শ্রাদ্ধোৎসব বেশ কিছুদিন ধরে চলেছিল। মৃতের জন্য শোক করা অপেক্ষা মনে হয় যেন দেশময় আনন্দোৎসব চলেছে। বহু ইয়ুরোপীয় ও আমেরিকানদের এই উৎসবস্থলে দেখেছিলাম। শুভদিনে শবটিকে নূতন থান কাপড়ে মুড়ে বিরাট এক তাজিয়ার মত বাঁশের উচ্চ মঞ্চে উঠিয়ে শত শত লোক তাকে কাঁধে বহন করে শ্মশানে নিয়ে যায়। সঙ্গে দেশের অন্যান্য শবাদিও একই স্থানে নিয়ে আসে। গামেলাং বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি, সঙ্গীত, নারীপুরুষের কলরবে সমস্ত সহর মুখরিত হয়ে উঠে। শবদাহের স্থানে একটি খোলা ঘরের মধ্যে কাল মখমলে আচ্ছাদিত কাঠের বিরাট বৃষ রাখা আছে, শবটি তারই মধ্যে রাখা হয়। কতগুলি অনুষ্ঠানের পর বৃষের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। শব বহনের তাজিয়াগুলিকে আগুনে পোড়ান হয়। ঠিক সন্ধ্যায় এই ক্রিয়াগুলি করা হয়েছিল।

পাশ্চাত্য সভ্যতার ছোঁয়া না লাগায় এই দ্বীপবাসীদের জীবন সত্যি বড় সুন্দর, সরল ও অকৃত্রিম ছিল। এই কারণে বহু চিত্রশিল্পী আকৃষ্ট হত এই দ্বীপবাসীদের প্রতি। দুয়েকজন ইয়ুরোপীয় শিল্পী ঐ দেশীয় নারীদের বিবাহ করে সেইখানেই বসবাস করতে আরম্ভ করে। স্থানীয় সমাজ-জীবনের অবস্থা জানবার জন্য খোঁজ করতে গিয়ে জানলাম যে আমাদের আগমনের কিছু

পূর্বেও নাকি এই দ্বীপবাসীদের মধ্যে সতীদাহের প্রচলন ছিল। পরবর্ত্তী কালে ডাচ্ গভর্ণমেন্ট এই প্রথাকে রোধ করে দেন। জাভা ও বালিদ্বীপ ভ্রমণের সময়ে আমরা অনেক নূতন নূতন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করবার ও দেখবার সুযোগ লাভ করেছিলাম।

জাভা ও বালিদ্বীপ ভ্রমণের দুই বছর পরে ভারত গভর্ণমেন্টের বৃত্তি লাভ করে আমরা চারজন ভারতীয় চিত্রশিল্পী ১৯২৯ ইং সনে লণ্ডনে গিয়েছিলাম। সেই দেশে যাবার উদ্দেশ্য ছিল তথাকার ইণ্ডিয়া হাউস নামক ভারত গভর্ণমেন্টের অফিস বাড়ীর দেয়ালে চিত্র আঁকা। আমাদের লণ্ডনে থাকাকালীন গুরুদেব তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীসহ ১৯৩০ ইং সনে লণ্ডনে সাউথ কেনসিংটনে অবস্থিত রেজিনা হোটেলে এসে উঠলেন। হোটেলের মালিক হচ্ছেন একজন বাঙালী ভদ্রলোক। গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করবার জন্য প্রতিদিন বিকেল বেলায় আমি ঐ হোটেলে যেতাম। তিনি ফরাসী দেশ হয়ে এখানে বেড়াতে এসেছেন। সঙ্গে তাঁর আঁকা বহু ছবি ছিল। প্যারিসে তাঁর ছবির একটি প্রদর্শনী হয় এবং শিল্প-সমালোচকেরা তাঁর ছবির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। নূতন ধরনের এই ছবিগুলি বলে তাঁরা এতে খুব আকৃষ্ট হন। লণ্ডন সহরে রয়াল কলেজ অব আর্টের তখনকার প্রিন্সিপ্যাল উইলিয়ম রথেনষ্টাইন গুরুদেবের পুরাতন বন্ধু, তিনি গুরুদেবের ছবিগুলি দেখে ঐ দেশে একটি ছবির প্রদর্শনী করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। শেষ পর্য্যন্ত গুরুদেবের কয়েকজন পুরাতন ইংরেজ বন্ধুর প্রচেষ্টায় বার্মিংহামে তাঁর চিত্রের একটি প্রদর্শনী হয়। স্থানীয় মিউজিয়ামের জন্য প্রদর্শনী হতে কয়েকটি ছবি ক্রীত হয়। প্রদর্শনীতে দেবার উপযুক্ত ছবি বাছাই করার জন্য আমাকে গুরুদেব আদেশ দেন। রেজিনা হোটেলের একটি ঘরে বসে ছবিগুলি বাছাই করছিলাম, সেই সময়ে গুরুদেব ঐখানে ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালেন তারপর হাসতে হাসতে আমাকে বল্লেন, "তুই ভাবছিস, গুরুদেব কি সব ছবি এঁকেছেন, তোদের ছবির সঙ্গে একেবারেই মিল নেই। কিন্তু শুনে অবাক হবি আমার ছবিগুলি ইয়ুরোপীয় চিত্র-সমালোচকদের মনে খুব নাড়া দিয়েছে, তারা বেজায় প্রশংসা করছে।" তাঁর সেদিনকার উক্তি আজ সত্যে পরিণত হয়েছে। আজ রবীন্দ্র-চিত্র জগৎ-শিল্পের মধ্যে উচ্চ স্থান লাভ করেছে। লণ্ডন হতে গুরুদেব জার্ম্মানী, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশে গমন করেন এবং ইয়ুরোপের নানা স্থানে তাঁর আঁকা ছবির প্রদর্শনী হয়।

রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি, দার্শনিক, সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী, শিক্ষাবিদ, সঙ্গীতস্রষ্টা, সর্বগুণে গুণান্বিত, এই যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁর সঙ্গে সেই ১৯১১ ইং সন হ'তে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্য্যন্ত নানাভাবে আলাপের

ও তাঁকে দর্শনের সুযোগ আমি পেয়েছি। আমি লক্ষ্য করেছি যে ত্রিপুরা রাজ ও ত্রিপুরার রাজবংশের প্রতি তাঁর অন্তরে বিশেষ একটি দরদ ও ভালবাসা ছিল। তিনি ত্রিপুরাকে কখনও ভুলতে পারেন নাই। দেখা হলেই আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করতেন ত্রিপুরার নানা বিষয়ে সংবাদ পাবার জন্য; তারপর লালুকর্ত্তা (মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা) কেমন, তাঁর ছেলেপিলেরা কেমন আছে ইত্যাদি। অন্তরঙ্গ বন্ধু মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের সন্তান বলে মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরকে নিজ পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। কোন এক সময়ে ত্রিপুরায় এসে আগরতলার কুঞ্জবনের একটি বাড়ীতে কিছুদিন তিনি বাস করেছিলেন। তখন মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের রাজত্বের সময়। কুঞ্জবনের সুন্দর দৃশ্য তাঁকে খুবই মুগ্ধ করেছিল। তাঁর সঙ্গে আলাপের সময়ে তিনি অনেকবার ঐ সুখস্মৃতির কথা উল্লেখ করেছিলেন। শান্তিনিকেতন ত্যাগ করার পরে ১৯৩৮ ইং সনের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি শান্তিনিকেতনে বেড়াতে এলাম, ভেবেছিলাম বোম্বে যাবার পূর্বে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করে যাব। মাটির বাড়ী শ্যামলীতে প্রাতে এলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করব বলে, এসে দেখি তিনি নিবিষ্ট মনে টেবিলের উপর একটু ঝুঁকে কি একটা লেখায় ব্যস্ত। আমরা যখনই গিয়ে প্রণাম করি তখনই তিনি আমাদের সঙ্গে আলাপ করে থাকেন। কিন্তু আমার মনে হল, এই সময়ে তাঁর চিন্তার ব্যাঘাত সৃষ্টি করা উচিত নয়। তাই আমি বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম এমন সময় গুরুদেবের প্রিয় পুরাতন ভৃত্য নীলমণি এসে বল্লে, "বাবু ভেতরে যান না, বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন কেন।" আমি তাকে বুঝিয়ে বল্লাম যে একটু পরে দেখা করব। আমাদের চুপি চুপি কথাবার্ত্তা তাঁর কানে গিয়েছিল তিনি মাথা তুলে দেখলেন, আমাকে দেখেই ডেকে ভিতরে আসতে বল্লেন। প্রণাম করে পাশের মোড়াটার উপর বসলাম। তিনি আমার নিকট ত্রিপুরার সব সংবাদ জেনে নিলেন। তারপর যখন জানলেন যে আমি বোম্বে রওনা হচ্ছি তখন আমাকে বল্লেন, "তোদের মহারাজ আর কয়েকদিন পর শান্তিনিকেতনে আসবেন তখন তুই থাকবিনে? তুই হচ্ছিস শান্তিনিকেতন ও ত্রিপুরার মাঝে সেতু কারণ আমাদের প্রাক্তন ছাত্র আর ত্রিপুরা রাজ্যের লোক।" তাঁর আদেশ শিরোধার্য্য করে দিন কয়েক পর আবার শান্তিনিকেতনে এলাম। ত্রিপুরার মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য ৭ই জানুয়ারী, ১৯৩৯ ইং সনে পার্ষদগণসহ শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছালেন। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র সোমেন্দ্র দেববর্ম্মাও ঐ দলে ছিলেন। আম্রকুঞ্জে মহারাজকে গুরুদেব সংবর্দ্ধনা করেন আশ্রমের প্রচলিত অনুষ্ঠানের দ্বারা। এই সময়ে গুরুদেব একটি সুন্দর ভাষণ দিয়েছিলেন। তিনি মহারাজকে বলেছিলেন যে "তোমার

পূর্বপুরুষদের সহিত আমার বহুদিনের ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব ও আত্মীয়সুলভ সম্বন্ধ রয়েছে। সেই বংশেরই সেই সব পুরাতন স্মৃতিকে বহন করে আজ তুমি শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হয়েছ" ইত্যাদি। গুরুদেব মহারাজকে অভ্যর্থনা করেছিলেন মহারাজ বলে নয়, নিজের আত্মীয় রূপে। লক্ষ্য করেছিলাম কী আন্তরিকতার সহিত গুরুদেব মহারাজকে শান্তিনিকেতনে গ্রহণ করেছিলেন। বিশ্বভারতীর সর্ববিভাগ ও কর্ম্মপদ্ধতি মহারাজাকে দেখান হয়, এতে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন। তখনই তিনি সঙ্গীত-ভবনের সংলগ্ন রঙ্গমঞ্চের প্রস্তুতির যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের প্রতিশ্রুতি দান করেন। তাঁরই আনুকুল্যে বর্ত্তমান সঙ্গীত-ভবনের রঙ্গমঞ্চটি প্রস্তুত হয়। তাঁর শান্তিনিকেতন আগমনের কয়েক বছর পরে অর্থাৎ ১৯৪১ ইং সনে রাজদরবার হতে প্রেরিত ব্যক্তিরা শান্তিনিকেতনে এসে গুরুদেবকে ১৩ই মে তারিখে ভারত-ভাস্কর উপাধি প্রদান করেন।

গুরুদেবের মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। তাঁর সঙ্গে নানা কথার প্রসঙ্গে ত্রিপুরা রাজবংশের সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন, "দেখ্, তোদের মহারাজাদের হয়ত হাইদ্রাবাদের নিজামের মত অর্থ নেই কিন্তু তাঁদের নিকট হতে যে আন্তরিকতা ও রাজোচিত ব্যবহার পেয়েছি ভারতের কোন রাজাদের থেকে তা আমি পাইনি। আমাদের দেশের প্রাচীন কাব্য ও সাহিত্য পড়ে রাজাদের সম্বন্ধে যে উচ্চ ধারণা আমাদের মনে আসে আমি শুধু একমাত্র ত্রিপুরা মহারাজাদের মধ্যেই সেই রাজোচিত গুণাবলির পরিচয় পেয়েছি, সত্যিই এঁরা রাজারই উপযুক্ত ব্যক্তি।" এত বড় মহান ব্যক্তির এই উক্তিতে সত্যিই খুব আনন্দ অনুভব করেছিলাম সেদিন। ত্রিপুরার মহারাজেরা গুরুদেবের শান্তিনিকেতন আশ্রম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কার্য্যে সর্বদা সহায়তাপরায়ণ ছিলেন ও বহুপ্রকারে আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। অন্তরে তাঁরা গুরুদেবকে বন্ধুরূপে বরণ করেছিলেন এবং শ্রদ্ধাও দেখিয়েছিলেন। গুরুদেব এই বন্ধুত্বের স্বীকৃতি বহুবার প্রকাশ করেছেন এবং ত্রিপুরার ইতিহাসকে অমরত্ব লাভের সুযোগ দিয়ে গেলেন তাঁর লিখিত রাজর্ষি উপন্যাসে ও বিসর্জন ও মুকুট নাট্যকার্যের মাধ্যমে। রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে বহু রাজ্য, রাজা ইতিহাসের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে কিন্তু একবার মহাকবির কাব্যে যে স্থান পেল সে অমর হয়ে গেল।

কলাভবন

শান্তিনিকেতনে কলাভবন ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা বলা হলেও এর সূচনা তার পূর্বেই হয়েছিল। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই আগ্রহী ছিলেন শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের শিক্ষায় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সংগীত ও নন্দনবিদ্যা বা আর্ট শিক্ষার একটা বিশেষ স্থান যেন থাকে। পরবর্তীকালে তাঁর সেই ইচ্ছারই রূপগ্রহণ কলাভবন ও সংগীতভবন। বিশ্বভারতীর ভিত্তিস্থাপনার পরে ১৯১৯ সালের ৩ জুলাই অধ্যয়ন অধ্যাপনার কাজ শুরু হয় নূতন উদ্যমে এই প্রতিষ্ঠানে। কলাভবনের কার্যারম্ভও হয় একই সময়ে দ্বারিক নামে বাড়িটির উপরতলায়। দক্ষিণ ভারতীয় একটি ছাত্র রামানুজ কিছুকাল পূর্বেই শান্তিনিকেতনে চিত্রাঙ্কন শিক্ষালাভের আশায় এখানে এসেছিল। তখনও এই শিক্ষার জন্য কোনো নিয়মিত ক্লাসের ব্যবস্থা এখানে ছিল না। রামানুজ খাতা পেন্সিল নিয়ে আশ্রমের চারদিকে ঘুরে ঘুরে গাছপালা, ছাত্রদের ক্লাসের ছবি আঁকত। গৌরপ্রাঙ্গণের পুব দিকের রাস্তার ধারে একটি বড়ো বট গাছ ছিল। তারই নীচে গোড়া ঘেঁষে কতগুলি তালের খুঁটির ওপরে উঁচু পিঠওয়ালা গোলাকার খড়ো চালাঘর ছিল। তার চার পাশে কোনো বেড়া ছিল না। ঘরটির নাম ছিল উটজ। গুরুদেবের ক্লাস এখানে হত। একদিন আমাদের বাংলা ক্লাসে "বলাকা" কবিতা পড়াচ্ছিলেন। ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের পাশে অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন ও আরো কয়েকজন অধ্যাপক বসে গুরুদেবের পড়ানো শুনছিলেন। রামানুজ এক পাশে বসে গুরুদেবের ছবি আঁকবার চেষ্টা করেছিল। মনে আছে তিনি রামানুজকে ক্লাসের সময়ে এমনিভাবে ছবি আঁকতে বারণ করে দিয়েছিলেন। তিনি এটা পছন্দ করতেন না। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু গোড়ার দিকে শান্তিনিকেতনে প্রতি সপ্তাহে দু-একদিন করে কলকাতা থেকে আসতেন। তিনি রামানুজকে ছবি আঁকা শেখাতে লাগলেন। ব্রহ্মবিদ্যালয়ে আমরা শুনতে পেলাম নন্দবাবু ছাত্রদের মধ্যে ছবি আঁকার একটি প্রতিযোগিতার কথা সকলকে জানিয়ে দিয়েছেন। আঁকার বিষয়গুলি হল বিদ্যালয়ে অল্পকাল পূর্বে বৈদ্যুতিক বাতির তারগুলি নেবার জন্য বড়ো বড়ো কাঠের থাম মাটিতে পোঁতা হয়েছে—তারই একটি ছবি,

গৌরপ্রাঙ্গণে সাম্প্রতিক রোপণ করা কাঞ্চন ফুলের গাছ ও তার বাঁশের ঘেরাও, তার ছবি এবং এক একটি করে গোরু, গোলঞ্চ ফুল ও একটি শাল গাছ। এই প্রতিযোগিতায় উৎসাহী হয়ে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, মনীষী দে, আরো আরো কয়েকজন ছাত্র ও আমি উক্ত ছবিগুলি আঁকায় লেগে গেলাম। সেইসব ছবি নন্দবাবু সংগ্রহ করে কলাভবনের মিউজিয়ামের সংগ্রহে রেখেছিলেন। ইতিমধ্যে কলাভবনে চিত্র অঙ্কন শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে শিক্ষকরূপে শিল্পী অসিতকুমার হালদার কার্যে এসে যোগ দিয়েছিলেন। রামানুজকে নন্দবাবু তখনও মাঝে মাঝে এসে চিত্রাঙ্কনে শিক্ষা দিচ্ছেন। তার কিছুদিন পরেই তিনি স্থায়ী শিল্পী-শিক্ষকরূপে কলাভবনের কাজে এসে যোগ দিলেন।

কলাভবনের প্রথম ছাত্ররূপে কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের ছাত্রত্রয় অর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরাচাঁদ ডুগার, কৃষ্ণকিঙ্কর ঘোষ এবং শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় থেকে আমি যোগ দিয়েছিলাম। ছাত্রভর্তির বিষয়ে বিশ্বভারতীর কর্মপদ্ধতিতে বিশেষ কোনো আইনগত নিয়মাদি তখনও প্রণয়ন করা হয়নি। একদিন বিকেলের দিকে গৌরপ্রাঙ্গণে শালতলায় বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হয়। তখন বিধুশেখর শাস্ত্রীমশায় ও অন্যান্য কয়েকজন অধ্যাপকের উপস্থিতিতে ছাত্রদের বলা হল যারা সংগীত, চিত্রকলায় অথবা গবেষণায় যোগ দিতে ইচ্ছুক তারা লাইন থেকে এক পা এগিয়ে এসো। তখনও বিশ্বভারতীর নামকরণ করা হয়ে থাকলেও ভবন শব্দটির দ্বারা সংগীত, চিত্রকলা ইত্যাদির বিভাগগুলি চিহ্নিত হয়নি। এতদিন আশ্রম বিদ্যালয়ে ছোটোকাল থেকে ছাত্ররূপে ছিলাম, তার নিয়মকানুনের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে খাপ খাইয়ে ছিলাম, সেই সহজ অভ্যস্ত জীবন থেকে অজানার মধ্যে এক পা এগিয়ে আসার কথা ভেবে মনের মধ্যে কেমন যেন অদ্ভুত একটি ভয় ও আনন্দ অনুভব করেছিলাম। এ কথাও ঠিক অজানাকে জানার আনন্দ কম লোভনীয় নয়। লাইন থেকে এক পা এগিয়ে দিলাম। দেখলাম যারা এগিয়ে এল তাদের সংখ্যা খুবই কম। সংগীতে যোগ দিতে অনাদি দস্তিদার, গবেষণায় যোগ দিতে দক্ষিণ ভারতীয় চালামায়া, চিত্রকলায় যোগ দিতে একমাত্র আমি ছিলাম। শাস্ত্রীমশায় আদেশ দিলেন আমাদের জিনিসপত্তর ও বিছানা নিয়ে নির্দিষ্ট একটি অসমাপ্ত ছাত্রাবাসে চলে যেতে। পরবর্তীকালে এই বাড়িটিতে পাঠভবনের শিশুছাত্ররা বাস করেছিল। যাই হোক, কলাভবনে যোগ দেবার জন্য তখন অভিভাবকের কোনোপ্রকার অনুমতিপত্র, কোনোপ্রকার ভর্তির ফর্ম পূরণ করার প্রয়োজন হয়নি। শুধু শাস্ত্রীমশায়ের একমাত্র আদেশই

তখন যথেষ্ট ছিল। যে বাড়িতে গিয়ে উঠলাম তার মধ্যেকার বড়ো হলঘরটির তখনও ছাদ তৈরি হয়নি। কেবল চার কোণের ছোটো ছোটো চারটি ঘর তৈরি হয়ে গেছে। পুব দিকের দুটি কোণের ঘরে পাণিনির অধ্যাপক কপিলেশ্বর মিশ্র, ছাত্র চালামায়া ও অনাদি দস্তিদার বাস করতে গেলেন। নিয়মিতভাবে কলাভবনের কাজ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই রামানুজ শান্তিনিকেতন ত্যাগ করে চলে গেল, তাকে পরে আর কোথাও দেখিনি। কলকাতার ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট প্রতিষ্ঠানের স্টুডিয়োতে দক্ষিণ ভারতীয় ওয়ারিয়র নামক যে ছেলেটি নন্দবাবুর কাছে চিত্রাঙ্কনে শিক্ষা গ্রহণ করত সেও এসে কলাভবনে যোগ দিয়েছিল। পুরাতন লাইব্রেরি-সংলগ্ন পশ্চিমের একতলা বাড়িটি গুরুধাম নামে পরিচিত। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হবার কিছুকালের মধ্যে সিংহল থেকে বয়স্ক একজন বৌদ্ধ মহাস্থবির, গৈরিক বসনধারী সন্ন্যাসী বা মঙ্ক ও তাঁর সঙ্গে মধ্যবয়সী আরো দু-তিনজন স্থবির বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা শাস্ত্রীমশায়ের কাছে পালি, তিব্বতি, সংস্কৃত, বৌদ্ধশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য বিশ্বভারতীতে যোগদান করেছিলেন। একজন তিব্বতীয় লামাও তখন ছিলেন তিব্বতীয় ভাষা ইত্যাদি শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা গুরুধামে বাস করতেন। জানি না কী প্রকারে কলাভবনের ছাত্র ওয়ারিয়রও সেই গৃহে বাস করবার ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। স্থবিরদের পরামর্শে গভীর রাত্রিতে মোমবাতির জ্বলন্ত শিখার প্রতি এক দৃষ্টে লক্ষ্য স্থির রেখে কী নাকি ধ্যান ইত্যাদি করবার চেষ্টা করেছিল। যার জন্য কিছুদিন পরে ওয়ারিয়রের মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ দেখা গেল এবং একদিন কাউকে কিছু না বলে শান্তিনিকেতন ত্যাগ করে কোথায় চলে গেল। তারপর আমরা তার আর কোনো সংবাদ পাইনি। ঘটনাটি খুবই পরিতাপের বিষয়। ব্রহ্মবিদ্যালয়ের আরেকটি ছাত্র অন্নদা মজুমদার কলাভবনের গোড়ার দিকে এসে যোগ দেয়। বেশ কয়েকটি ভালো ছবিও এঁকেছিল, কিন্তু অল্পকাল পরেই কলাভবন ত্যাগ করে সে চলে যায়।

এই ভবনে শিল্পশিক্ষকদের সংখ্যা তখন তিনজন—নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার ও সুরেন্দ্রনাথ কর। সুরেনবাবু কলাভবন শুরু হবার পূর্বে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ড্রইং শেখাবার জন্য বছর তিনেক আগে শান্তিনিকেতনে এসে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। গোড়ার দিকে এই ভবনের শিক্ষায় কোনোপ্রকার নির্ধারিত পদ্ধতি ছিল না। সিলেবাস, শিক্ষাসমাপ্তির বছর নির্ণয়, শিক্ষার শেষে ছাত্রদের ডিপ্লোমা দেওয়া হবে কিনা তার কিছুই ঠিক ছিল না। শিক্ষক ও

বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের মনে কিছুমাত্র প্রশ্ন জাগেনি এগুলির আদতে কোনোপ্রকার প্রয়োজন আছে কিনা। ছাত্ররা তাদের গুরুর কাছে এসেছে শুধু একটিমাত্র ধ্যানধারণা নিয়ে কী করে চিত্রাঙ্কনবিদ্যায় শিক্ষা লাভ করা যায়, মনে তাদের আর অন্য কোনো চিন্তা ছিল না। কলকাতা থেকে আগত শিল্পীছাত্রত্রয়ের সঙ্গে তখনও ভালোভাবে ভাব না হওয়ায় আমি খুবই একা একা বোধ করতাম। আশ্রমবিদ্যালয়ের ছাত্র বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় স্কুলে ছাত্ররূপে থাকার সময়ে ছবি আঁকত, তাকে গিয়ে বললাম, "লেখাপড়া করে আর কী হবে, চলো ছবি আঁকায় যোগ দেবে।" এ কথা শুনে প্রথমে সে বললে, "কী করে তা সম্ভব?" শাস্ত্রীমশায় লাইব্রেরির একটি ঘরে বসে বিদ্যাচর্চা ও গবেষণা করতেন। তাঁর কাছে বিনোদ ও আমি গিয়ে তাঁকে জানালাম বিনোদও চিত্রাঙ্কন শিক্ষার জন্য কলাভবনে যোগ দিতে ইচ্ছুক। শাস্ত্রীমশায় প্রথমে বললেন, "ওর তো চোখ খারাপ, তা ভিন্ন ওর অভিভাবকের অনুমতিরও প্রয়োজন হবে।" অনুমতিপত্র পরে আনিয়ে দেওয়া হবে বলে তাঁর মত নিয়ে মধ্যবিভাগ ত্যাগ করে বিছানা বাক্স বয়ে নিয়ে আমার ঘরে বিনোদকে নিয়ে এলাম।

এই গৃহে আমরা দুজনে আমাদের ছোটোখাটো একটি স্বর্গ রচনা করেছিলাম। ছবি আঁকা, ছবির কথা ভাবা, তার বিষয়ে আলোচনা করাই ছিল একমাত্র আমাদের ধ্যান ধারণা। খুব আনন্দের মধ্যেই সে-সব দিনগুলো কেটেছিল। এই উচ্চ চিন্তার মধ্যে সাংসারিক চিন্তাও একেবারে বাদ পড়ত না। তখনকার দিনে এক টাকায় বড়ো ধরনের আটটি মুরগি পাওয়া যেত। এদের সদ্ব্যবহার করব বলে গোটা সাত-আট মুরগি কিনে রাখতাম। শিল্পের উচ্চ চিন্তায় সর্বদা মগ্ন থাকায় মুরগিগুলোর কথা অনেক সময় ভুলে যেতাম। আমাদের এই ভালোমানুষির সুযোগ নিয়ে মুরগিগুলি কিছুদিন বাদেই ডেস্কের মধ্যে, বিছানার মধ্যে ডিম পাড়া শুরু করে দিত। তবে এরা আমাদের শিল্পচিন্তায় বিশেষ কোনোপ্রকার ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারত না। ১৯২১ সালের শীতকালে নন্দবাবু, অসিতবাবু ও সুরেনবাবু মধ্যপ্রদেশ গোয়ালিয়র রাজ্যে বৌদ্ধযুগের বাঘগুহার প্রাচীরচিত্রের নকল করবার জন্য সেখানে যান। সেখান থেকে তাঁরা সর্বদা পোস্টকার্ডে ছবি এঁকে সংবাদাদিসহ চিঠি লিখতেন এবং তার মধ্যে প্রাচীরচিত্র অঙ্কনের পদ্ধতির বিষয় উল্লেখ থাকত। তাঁদের চিঠির দ্বারা উৎসাহিত হয়ে বিনোদ ও আমি যে গৃহে বাস করতাম তার দেওয়ালে মাটির রঙ ও ভাতের মাড় মিশিয়ে দুটি চিত্র এঁকেছিলাম। শান্তিনিকেতনে দেওয়ালচিত্রের
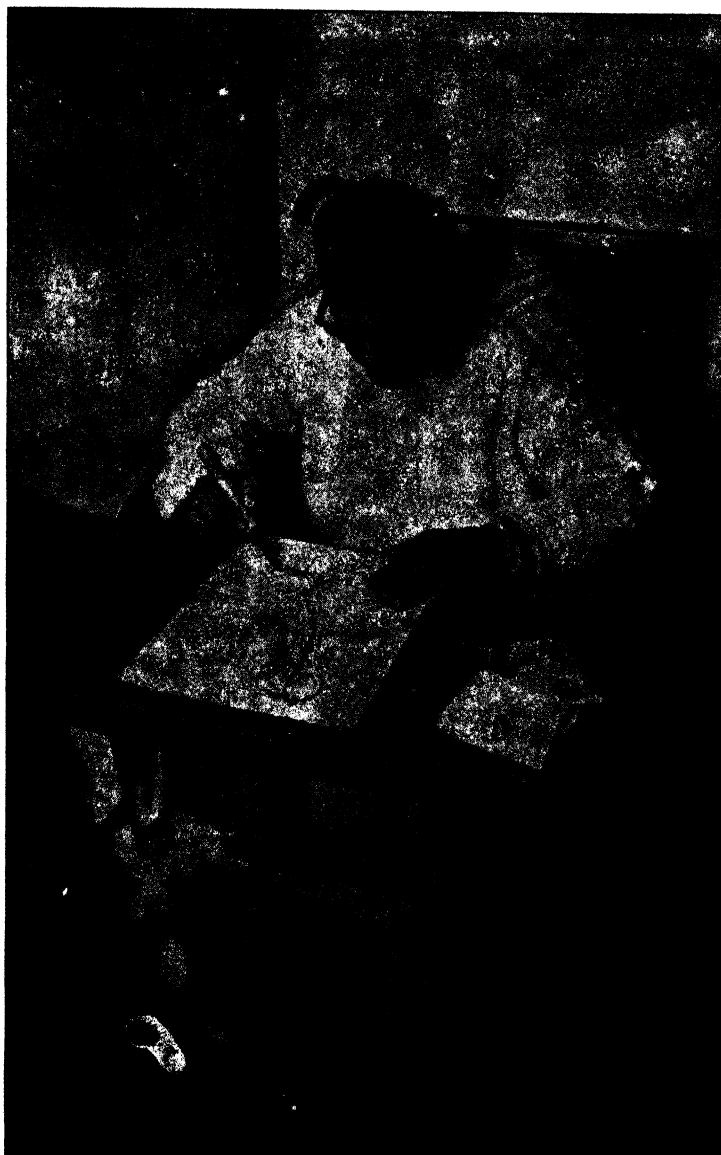
বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

ইতিহাসের এটাই প্রথম সূচনা। পরবর্তীকালে বিনোদ কলাভবনের হোস্টেলে, পুরাতন লাইব্রেরির দেওয়ালে, হিন্দীভবনে, শিশুবিভাগের বাসগৃহের দেওয়ালগুলিতে ছবি এঁকেছিল। আমাদের পাশের ঘরে যে তিনজন শিল্পীছাত্র থাকতেন তাঁদের মধ্যে অর্ধেন্দুবাবু দেখতে ছিলেন সুপুরুষ। এমনিতে দেখতে সুন্দর চেহারা, তার ওপরে একটু শৌখিন হওয়ায় যত্ন করে চেহারায় বেশ ঔজ্জ্বল্য এনেছিলেন। সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করতে ভালোবাসতেন। জামা কাপড় সর্বদা ধোপদুরস্ত। চোখে পাশনে চশমা, চশমার কাঁচের কোনো শক্তি নেই (পাওয়ারলেস)। প্রত্যেকদিনের জন্য এক-একটি নির্দিষ্ট ফিতার রঙ ছিল, সেই অনুযায়ী প্রতিদিনই ভিন্ন রঙে ফিতা পাল্টানো হত। রোদে বের হলে মাথার ওপরে থাকত সুন্দর একটি বর্মি ছাতা, পায়েও ঐ দেশীয় সুন্দর এক জোড়া কাঠের স্যাণ্ডেল। হাতে প্রায়ই ধরা থাকত কোনো সুগন্ধ ফুল। আমাদের ঘর ও কলাভবনের দ্বারিক বাড়িটার দূরত্বের মধ্যে একটি ছোটো মাঠ ছিল সবুজ ঘাসে ঢাকা, মাঝখানে একটি শিরিষ ফুলের গাছ। শরৎকালে ভোরের দিকে কলাভবনে চলেছি। সবুজ মাঠটি পার হব, হঠাৎ চোখে পড়ল সুবেশধারী অর্ধেন্দুবাবু সবুজ মাঠে ঘাসের ওপরে কাত হয়ে শুয়ে আছেন। একটু অবাক হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ব্যাপার কী, এখানে এমন করে শুয়ে আছেন যে?" গান গেয়ে উত্তর দিলেন, "সারা নিশি ছিলেম শুয়ে বিজন ভুঁয়ে মেঠোফুলের পাশাপাশি।" শরতের আগমনে সবুজ মাঠে মেঠোফুলের নীল, লাল, হলুদ, বেগুনি রঙের অপূর্ব সমাবেশ, মনে হয় সবুজ গালিচার ওপরে মূল্যবান নানা রঙের জহরতের ছড়াছড়ি। কয়েকদিন আগেই গুরুদেব তাঁর নব রচিত গান "সারা নিশি ছিলেম শুয়ে বিজন ভুঁয়ে মেঠো ফুলের পাশাপাশি" গানটি আমাদের শিখিয়েছিলেন। অর্ধেন্দুবাবু সর্বদা আমরা যারা শিল্পী হতে যাচ্ছি তাদের বেশভূষা কেমনটি হবে তার সম্বন্ধে অযাচিত উপদেশ দিতেন। বলতেন ধুতির সঙ্গে শার্ট পরা এ একেবারে অশিল্পীজনোচিত; ধুতির সঙ্গে পাঞ্জাবি পরতে হবে ইত্যাদি। গুরুদেব সদ্য জাপান থেকে আশ্রমে ফিরে এক সন্ধ্যায় জাপানিদের অনেক গুণের কথা শোনালেন। তারা দুটো কাঠি দিয়ে কেমন করে খায় সে কথাও বললেন। অর্ধেন্দুবাবু আমায় বললেন দুটো বাঁশের কাঠি তৈরি করে দিতে। দিলাম কাঠি দুটো তৈরি করে। রান্নাঘরে আমরা পাশাপাশি বসে আহার করতাম। পাতে ভাত, ডাল, আলুর তরকারি পরিবেশন করা হলে অর্ধেন্দুবাবু ডাল ভাত হাত দিয়েই খেলেন, আলুগুলোকে কিন্তু খেলেন দুটো কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে। পাশের ছেলেরা এইসব দেখে

বলাবলি করছিল, "শিল্পীদের কাণ্ডকারখানা সবই অদ্ভুত ধরনের।" কলাভবনে শিক্ষায় তাঁকে ভালো ছাত্র বলতে হবে। ভালো ড্রইং, সুন্দর রঙ লাগানো, সুন্দর ফিনিশ করা সব গুণই তাঁর মধ্যে ছিল। ছাত্রাবস্থায় অনেক ভালো ভালো ছবি এঁকেছেন। কলকাতায় ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের বাৎসরিক চিত্র প্রদর্শনীতে ছবি দিয়েছেন এবং অনেক ছবি বিক্রি হয়েছে ও সুখ্যাতি লাভ করেছেন। তিনি গানও গাইতে পারতেন।

হীরাচাঁদ ডুগার বয়সে আমাদের চেয়ে একটু বড়ো ছিলেন। তাঁর যে গুণটি প্রথমেই চোখে পড়ে তা হল সুবেশ ও পরিচ্ছন্নতা। আমাদের সঙ্গে গল্প তামাশা করেন তবে মিতভাষী। সুরসিকও বলে মনে হয়। কলাভবনে নিজের কাজের জায়গায় সব জিনিসই গুছিয়ে রাখা তাঁর সু-অভ্যাস ছিল। কাজ শুরু করবার আগে গোটা তিন-চার ড্রাইং পেন্সিল ছুরি দিয়ে কেটে সিসগুলিকে ছুঁচলো করে নিয়ে কাজের আসনের পাশে পর পর করে সাজিয়ে রাখতেন। রবার, তুলি, রঙ সবই থাকত গোছানো। ড্রইং কাগজে পেন্সিল দিয়ে ছবির ড্রইং শুরু করে অনেক সময় রবার দিয়ে পেন্সিলের লাইনকে মুছে ফেলতে হয় সংশোধনের উদ্দেশ্যে। কাগজে তখন রবার ঘষার ময়লা ছড়িয়ে থাকে। ডুগারের সব কাজেই পরিচ্ছন্নতা ছিল। যত্ন করে রুমাল দিয়ে কাগজ থেকে সেই ময়লাগুলোকে পরিষ্কার করে ফেলতেন। ছবিতে রঙ প্রয়োগ করবার আগে পেন্সিলের ড্রইংটি নিখুঁতভাবে আঁকা চাই, পরিষ্কার ও যত দূর সম্ভব যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন। তাঁর কোনো অভাব তিনি রাখতেন না। তাঁর শুধু পেন্সিল দিয়ে আঁকা সুন্দর নিদর্শন হল মা ও ছেলের একটি চিত্র যা কলাভবনের সংগ্রহালয়ে রক্ষিত আছে। একবার একটি বিবাহের বিষয়কে নিয়ে মস্তো বড়ো ছবি শুরু করেছিলেন। নন্দবাবু ড্রইংটির স্থানে স্থানে সংশোধন করে দিয়েছিলেন। জানি না শেষ পর্যন্ত রঙ প্রয়োগ করে ছবিখানিকে শেষ করতে পেরেছিলেন কিনা। গ্রীষ্মের ছুটিতে কলাভবনের আমরা কয়েকজন ছাত্র সেবারে বাড়ি যাইনি, আশ্রমেই রয়ে গেলাম। পূর্বের বাসগৃহটি বদলে 'নূতন বাড়ি' নামে ভিন্ন গৃহে এখন আমরা বাস করি। দেহলী গৃহে গুরুদেব বাস করতেন, তারই সংলগ্ন পশ্চিমে অবস্থিত এই নূতন বাড়িটি। পশ্চিমের কোঠায় অর্ধেন্দুবাবু, হীরাচাঁদ ডুগার ও শ্রীহট্ট থেকে আগত একজন মধ্যবয়স্ক স্কুল শিক্ষক রমেশচরণ বসু মজুমদার বাস করতেন। মাঝের কোঠায় বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও আমি বাস করতাম। শান্তিনিকেতনের গ্রীষ্মে তাপমাত্রা একটু বেশিই হয়ে থাকে; তবে বিকেলের পর থেকে সন্ধ্যা ও

রাতটি বড়োই উপভোগ্য মনে হত। লক্ষ্য করতাম প্রতিদিন বিকেলে স্নান সেরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে সুবেশ হীরাচাঁদ ফলের রসের শরবত পান করে একটি ডিজ ল্যাম্প নিয়ে ঘরের দক্ষিণ বারান্দায় এসে বসত। সামনে থাকত ড্রইং কাগজ, তারই ওপরে পেন্সিল দিয়ে চলত ধীর প্রয়াস ইন্সপিরেশনে নূতন ছবির ডিজাইনকে ধরবার। হীরাচাঁদ অচঞ্চল, ধীর ও স্থির। অর্ধেন্দুবাবুও এসে অনেক সময় শরবতের অংশ গ্রহণ করে এই ইন্সপিরেশনের মুহূর্তে নূতন ছবির ডিজাইনকে রেখাপাতে ধরবার চেষ্টা করতেন। এমনি এক দিনের সন্ধ্যায় আমি ও বিনোদ উপস্থিত ছিলাম। আমার সংগ্রহে অর্ধেন্দুবাবুর এমনিতরো মুহূর্তে আঁকা কয়েকটি ড্রইং অনেকদিন ধরে রেখেছিলাম। পরবর্তীকালে নিচু বাংলোর ধারে হীরাচাঁদ একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে সস্ত্রীক বাস করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলো বছর দুই কিংবা আড়াই বছর বয়স্ক ছোটো, সুন্দর একটি ছেলে। এই ছেলেটি বড়ো হয়ে চিত্রশিল্পী ইন্দ্র ডুগার নামে বর্তমানে খ্যাতি লাভ করেছে। ডুগারের একটি ভৃত্য ছিল অমৃত নামে। সে প্রতিদিন সকালের দিকে ডুগারের জন্য একটি ঘটিতে করে দুধ নিয়ে আসত সঙ্গে তার একটি গ্লাসও থাকত। কলাভবনের উপরতলার বারান্দায় অমৃতের সাড়া পেলেই ডুগার বেরিয়ে আসতেন। তখন অমৃত ঘটিটিকে উঁচু করে ধরে গ্লাসে দুধটি ঢেলে আবার তেমনি করে গ্লাসের দুধ ঘটিতে ঢালত। কয়েকবার এই প্রক্রিয়ায় দুধে যখন যথেষ্ট ফেনার সৃষ্টি হত তখন সেটিকে গেলাসে ঢেলে কর্তাকে পান করতে দিত। দুধ পান করা হয়ে গেলে ডুগার পরিতৃপ্ত হয়ে জামার পকেট থেকে সূক্ষ্ম করে কাটা সুপারি বের করে মুখে দিতেন ও খুব শান্তভাবে সিগারেট বের করে ধূমপান করতেন। তারপরে নিজের আসনে এসে ছবি আঁকায় মগ্ন হতেন। এইভাবে কলাভবনে বছর তিন-চার মতো চিত্রাঙ্কনে তাঁর শিক্ষা চলেছিল কিন্তু হঠাৎ তাতে ছেদ পড়ল। তিনি কলাভবন ত্যাগ করে পৈতৃক বাড়ি জিয়াগঞ্জ ফিরে গেলেন। তারপর শান্তিনিকেতনে তাঁকে আর কখনও দেখিনি। শুনেছিলাম তাঁর পিতার পছন্দ ছিল না যে হীরাচাঁদ ছবি আঁকেন। পুত্রকে নির্দেশ দিয়েছিলেন জাপান থেকে রিক্‌শ আমদানি করে তার ব্যবসা করার জন্য। শিল্পীর কল্পনা, রসসৃষ্টি ও আনন্দের ওপরে যেন পাথর চাপা পড়ল। হীরাচাঁদের আর কোনো খবর নেই, শিল্পজগৎ থেকে যেন তাঁর নাম মুছেই গেল। এর পরে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়। ইতিমধ্যে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়ে আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করলেন। বয়স হয়ে গেল অনেক, তবু হীরাচাঁদের অন্তরে বাধাপ্রাপ্ত শিল্পী

হওয়ার আকাঙ্ক্ষার তখনও মৃত্যু হয়নি। এতদিন পরে আবার কাগজ, তুলি, রঙ নিয়ে প্রবল উৎসাহে ছবি আঁকায় মন দিলেন। দৃশ্যপট আঁকায় পূর্বেও তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন কাশ্মীরের অনেক ছবি এঁকে। শেষ বয়সেও দৃশ্যপট আঁকার জন্য মধ্যপ্রদেশ, জয়পুরে গিয়েছিলেন। একটি পাহাড়ের ওপরে উঠে সেখানকার সুন্দর দৃশ্য আঁকা শুরু করলেন। এ কাজের জন্য প্রতিদিনই শিল্পীকে পাহাড়ে ওঠানামা করতে হত। মনে অদম্য উৎসাহ থাকলেও দেহে দ্রুত পরিশ্রম করার ক্ষমতা ছিল না। একদিন হঠাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে হল। পরিণত বয়সে ছবি আঁকার যে সুযোগ আবার ফিরে পেয়েছিলেন শিল্পী তার সদ্‌ব্যবহার করতে পেরে তাঁর আত্মা নিশ্চয়ই পরিতৃপ্ত হয়েছিল।

ভাগলপুর থেকে কৃষ্ণকিঙ্কর ঘোষ কলাভবনে এসে যোগ দিয়েছিলেন। হঠাৎ দেখলে তাঁর বয়স ঠাহর করা একটু শক্ত হত। গৌর বর্ণ ও দীর্ঘদেহী বলা চলে। শ্মশ্রুবিহীন গোলপানা মুখে কচি কচি ভাবটা রয়ে গেছে। তারই সঙ্গে কথায়বার্তায় বেশ-একটু বিজ্ঞের পরিচয় মুখে মাখানো ছিল। তাঁকে আমরা কেষ্টবাবু বলে সম্বোধন করতাম। গান একটু-আধটু গাইতেন তবে বাঁয়া তবলা বাজাতে খুব ভালোবাসতেন। কলাভবনের নীচের তলায় সংগীতভবন। সেখানে আমরা তিন-চারজনে মিলে অর্গানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে যখন গান গাইতাম তখন কেষ্টবাবু সুস্থিরভাবে বাঁয়া তবলা নিয়ে শতরঞ্জি পাতা মেঝের ওপরে বসে সুরের তালে তালে ঠেকা দিয়ে যেতেন। এ বিদ্যায় তাঁর কতদূর দখল ছিল এ বিষয়ে আমাদের একটু সন্দেহ ছিল। ছবি আঁকতেন বেশ যত্ন করেই তবে আকারে খুব বড়ো করতেন না। তাঁর ছবির ব্যাখ্যা ভাষাতেই অনেকখানি ব্যক্ত করতেন। আমাদের সঙ্গে কথাবার্তায় চালচলনে এমন একটা ভাব দেখাতেন তাতে মনে হত তিনি আমাদের চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো। নন্দবাবু, অসিতবাবুকে আমরা দাদা বলে সম্বোধন করতে সাহস পেতাম না। কেষ্টবাবু কিন্তু বেশ সহজেই এঁদের নামের শেষে দাদা শব্দটি যুক্ত করে দিতেন। তাঁদের সঙ্গে হাস্যালাপ করতেও কোনো বাধা অনুভব করতেন না। তাঁর একবার মাথায় খেয়াল চাপল একটা আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা করবার। সেই স্কুলের অধ্যক্ষ হবেন তিনি নিজে এবং অন্যান্য অধ্যাপকদের পদে নন্দবাবু ও অন্য শিল্পীদের নিয়োগ করবেন। আন্তরিকতাসহ এই চিন্তা মনের মধ্যে পোষণ করে তৎকালীন বাংলার গভর্নরকে প্রায়ই পত্র লিখতেন আর্থিক সাহায্যের জন্য। ইংরেজ রাজত্বের সুনিয়মানুসারে সরকারিভাবে

পত্রপ্রাপ্তির স্বীকৃতি জানিয়ে আর্থিক সাহায্যের প্রার্থনার বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে এই মর্মে উত্তর দেওয়া হত। এ ধরনের উত্তরে কেষ্টবাবুর কল্পনা আরো স্ফীতি লাভ করত। বিষয়টি যখন একটু বাড়াবাড়ির পথে তখন কলাভবনের একজন অধ্যাপক ও তাঁর দু-একজন বন্ধু মিলে কৌশল করে একটা বড়ো খামে কেষ্টবাবুকে চিঠি পাঠালেন। চিঠিখানা যেন বাংলা গভর্নমেন্টের সি. আই. ডি. অফিস থেকে লেখা। টাইপ করা পত্রখানায় কেষ্টবাবুকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, "তুমি অযথা বাংলার গভর্নরকে কেন ক্রমাগত পত্র লিখে বিরক্ত করছ। এ বিষয়ে তোমার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা শীঘ্রই নেওয়া হবে।" কলাভবন তখন পুরোনো লাইব্রেরির ওপরতলায় ছিল। এ ঘটনাটি ঘটে সকালবেলায় বুধবারের মন্দিরের পরে। কেষ্টবাবু খুবই বিমর্ষ ও সন্ত্রস্ত হয়ে গেলেন। সুরেনবাবু ও গৌরদা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা কেষ্টবাবুকে অভয় দিয়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছিলেন, তাঁরা বললেন, "ভবিষ্যতে গভর্নরকে আর্ট স্কুলের প্রস্তাব দিয়ে আর কখনও পত্র লিখবে না।" কেষ্টবাবু স্বীকার করে বললেন, "আর কখনও লিখব না।"

শান্তিনিকেতনের আশেপাশে খোয়াইয়ের মধ্যে প্রস্তরীভূত প্রাচীন গাছের টুকরো টুকরো পাথর পাওয়া যায়। এইসব পাথর লোহারই মতো কঠিন। কেষ্টবাবু এই ধরনের একটি পাথর কুড়িয়ে এনে কলাভবনে লোহার ছেনি দিয়ে কাটতে শুরু করেন। নীচের তলায় শাস্ত্রীমশায় লেখাপড়া করেন। পাথরকাটার শব্দ তাঁর কাজের বড়ো ব্যাঘাত করতে লাগল। এ বিষয়ে নন্দবাবুকে জানালে তিনি কলাভবনের উত্তরে কিছু দূরে একটি বড়ো জাম গাছের ছায়ায় একটি খেজুর পাতার চাটাই মাটিতে পাতিয়ে কেষ্টবাবুকে বললেন, "দেখো কেষ্ট, উড়িষ্যাতে এক কালে এত বড়ো বড়ো পাথর কাটিয়ে শিল্পীরা জন্মেছে তারা সবাই বাইরের আবহাওয়াতে বসেই কাজ করেছে, তারা কখনও ঘরে বা স্টুডিয়োতে বসে কাজ করেনি। তুমি ঐ জাম গাছের নীচে গিয়ে আরাম করে বসে পাথর কাটার কাজ করো।" কেষ্টবাবু রাজি হয়ে পাথর, ছেনি ও একটি মাটির গামলাতে জল নিয়ে গাছের ছায়ায় বসে পাথর কাটা শুরু করেন। কলাভবনের উত্তরের জানালা দিয়ে আমরা দেখতাম তিনি নিবিষ্ট মনে খটাখট্ শব্দ করে দিনের পর দিন ধরে পাথর কেটেই চলেছেন। বেশ-কিছুদিন হয়ে গেলে একদিন নন্দবাবু উত্তরের জানালার ধারে এসে আমাকে বলছেন, "ধীরেন, কেষ্টর কাণ্ডখানা দেখছ? সে কি কোনোদিন ঐ পাথর কেটে কোনো মূর্তি গড়তে পারবে, ও পাথর তো লোহার থেকেও

কঠিন। ওটা হচ্ছে কি জানো যদুবংশধ্বংসকারী সেই প্রস্তর খণ্ড। ছোটোবেলায় ফুটবল খেলার সময়ে একবার কেষ্টবাবু মাথায় আঘাত পান। লেখাপড়ায় মাথার কাজ বেশি করতে হয় এই ভেবে তাঁর পিতা কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন, সেখানে মাথার কাজের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। নন্দবাবু একবার মন্তব্য করেছিলেন ছবি আঁকার কাজেই বেশি মাথার কাজের প্রয়োজন হয়। কেষ্টবাবুর পাথরের টুকরোটি তাঁর কল্পনামতো রূপ গ্রহণ করেছিল কিনা জানি না। তবে তিনি কলাভবন ত্যাগ করে চলে গেলেন। শিল্পজগতের সঙ্গে পরবর্তীকালে তাঁর বিশেষ আর সম্বন্ধ রইল না।

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ব্রহ্মবিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পূর্ণ না করেই কলাভবনে যোগদান করেছিল সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। লম্বা চওড়া মানুষটি নয়, গৌরবর্ণ এবং দেখতে সুশ্রী বলা চলে। চালচলনে স্থির, ধীর কারণ চোখ খারাপ থাকাতে অন্যদের মতো চটপট করে চলাফেরা করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুরসিক বিদ্যাচর্চার প্রতি ঝোঁক বরাবর ছিল। ফরাসি, ইংরেজি গল্প ও উপন্যাস এবং পরবর্তীকালে শিল্পবিষয়ে পুস্তকাদি পড়তে সর্বদা উৎসাহী ছিল। ভালো করে নিজের বক্তব্য শিল্পবিষয়েই হোক বা অন্য বিষয়েই হোক বলার ক্ষমতা ছিল। শিল্পশাস্ত্র, শিল্পবিষয়ে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতাও বিনোদের বেশ আছে। লেখক হিসেবেও সুখ্যাতি করেছে। চোখ তার এত খারাপ ছিল তার জন্য প্রথমে ছবি আঁকায় যেতে তাকে অনেকে বারণ করেছিল। কিন্তু ছবি সৃষ্টির আনন্দের আস্বাদ যে একবার পেয়েছে তার পক্ষে এই বারণ শোনা সব সময়ে সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। চোখের জন্য সব সময় সূক্ষ্ম কাজের ছবি আঁকা তার পক্ষে সম্ভব না হলেও ছবির সমগ্র ও বৃহত্তর ছন্দে রূপ সৃষ্টির কোনো অসুবিধে হত না। ছবির সুন্দর রঙ ও শেষোক্ত গুণগুলির অভাব না থাকায় তার সৃষ্ট চিত্রগুলি সার্থকতা লাভ করত। ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র আমরা দুজনেই প্রথমে কলাভবনে যোগদান করেছিলাম বলে আমাদের পরস্পরের মধ্যে খুব হৃদ্যতা ছিল। দুপুরের খাওয়ার পরেই কলাভবনে দুজনে চলে আসতাম। আমাদের ছবি আঁকার জায়গা ছিল পাশাপাশি দুটি জানলার ধারে। কাঠের দুটি ড্রইং বোর্ড নিয়ে জানালার গায়ে কাত করে ঠেসান দিয়ে তাতে মাথা রেখে দুজনে শুয়ে শুয়ে আর্ট, সাহিত্য, সংগীত ও এই নবীন বয়সে যে-সব মধুর স্বপ্ন মাথায় আসত তাদের বিষয়ে আলোচনা হত। গল্প করতে করতে কখনও দুজনে হেসেছি, আবার কখনও বা হাহুতাশ করেছি। জানলার বাইরে তখন রাস্তার ধারের সারিবদ্ধ আমলকী গাছগুলি নীরবে

হয়তো আমাদের লক্ষ্য করত। দুপুরের রোদে ক্লান্ত ঘুঘু পাখির ডাক মাঝে মাঝে শুনতে পেতাম। তারপরে ধীরে ধীরে অজান্তে কখন নিদ্রা এসে নীরব করে দিত দুজনকে। কিছুক্ষণ বাদে ঘুম থেকে জেগেই আবার রঙ তুলি নিয়ে ছবি আঁকা শুরু করতাম। ক্রমে ক্রমে কলাভবনের অন্য ছাত্রছাত্রী, শিল্পী অধ্যাপকগণ এসে উপস্থিত হতেন এবং বৈকালিক ক্লাস বা ছবি আঁকার কাজ চলতে থাকত। কলাভবনেই আমরা দুজনে বাসা বেঁধেছিলাম। সারাদিন তো ছবি আঁকায় এখানেই সময় কাটাতাম, বিকেলে একটু বেড়িয়ে সন্ধ্যায় আবার কলাভবনে এসে আর্টের বই নিয়ে নাড়াচাড়া করা, তারপরে রাত্রির আহারের জন্য রান্নাঘরে যাওয়া। আহারের শেষে আবার এখানে এসে বারান্দায় বিছানা পেতে শুয়ে শুয়ে ছবির কথা, শিল্পীদের কথা বলতাম। এ ভিন্ন মাথায় অন্য ভাবনার কোনো স্থান ছিল না। এমনি করেই নিজেদের শিল্পের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম। একে শিল্পসাধনা করা বলব কিনা জানি না।

এমনিতর একদিনের ঘটনার কথা মনে হলে এ বৃদ্ধ বয়সে এখনও হাসি পায়। কলাভবনের কয়েকজন ছাত্র—মাসোজী, ভি. আর. চিত্রা, রমেন চক্রবর্তী, বিনোদ ও আমি সাধারণ রান্নাঘরে খাওয়া ত্যাগ করে নিজেরা রান্না করে খাব বলে স্থির করলাম। নিচু বাংলোর ধারে খোড়ো চালার ছোটো একটি ঘরে প্রত্যেকে এক-একটি করে প্রাইমাস স্টোভ কিছুটা রান্নার বাসনপত্তর নিয়ে উপস্থিত হলাম। মাঝে মাঝে দল বেঁধে বোলপুর বাজারে গিয়ে চাল, ডাল, ঘি, আলু, পটল ও অন্যান্য দ্রব্যাদি কিনে আনতাম। একদিন রাত্রে আহারের পরে কলাভবনের বারান্দায় বিনোদ ও আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে আর্টের বিষয়ে গল্প করছি এমন সময় হঠাৎ আমি বিনোদকে জিজ্ঞেস করলাম, "এখন আলুর দাম কত?" এই উক্তির পরই খেয়াল হল এমন আর্টের আলোচনার মধ্যে এমন রসভঙ্গ, অশিল্পীজনোচিত প্রশ্ন। এই কথা ভেবে দুজনে বিছানায় গড়াগড়ি করে বহুক্ষণ হেসেছিলাম। তার পরে জানি না কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যেতেই অনুভব করলাম মাথার বালিশ ও বিছানার কিছু অংশ জলে ভিজে গেছে। বিনোদেরও সেই একই অবস্থা। বিছানা ত্যাগ করে লাফিয়ে উঠলাম এবং দেখলাম আমাদের দুজনের বিছানার মাঝামাঝি মাথার কাছে ছাদ থেকে বৃষ্টির জল পড়বার যে নলটি দেওয়াল ঘেঁষে বারান্দায় এসে নেমেছে তার ভিতর দিয়ে মধ্যরাত্রের বৃষ্টির জল পড়ে বিছানা ভিজিয়ে দিয়েছে। বিছানা দুটো পাশে সরিয়ে ঘরের ভেতরে মেঝেতে পাতা শতরঞ্জির ওপরে শুয়ে বাকি রাতটা কাটিয়ে দিলাম।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি নূতন বাড়ির মাঝের কোঠায় বিনোদ ও আমি বসবাস করি। মাঝে মাঝে আমরা দুজনে আউটডোর স্কেচ করতে খাতা পেন্সিল নিয়ে সকালেই বেরিয়ে পড়তাম। কলাভবনের ছাত্রদের ঘড়ি ঘণ্টা ধরে ছবি আঁকার কোনো ক্লাস ছিল না। তার কোনো প্রয়োজনও হত না, কারণ ছাত্ররা নিজেরাই ছবি আঁকার জন্য পাগল, তারা বৃথা সময় নষ্ট করত না। নন্দবাবু সেজন্য কলাভবনে উপস্থিত না হয়ে যদি বাইরে স্কেচ করতে ছাত্ররা যায় তাতে আপত্তি করতেন না। আমরা দুজনে রাঙা মাটির রাস্তা ধরে উত্তরে গোয়ালপাড়া গ্রামে চলেছি। সেখানে পৌঁছে গ্রামের মাটির ঘর, লোকজন, গোরুবাছুরের ও গাছপালার স্কেচ করতে করতে দুপুর হয়ে গেল। দ্বিপ্রহরের আহারের জন্য আবার এই রোদে শান্তিনিকেতনে যাওয়ার কোনো উৎসাহ ছিল না। অথচ পেটে দারুণ খিদে। পকেটে সামান্য কয়েকটি পয়সা ছিল তাই দিয়ে ছোটো একটি গ্রাম্য দোকান থেকে কিছু ছোলা ভাজা কিনে নিয়ে কোপাই নদীর দিকে চললাম। নদীর অপর পারে খোলা প্রান্তরে বিরাট একটি অশ্বত্থ গাছের তলায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। ধারে বড়ো গাছ না থাকলেও আশেপাশে ভাট ফুলের, বনফুলের ও আরো গুল্মজাতীয় গাছে পূর্ণ। মাথার ওপরে ঝিরঝিরে অশ্বত্থ গাছের পাতাগুলি হাওয়াতে দুলতে লাগল। দেখে মনে হল এই জনমানবহীন নির্জন প্রান্তরে দুজনকে সাথি পেয়ে তারা যেন ভারি খুশি। এই দুপুরে অগভীর স্বচ্ছ সুন্দর নদীর জল দেখে স্নান করবার ইচ্ছা দুজনেরই হল। সঙ্গে তো কোনো গামছা বা ভিন্ন কাপড় নেই, এখন স্নান করি কী উপায়ে? পরামর্শক্রমে ঠিক হল ধুতির বদলে গায়ের গেঞ্জি দিয়ে কোনোপ্রকারে গা ঢেকে নদীর জলে নামা যাবে। এইভাবে কোনো প্রকারে স্নানপর্ব শেষ করে পারে উঠে ধুতি পরে সামান্য কিছু ছোলাভাজা খেয়ে খিদে মেটানো গেল। গাছের ছায়ায় একটু বিশ্রাম করে বিকেলের দিকে আবার মাঠ, ঘাট, রাঙা রাস্তা বেয়ে আশ্রমের দিকে এগিয়ে চললাম।

আমার একটি ইক্-মিক্ কুকার ছিল। বিনোদ ও আমার দুজনের মতো চাল, ডাল ও কিছু তরকারি কুকারে চাপিয়ে নীচে কাঠকয়লার আগুন দিয়ে আমরা কলাভবনে ছবি আঁকার কাজে চলে যেতাম। দুপুরে খাবার ঘণ্টায় ঘরে এসে কুকার থেকে ভাত ডাল নামিয়ে ঘি সহ খেয়ে নিতাম। একদিন এমনিভাবে দুপুরে এসে দেখি আগুন কখন নিভে গেছে, চাল, ডাল যেমনটি চাপিয়ে গিয়েছিলাম তেমনি কাঁচা রয়ে গেছে। শত খিদে পেটে থাকলেও মনে কিন্তু কিছুমাত্র বিরক্তি বোধ করিনি। তখন আমরা জাপান দেশীয় হাইকু

কবিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আছি। কিছুদিন আগে গুরুদেব সন্ধ্যার পরে কলাভবনের হলঘরে জাপান দেশীয় হাইকু কবিদের কবিতা পড়ে শুনিয়েছিলেন। এই কবিদের কবিতাগুলি ছোটো ছোটো এবং জীবনের দৈনন্দিন ঘটনা ও বহিঃপ্রকৃতিকে অবলম্বন করে লেখা। জীবনের দুঃখ, দৈন্য, নানা প্রকার অঘটনার মধ্যেও আনন্দকে ও সুন্দরকে খুঁজে পাওয়া এই কবিদের আদর্শগত মতবাদ ছিল। 'তিনি যা করেন ভালোর জন্যই করেন' উক্ত কবিরা যেন এই মতেরই বিশ্বাসী। এদের চালচলন, ভাবনা অনেকটা বাংলাদেশের বাউলদের সমগোত্রীয় বলে মনে হয়। আমরা কয়েকজন কলাভবনের ছাত্র এই হাইকাই কবিদের জীবনধারাকে বড়ো সুন্দর করে দেখেছিলাম। তাই কুকারের ঘটনাটি আমাদের বিশেষ বিচলিত করতে পারেনি। কুকারে আবার নূতন করে আগুন দেওয়া হল এবং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের গানের ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথের সদলবলে একটা বনভোজনের প্রয়োজনে কেনা পাঁউরুটি জ্যাম ইত্যাদি আমার কাছে ছিল তার কিছু অংশ সঙ্গে নিয়ে স্কেচ খাতা পেন্সিলসহ দুপুর রোদে আশ্রম থেকে কিছু দূরে বিস্তৃত প্রান্তর অতিক্রম করে তালবনের দিকে বেড়াতে গেলাম। সেখানে সাঁওতাল ছেলেরা তাদের গোরু, ভেড়া, ছাগল মাঠে চরাচ্ছে। কেউ হাতের বাঁশের লাঠির উপর এক পা উঠিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, কেউ বাঁশি বাজাচ্ছে। হাইকু কবিদের মতোই সেদিন এ কথা ভেবে আনন্দ পেয়েছিলাম যে কুকারের কৃপাতেই এই দুপুরবেলায় এই সময়ে এই তালবনে এসে সাঁওতাল রাখাল ছেলেদের গোরু, ভেড়া, ছাগল দেখা, এদের স্কেচ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন, "সর্বক্ষণই সর্ব স্থানে কত ছবি আঁকা হয়ে যাচ্ছে, যাদের চোখ আছে তারা দেখে ধন্য হল, আর যারা দেখতে পেল না তারা বঞ্চিত হল।" তালবনে সেই বিচিত্র ছবি দেখার সুযোগ পেয়ে সত্যিই আমরা সেদিন ধন্য হয়েছিলাম।

নিজের সম্বন্ধে কিছু বলা বড়ো কঠিন কাজ, তার কারণ নিজেকে জানবার সাধনাই সারাজীবন ধরে মানুষকে করে যেতে হয়। আমার গুণের মধ্যে ছবি আঁকা ছাড়াও গান-বাজনার গলা ও হাত ছিল। বাজনার মধ্যে বাঁশি, এস্রাজ, সেতার, অর্গান, পিয়ানো, বেহালা, চেলো বাজাতাম। শান্তিনিকেতনে যত উৎসব, অভিনয় ইত্যাদিতে সংগীতের সঙ্গে এস্রাজ বাজানো, ৭ই পৌষের উৎসবে মন্দিরের উপাসনায় পাইপ অর্গান বাজানো, পরবর্তীকালে এস্রাজ বাজিয়ে সংগীতের দলে যোগ দিতাম। ১৯২০ কিংবা ২১ সনে জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা বাড়ির পিছনে বিরাট মণ্ডপ তৈরি করে কলকাতায় সর্বপ্রথম বর্ষামঙ্গল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। নির্মল সিদ্ধান্তের স্ত্রী ছোটো ঝুনু সেই উৎসবে

"বাদল মেঘে মাদল বাজে গুরু গুরু গগন মাঝে", গানটি তাঁর অপূর্ব কণ্ঠে গেয়ে সেদিন সকলকে মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন। সেই গানের সঙ্গে এস্রাজ বাজিয়েছিলাম। কলকাতা কর্পোরেশন বাড়িটার কাছে তখনকার দিনের সর্বশ্রেষ্ঠ ম্যাডান থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে একবার 'বিসর্জন' নাটকের অভিনয় ও অন্যবার বসন্তোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিখ্যাত গাইয়ে ও সুকণ্ঠী বড়ো ঝুনু (সাহানা দেবী) ও গুরুদেব কয়েকটি গান গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমাকে পিয়ানো ও এস্রাজ বাজাতে হয়েছিল।

কলাভবনে আমার ছবি আঁকার জায়গার একপাশে আমার এস্রাজ সর্বদা রাখা থাকত। আঁকার কাজের মাঝে মাঝে এস্রাজ নিয়ে গুরুদেবের শেখানো নূতন নূতন গান বাজাতাম। এতে শিল্পী ছাত্রগণ ও শিক্ষকেরা কেউই কখনো কাজের ব্যাঘাত হয় বলে আপত্তি করেনি বরং সকলেই বাজনা শুনতে ভালোবাসত। পরবর্তীকালে ইণ্ডিয়া হাউস, লন্ডনে দেওয়ালচিত্র আঁকার সুযোগ পেয়ে যখন কলাভবন ত্যাগ করে চলে যাই তখন নন্দবাবু তাঁর একটি পত্রে কলাভবনে আমার এস্রাজ বাজনার অভাবের কথা দুঃখ করে জানিয়েছিলেন। তাঁর পত্রের (শান্তিনিকেতন থেকে ২৩. ৩. ১৯২৫) কিছু অংশ এখানে উদ্‌ধৃত করে দেওয়া হল—

প্রিয় ধীরেন,...বাবলির পত্রে তুমি লিখেছ আমরা কলাভবনে সকলে কেজো হয়েছি, তাহা সত্য—এখন কাজটার হাড় পাঁজর বেরিয়ে পড়েছে। তোমরা নিজের আনন্দে সেটাকে ঢেকে রেখেছিলে। সকলেই বড়ো মনমরা হয়ে আছে, আমি যে গান বাজনা জানি না সেই দুঃখ। গান চিত্রকলার বড়ো সঙ্গী তা হাড়ে হাড়ে বুঝছি।...শাল বন কচি পাতায় ঢেউ তুলেছে তেজুবাবুকে নিয়ে শালবনে মাঝে মাঝে গিয়ে চুপটি করে বসে থাকি এবং তিনি বেহালা বাজান। কিন্তু তোমার এস্‌রাজ যে মন বড়ো মাতাত।...তোমারি শ্রীনন্দলাল বসু।

পরবর্তীকালে কলাভবন যখন পুরোনো লাইব্রেরির ওপরতলায় গেছে তখন রাত্রে শোবার আগে ছাদের ওপর বড়ো একটি এস্রাজ নিয়ে কত জোৎস্নায়, তারাখচিত অন্ধকার রাতে গুরুদেবের গান একটির পর একটি করে বাজিয়ে যেতাম। পাশে বিনোদ মাথা নিচু করে নিঃশব্দে বসে বসে বাজনা শুনত। সে ছিল আমার যথার্থ সমঝদার। রাত গভীর হয়ে যেত, সমস্ত আশ্রম নিদ্রামগ্ন, পাশের শালশ্রেণী নীরব, জানি না তারা সংগীত উপভোগ করতে জানে কিনা। এস্রাজ বাজানো হয়ে গেলে ছাদেই বিছানা পেতে দুজনে শুয়ে পড়তাম।

কলাভবন শুরু হবার কিছুকালের মধ্যে ক্রমে ক্রমে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে

লাগল। সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, ভি. আর. চিত্রা, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিনায়ক মাসোজী, পি. হরিহরণ, শ্রীমতী হাতীসিং, আরো অনেকে ছাত্রছাত্রীরূপে এই ভবনে ভর্তি হয়েছিল। অধ্যাপক ক্ষিতিমোহনবাবুর স্ত্রী কিরণবালা সেন, কৃতী ঠাকুরের স্ত্রী সবিতা দেবী ও রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের ছোটো বোন কাতু কলাভবনের আংশিক সময়ের জন্য ছাত্রীরূপে ছবি আঁকায় শিক্ষা গ্রহণ করতেন। তাঁরা সকলেই আশ্রমের পল্লীগুলিতে বাস করতেন। গুরুদেবের বিশেষ দৃষ্টি ছিল এই ভবনটির প্রতি। তিনি মাঝে মাঝে এসে কী কী নূতন ছবি আঁকা হচ্ছে দেখে যেতেন। অবিলম্বে কলাভবনে চিত্রাঙ্কনে এক অভূতপূর্ব ও অচিন্তনীয় পরিবেশ সৃষ্টি হল। অসিতবাবু, নন্দবাবু, সুরেনবাবু একের পর এক ছবি এঁকে চলেছেন। ছাত্ররাও গুরুদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছে। শিল্পী শিক্ষক বা ছাত্রদের মধ্যে কারো ভালো একটি ছবি আঁকা সম্পূর্ণ হয়ে গেলে তখন সেই ছবিটিকে বিশেষ নির্দিষ্ট সাজানোর স্থানে টাঙিয়ে তার সামনে ফুল রেখে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে সশ্রদ্ধভাবে সকলে মিলিত হয়ে ছবিটিকে রসজ্ঞের দৃষ্টিতে উপভোগ করা, তার ভালো মন্দ বিচার করা আমাদের পরম আনন্দের বিষয় ছিল। প্রদর্শনীতে দেওয়ার জন্য শিল্পী শিক্ষক ও ছাত্রদের আঁকা ছবিগুলির নাম ও মূল্য কলাভবনে দেওয়া হত না। কলকাতায় প্রতি ডিসেম্বর মাসে করপোরেশন রোডে সমবায় ম্যানসন বাড়িটিতে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টসের সর্বভারতীয় চিত্রকলার একটি প্রদর্শনী হত। কলাভবনের শিক্ষক ও ছাত্রদের আঁকা ছবিগুলি নিয়ে কলকাতায় শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথকে দেখিয়ে নাম ও মূল্য ঠিক হয়ে গেলে পরে সোসাইটিতে প্রদর্শনীর জন্য ছবি দেবার রীতি ছিল। ভোরবেলায় যখন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দিকে ছবিসহ অগ্রসর হতাম তখন নিকটে পৌঁছেই প্রথম নজরে আসত বাড়ির নীচতলায় বারান্দায় শয়নরত অতি পুষ্ট একটি ভেড়া ও উদরসর্বস্ব বলিষ্ঠ এক পশ্চিমী দারোয়ান। তারপরে দোতলায় যাবার সুন্দর কাঠের সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছালে মোহিত করা খাম্বিরা তামাকের খুশবু নাকে আসত। অবনীন্দ্রনাথদের প্রাসাদোপম বাড়িটি শিল্পসম্ভারে সুন্দরভাবে সাজানো ছিল। দোতলার বৈঠকখানা ঘরটি সুন্দর সুন্দর আসবাবপত্রে ও দেওয়ালের গায়ে ছোটো বড়ো আকারে বহু রঙিন চিত্রাদির দ্বারা সুসজ্জিত, দেখেই মার্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। অধিকাংশ চিত্র অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ ও নন্দলালের অঙ্কিত। ভালো ভালো প্রাচীন রাজপুত ও মুঘল চিত্রাদিও এই সংগ্রহে স্থান পেয়েছে। দোতলার প্রশস্ত

দক্ষিণের বারান্দায় পাশাপাশিভাবে তিনটি পৃথক ইজিচেয়ারে তিন ভাই গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ প্রত্যেকেই এক-একটি করে আলবোলা নিয়ে বসে তামাক খেতেন, ছবি আঁকতেন, গল্প করতেন। গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ যেমন মহান শিল্পী তেমনি মেজো ভাই সমরেন্দ্রনাথ ছবির সমঝদার। তিন ভাই-ই বড়ো মজলিশি ব্যক্তি ছিলেন। কলাভবনের শিক্ষক ও ছাত্রদের ছবি নিয়ে যখন দক্ষিণের বারান্দায় গিয়ে পৌঁছতাম তখন ছবিগুলি দেখবার জন্য কী আগ্রহই না তাঁদের তিন ভাইয়ের মধ্যে দেখেছি। কাড়াকাড়ি করে ছবিগুলি দেখতেন এবং তাদের নাম ও মূল্য দুই-ই তাঁরাই ঠিক করে দিতেন। ছবিগুলির দোষ গুণ বলে দিতেন কিন্তু তার সঙ্গে থাকত তাঁদের অকৃত্রিম ও গভীর দরদ ও মমতা। তাঁদের দেখা হয়ে গেলে ছবিগুলি নিয়ে সোসাইটিতে পৌঁছে দিয়ে আসতাম।

কুমারী ডক্টর স্টেলা ক্রামরিশ ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিল্পকলার থিয়োরিতে ডক্টরেট করে ১৯২০ সালে কলাভবনে আর্ট ক্রিটিসিজমের অধ্যাপকরূপে শান্তিনিকেতনে আসেন। দেহলী বাড়ির সংলগ্ন পশ্চিমে নতুন বাড়িতে মেয়ে বোর্ডিংয়ের কতগুলি ছাত্রী, মিনু (পরে মালতী চৌধুরী), মঞ্জু (সুরেন ঠাকুরের বড়ো মেয়ে), বাবলী (প্রশান্ত মহলানবিশের ছোটো বোন) বাস করত। ক্রামরিশ প্রথমে এসে এই ছাত্রীনিবাসেই উঠেছিলেন। তখন বয়স তাঁর খুবই কম কিন্তু উৎসাহী ও পরিশ্রমী ছিলেন। শিল্প বিষয়ে অধ্যাপনায় কলাভবনে তখন অতি অল্প সংখ্যক শিল্পবিষয়ে বই ছিল। সেগুলি নিয়েই তিনি তাঁর অধ্যাপনার কাজ আরম্ভ করেছিলেন। মাঝে মাঝে আমাদের বিলেতি ও দেশীয় চিত্রের ও ভাস্কর্যের নকল ছাপা ছবির পোস্টকার্ড দেখিয়ে কোনগুলি ভালো, তাদের কম্পোজিশনের প্রধান ছন্দটি কোথায় তা বুঝিয়ে দিতেন। তাঁর কাছেই প্রথম জানতে পেরেছিলাম ভালো ছবিকে সোজা অথবা ছবির নিচু দিকটা উপরে এনে কিংবা যে-কোনো পাশ থেকে দেখা চলে, কোনো অবস্থায়ই তার ছন্দপতন হবে না। এর পূর্বে ছবিকে এইভাবে বহু দিক দিয়ে বিশ্লেষণ করে বিচার করবার রীতি আমাদের কারোই জানা ছিল না। য়ুরোপীয় মডার্ন আর্টের যে আলোড়ন তাঁর কাছেই তার প্রথম পরিচয় আমরা পেয়েছিলাম। কলাভবনে শুধু চিত্রাঙ্কন হবে কিন্তু আর্টের থিয়োরির বিষয়ে শিল্পীদের কোনো স্থান থাকবে না এ বৈষম্যের কথাও নন্দবাবু তখন ভেবেছিলেন। আমাদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বি. এ. পাস করা ছাত্র, তাঁকেই নন্দবাবু রোজ সন্ধ্যায় ই. বি. হ্যাভেলের লিখিত ইণ্ডিয়ান আর্টের বই পড়ে ছাত্রদের

শোনাবার আদেশ দিলেন। কলাভবনের ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে যাতে আর্টের থিয়োরির চর্চা হয় তার সুযোগ সর্বদা করবার চেষ্টা হয়েছে। প্রথমের দিকে ডক্টর স্টেলা ক্রামরিশের আগমনে এ বিষয়ে খুবই সহায়তা হয়েছিল। তবে তিনি বেশি দিন কলাভবনে ছিলেন না, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্টের থিয়োরির শিক্ষকরূপে কার্যভার গ্রহণ করে সেখানে চলে গেলেন।

কলাভবনের প্রথম যুগে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে শিল্পরচনার প্রেরণা প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিল। তখন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে কলাভবনের ছাত্ররা শুধু চিত্রবিদ্যা আয়ত্ত করার কার্যে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলে চলবে না, এর সঙ্গে অর্থকরী বিদ্যাও প্রত্যেক ছাত্রকে শিক্ষা করতে হবে। তাঁর ইচ্ছানুসারে কারুশিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করা হল। তখনকার দিনে এই বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্র খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁতের কাজ, গালার কাজ এই ধরনের আরো কয়েকটি কারুশিল্প শিক্ষার আয়োজন করা হল। এ কার্যে প্রধান উদ্যোক্তা হলেন গুরুদেবের পুত্রবধূ শ্রদ্ধেয়া প্রতিমা দেবী, সঙ্গে রইলেন ফরাসি চিত্রশিল্পী মাদাম আঁদ্রে কার্পেলেস। কলাভবনের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা তখন জনা-পনেরোর মতো হবে। কেউ তাঁত, কেউ অন্য বিষয়ে শিক্ষালাভ করছে। বিনোদ ও আমি গালার কাজ শিখব বলে মনস্থ করলাম। গালার কাজের শিক্ষক ছিলেন শান্তিনিকেতন থেকে চৌদ্দ মাইল দূরে ইলামবাজারের লোক। গালার কাজের জন্য এক সময়ে ঐ অঞ্চলের বেশ খ্যাতি ছিল। শিক্ষকটি সরল গ্রাম্য লোক, তবে একটু রাগী স্বভাবের। এই কাজ শেখাতে শেখাতে হঠাৎ রেগে হয়তো অতি নিকট সম্বন্ধ সম্বোধন করে হেঁকে উঠতেন। আমরা দেখলাম এ তো বড় বিপদ, শিক্ষক আর ছাত্রের মধ্যে ব্যবহারে একেবারে ভদ্রতার বালাই নেই। একদিন নন্দলালবাবুর কাছে গিয়ে সব জানালাম। তিনি শুনে প্রথমে একটু চুপ করে রইলেন, শেষে বললেন, "দেখ, শিক্ষকের নিকট কোনো বিদ্যা লাভ করতে হলে সবই সইতে হয়। তোমাদের গালি দেয় আবার তার সঙ্গে বিদ্যাও তো দিচ্ছে।" তারপর থেকে আমরা ভিন্ন পথ নিয়েছিলাম। শিক্ষককে খুব তোয়াজ করতাম, তাতে ফলও ফলেছিল খুব ভালো। বুধবার বিদ্যালয়ের সাপ্তাহিক ছুটির দিন। মঙ্গলবার বিকেলে কারুশিল্পের সব ছাত্রদের প্রতিমা দেবী তাঁর উত্তরায়ণ বাড়িতে চা খাওয়াতেন। সাধারণত চা পান অর্থে আমরা যা বুঝি তার চেয়ে ভোজন একটু গুরুতর হত। সপ্তাহের অন্যান্য দিনের মধ্যে মঙ্গলবারে বিকেলবেলাটা আমাদের কাছে খুবই লোভনীয় ছিল। গুরুদেব মাঝে মাঝে এসে আমাদের কাজকর্ম দেখে যেতেন। অনেকদিন

ধরে এই কারুশিক্ষার ক্লাস বেশ ভালোভাবেই চলছিল, তারপর কী কারণে জানি না, ধীরে ধীরে উঠে গেল। গুরুদেব একবার এ সময়ে কলাভবনের শিল্পীদের নিয়ে বিলাতে শিল্পীগোষ্ঠীদের বসতি অঞ্চল "চেলশীর" অনুরূপ শান্তিনিকেতনের নিকটবর্তী স্থানে উপগ্রাম প্রতিষ্ঠার কথা ভেবেছিলেন। এ বিষয়ে গুরুদেব ও শিল্পীদের মধ্যে অনেক জল্পনাকল্পনা করা হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত কিন্তু সেই প্রকল্প বাস্তবে পরিণত হয়নি।

১৩২৬ অগ্রহায়ণে (১৯১৯ সালে) আগরতলা থেকে রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে ও ত্রিপুরা মহারাজের অনুমতিক্রমে নর্তক বুদ্ধিমন্ত সিং শান্তিনিকেতনে এলেন মণিপুরী নাচ শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে। আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে তখনও নাচের বিশেষ প্রচলন না থাকায় ছাত্ররা ও বিশ্বভারতীর কর্মীদের কেউ কেউ নৃত্যশিক্ষায় উৎসাহী হয়েছিলেন। দ্বারিক নামক গৃহের উপরতলার বারান্দাতে বিকেলের দিকে বুদ্ধিমন্ত সিং-এর নৃত্যের ক্লাস হত। শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রাক্তন ছাত্র গোবিন্দ চৌধুরী, সরোজরঞ্জন চৌধুরী, কলাভবনের ছাত্র মণি গুপ্ত, ধীরেন দেববর্মা ও আরো কয়েকজন ছাত্র এই নৃত্যের ক্লাসে যোগদান করেছিল। ছাত্রদের মোট সংখ্যা আট দশ জনের মতো হবে। তাঁরা সকলেই বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যবান ও পালোয়ানি চেহারার যুবক। নর্তক হবার উপযুক্ত সুঠাম দেহ তাঁদের মধ্যে কজনার ছিল বলা শক্ত। মণিপুরী মৃদঙ্গের তালে তালে করতালি দিয়ে পা নেড়ে একটু লম্ফঝম্ফ দিয়ে নৃত্য করত হত; তবে গানের সুরেরও প্রয়োজন হয় এই নৃত্যের সঙ্গে। গুরুদেবের একটি গান "আয় আয় রে পাগল ভুলবি রে চল্ আপনাকে, তোর একটুখানির আপনাকে" এই গানটি বুদ্ধিমন্ত সিং-এর বড়ো প্রিয় ছিল। তিনি এই গানটি গেয়ে গেয়ে সুরের ছন্দ নৃত্য করাতেন। তিনি 'ট' অক্ষরটি উচ্চারণ করতে বোধহয় পারতেন না তাই গানের মধ্যে 'তোর একটুখানির আপনাকে'র পরিবর্তে 'তোর একতুখানির' উচ্চারণ করতেন। বিকেলের দিকে প্রতিদিনের মতো ক্লাস চলেছে দ্বারিকের উপরের বারান্দায়; এমন সময় একদিন গুরুদেব এলেন ক্লাসের কাজ কেমন চলছে দেখতে। বেশ-কিছুক্ষণ ধরে দেখলেন নৃত্যের ক্লাসটি। অবশেষে বুদ্ধিমন্তকে বললেন, "এই বারান্দায় ক্লাসটি না করে অন্যত্র কোথাও ব্যবস্থা করতে হবে। তোমার ছাত্রদের যে-রকম পালোয়ানি চেহারা এবং যেভাবে লাফালাফি এরা করছে, এমনিভাবে আর কিছুদিন ক্লাস যদি চলে তবে বারান্দার মেঝে ভেঙে যাবে।" তিনি লক্ষ্য করেছেন মেঝের কয়েকটি স্থানে ফাটলের চিহ্ন। তারপরে ছাতিমতলার কাছে সমতল কিছু জমির ঘাস চেঁছে গোবর মাটি দিয়ে লেপে

নৃত্যের ক্লাসের স্থান করা হল। এখানেই বুদ্ধিমন্ত সিং অনেকদিন তাঁর নৃত্যের ক্লাস করেছিলেন। বুদ্ধিমন্ত সিং শুধু নৃত্যশিল্পী ছিলেন না, তিনি একজন সুদক্ষ কারুশিল্পী ও যন্ত্রবিদ ছিলেন। সুরুল বাড়িটি তখনও পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। লোকজন বিশেষ কেউ সেখানে বাস করত না। বুদ্ধিমন্ত সিং কিছুকালের জন্য এই সুরুল বাড়িতে বাস করেছিলেন। তিনি সেখানে বাঁশ, কাঠ সংগ্রহ করে নানা প্রকারের কারুদ্রব্যাদি তৈরি করেছিলেন। বিশ্বভারতীতে নৃত্যের সর্বপ্রথম সূচনা তিনিই করেছিলেন। প্রথমদিকে মেয়েরা বুদ্ধিমন্তের নির্দেশমতো তাঁর সঙ্গে পদক্ষেপ ও অঙ্গসঞ্চালনে স্বীকৃত হচ্ছিল না। বয়োবৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ অগ্রণী হয়ে বুদ্ধিমন্তের নির্দেশ অনুযায়ী অবলীলাক্রমে নৃত্য শুরু করেন। তখন মেয়েদের লজ্জা ভাঙে এবং তারা নৃত্য করতে ইচ্ছুক হয়।

দ্বারিকের উপরতলায় চলেছে চিত্রাঙ্কনের সাধনা, নীচের তলায় সংগীতভবন, সেখানে সংগীতের সুরে আবহাওয়া মুখরিত। গুরুদেব প্রায়ই এসে এই দুটি বিভাগের কাজ দেখে যেতেন এবং মনে মনে খুব তৃপ্তি বোধ করতেন। ১৯২১ সালে শীতকালে নন্দবাবু, অসিতবাবু, সুরেনবাবু মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র রাজ্যে বৌদ্ধযুগের বাঘগুহার দেওয়াল চিত্র নকল করতে চলে গেলেন। সেখান থেকে তাঁরা সর্বদা পোস্টকার্ডে ছবি এঁকে সংবাদাদিসহ চিঠি লিখতেন এবং তার মধ্যে দেওয়াল চিত্র অঙ্কন পদ্ধতির বিষয়ে উল্লেখ থাকত। তাঁদের চিঠির দ্বারা উৎসারিত হয়ে বিনোদ ও আমি যে গৃহে বাস করতাম (বর্তমান সন্তোষালয়, শিশু ছাত্রীনিবাস) তার দেওয়ালে মাটির রঙ ও ভাতের মাড় মিশিয়ে দুটি চিত্র এঁকেছিলাম। অর্ধেন্দুপ্রসাদ তাঁদের থাকবার ঘরের দেওয়ালে অজন্তা চিত্রের নকলে কতগুলি হরিণের ছবি এঁকেছিলেন। শান্তিনিকেতনে দেওয়াল চিত্র অঙ্কনের এটাই সর্বপ্রথম সূচনা। তার পরবর্তীকালে পুরোনো লাইব্রেরির বারান্দায়, চীনভবনে, হিন্দীভবনে ও আরো কয়েকটি পাকা বাড়ির দেওয়ালে নানা পদ্ধতিতে চিত্র আঁকা হয়। শান্তিনিকেতনে এখন যে-কোনো উৎসব বা অনুষ্ঠানে আলপনা দিয়ে স্থানটিকে শ্রীমণ্ডিত করা হয়ে থাকে। এই আলপনা প্রথম প্রবর্তন করেছিলেন কলাভবনের প্রাক্তন শিক্ষক ছাত্রী সুনয়নী দেবী। তিনি আমাদের সকলের কাছে মাসীমা রূপে পরিচিতা ছিলেন। কারণ বিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক কালীমোহন ঘোষের মাসীমা ছিলেন তিনি। কলাভবনের ছাত্রীদের আলপনায় শিক্ষা দিতেন এবং নিজে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করতেন। কলাভবনে বিকেলের ক্লাসে শিক্ষা করতেন ঠানদি কিরণবালা সেন, সবিতা ঠাকুর, কাতু ও আরো কয়েকজন মহিলা।

কলাভবন প্রতিষ্ঠিত হবার কয়েক বৎসর পরে একজন বোহেমিয়ান শিল্পী শান্তিনিকেতনে এসে কয়েক মাস ছিলেন এবং চিত্র অঙ্কনের কাজ করে গেছেন। শিল্পীটি চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে আসেন। তিনি কাঁচের শিটের উপরে তৈলচিত্র আঁকতেন। ছবির সব রঙের মধ্যে সবুজ রঙটির প্রাধান্য চোখে পড়ত। তিনি গুরুদেবের একটি প্রতিকৃতি (portrait) কাঁচের শিটের উপরে এঁকেছিলেন। ছবিটি সম্পূর্ণ হলে কলাভবনে নিয়ে এলেন এখানকার শিল্পীদের দেখাবার জন্য। দ্বারিকের দোতলার মাঝের হল-ঘরটিতে বড়ো শতরঞ্জি পাতা থাকত, তারই উপরে একটি ইজেল দাঁড় করিয়ে তাতে ছবিটি বসিয়ে দেওয়া হল। কলাভবনের অধ্যাপক ছাত্র ও ভৃত্যেরা যখন মধ্যাহ্নভোজনের জন্য কলাভবন থেকে চলে যান তখন ঘরের দরজা জানালাগুলি বন্ধ করার কোনো প্রয়োজন হত না। দুপুরের আহার সমাধা করেই যখন কলাভবনে চলে এলাম তখন দেখি দমকা হাওয়াতে শতরঞ্জির একপাশ উল্টে দিয়েছে, সঙ্গে ইজেলটি পড়ে গিয়ে গুরুদেবের প্রতিকৃতিটি ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে। এই অবস্থা দেখেই তাড়াতাড়ি দৌড়ে গেলাম গুরু নন্দলালের গুরুপল্লীর বাড়িতে এবং সমস্ত ঘটনা তাঁকে জানালাম। তিনি বললেন ভাঙা ছবিটিতে যেন কেউ হাত না দেয় এবং শীঘ্রই তিনি কলাভবনে যাচ্ছেন। একটু পরেই তিনি এলেন। একটি কাঠের বোর্ডের উপরে খুব যত্নসহকারে ছবির সমস্ত ভাঙা অংশগুলি পরপর বসিয়ে ছবিটিকে সাজালেন। রুপোর গুঁড়ো রঙ শিরিষ আঠার সঙ্গে মিশিয়ে তুলি দিয়ে ভাঙা অংশের ফাটলের মধ্যে সরু করে ভর্তি করে দিলেন। সরু রুপোর রেখাগুলি মিলে বেশ একটা নক্শার মতো দেখাচ্ছিল সমস্ত ছবিটার উপরে। শিল্পী তাঁর ছবিটির বিষয়ে সংবাদ পেয়েই ছুটে এলেন কলাভবনে। এসেই ছবির এই দুর্দশা দেখে প্রথমে থ মেরে চুপ করে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছবিটিকে দেখলেন, তারপরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "ছবিটি আমি নিয়ে যাচ্ছি, ওটাকে কবর দিতে হবে।" শিল্পীর অবস্থা দেখে আমাদের খুবই খারাপ লেগেছিল। মন্দিরের উত্তরে রাস্তার ধারে খোলা মাঠে খেজুর গাছের কাছে একটি ডোবা ছিল। শিল্পী তারই পাশের নরম মাটিতে গর্ত করে ভাঙা ছবিটিকে কবরস্থ করলেন। শিল্পাচার্য নন্দলাল বলেছিলেন, গুরুদেব এখনও বেঁচে আছেন, তাঁর প্রতিকৃতি কবর দেওয়া উচিত হবে না। কিন্তু শিল্পী এ কথায় কর্ণপাত করেননি।

শিল্পীর নাম ছিল নেভ্‌কভ্‌স্কি। তিনি শান্তিনিকেতন-নামক বড়ো বাড়িটির দোতলায় থাকতেন। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠেই যে ঢাকা বারান্দায় পৌঁছানো

যায়· তার উত্তরের দেওয়ালের বড়ো বড়ো জানালায় কাঁচ থাকায় শিল্পী তাঁর ইজেল পেতে এখানেই ছবি আঁকতেন। গ্রীষ্মকাল, ভয়ানক গরম পড়েছে। তাঁর পক্ষে এই গরম আবহাওয়া খুবই কষ্টকর। পেন্টুলুনের পরিবর্তে কোমরে একটি বড়ো তোয়ালে লুঙ্গির মতো জড়িয়ে পরতেন, গায়ে কোনো জামা নেই, একটি বড়ো তোয়ালে ভিজিয়ে টাকভরা মাথায় চাপিয়ে রেখে ছবি আঁকতেন। পাশের দেওয়ালে ইয়োরোপের একটি ম্যাপ পিন দিয়ে আটকানো থাকত। বোধহয় স্বদেশের জন্য মন কাতর হত। তিনি যে দেশ থেকে এসেছেন, ম্যাপে সেখানে ছোটো একটি কাগজের নিশান আলপিন দিয়ে আটকিয়ে রেখেছিলেন। মাঝে মাঝে স্বদেশের কথা মনে হলে ঐ জায়গাটি দেখতেন।

আরেকদিনের একটি মজার ঘটনার কথা মনে পড়ছে। সেদিন ছিল বুধবার। প্রাতে মন্দিরের উপাসনায় যথারীতি সকলে যোগদান করেছিলাম। শিল্পী নেভ্‌কভ্‌স্কিও উপাসনায় যোগদান করেছিলেন। উপাসনার শেষে সকলে যখন বাইরে রাস্তায় চলেছি তখন হঠাৎ শিল্পী অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে আমাদের এসে ধরলেন, বললেন, "ঐ মেয়েটিকে, যার চোখ ঠিক অজন্তার ছবির মতো, তাকে আমার এখানে নিয়ে এসো, আমি তার ছবি আঁকব।" শিল্পী মেয়েটির নাম বা কোনো পরিচয়ই দিতে পারলেন না। বড়োই বিপদ, কী করে সেই অজন্তা-চোখী মেয়েকে পাব। অনেক খোঁজখবর নেওয়ার পর বিশ্বভারতীর খ্যাতনামা অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের কন্যা, ডাকনাম লাবি (ভালো নাম মমতা) তাকে শিল্পীর কাছে উপস্থিত করানো হল। শিল্পী লাবিকে দেখেই মহা আনন্দিত, বললেন, "এই মেয়েটির চোখই অজন্তার মতো, চোখের কালোমণির নীচের সাদা অংশ খুবই খুবই বড়ো, চোখ দেখে মনে হয় সর্বদাই যেন স্বপ্ন দেখছে।" লাবি তখন অল্প বয়সের মেয়ে, সে তো ভয়েই অস্থির, কিছুতেই শিল্পীকে ছবি আঁকার জন্য সিটিং দেবে না। শেষ পর্যন্ত লাবির প্রতিকৃতি শিল্পীর আর আঁকা হল না। শান্তিনিকেতনে তিনি ১৯২৩ সালে এসেছিলেন, খুব বেশি দিন থাকেননি। তবে লক্ষ্য করেছি যে-কদিন এখানে ছিলেন, সর্বদাই ব্যস্ত থাকতেন ছবি আঁকার কাজে।

দ্বারিক গৃহের নীচের তলায় সংগীতভবনের ক্লাস হত। এই ভবনের অধ্যক্ষ ছিলেন ভারতীয় মার্গসংগীতে ওস্তাদ ও শাস্ত্রজ্ঞ ভীমরাও হসুরকর শাস্ত্রী। তিনি মহারাষ্ট্রীয় ছিলেন। বিষ্ণুপুরের নকুলেশ্বর গোস্বামী এস্রাজ ও সংগীতের ক্লাস নিতেন। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রসংগীত শেখাতেন। একমাত্র সংগীত নিয়ে যারা বিশ্বভারতীতে শিক্ষাগ্রহণ করছিল সে-সব ছাত্রদের মধ্যে ছিল অনাদি

দস্তিদার, শচীন কর ইত্যাদি—তারা উচ্চাঙ্গের হিন্দী গান ও রবীন্দ্রসংগীত উভয় বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করত। ১৯২৩ সালে গ্রীষ্মকালে সংগীতভবনের মাঝের হলঘরটিতে দুপুরবেলা দিনেন্দ্রনাথ আমাদের 'মায়ার খেলা'র গান শেখাতেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছিলেন অনাদি দস্তিদার, শচীন কর, তেজেশ সেন, ভীমরাও শাস্ত্রী, অসিতকুমার হালদার, অর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকিঙ্কর ঘোষ, ধীরেন দেববর্মা, গৌরগোপাল ঘোষ, সুরেন কর ইত্যাদি। এঁদের মধ্যে বয়সের তারতম্য হল আঠারো থেকে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে। যুবকই এঁদের সবাইকে বলা যায়, কেউ কেউ আবার সবেমাত্র "যৌবনসরসীর তীরে" পদার্পণ করেছেন। তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন অবিবাহিত। দিনুবাবু প্রতিদিন একটানা একটা বা দুটো করে 'মায়ার খেলা'র গান শেখাতেন। গানের প্রতিটি কথা, তার মর্মার্থ, তার সুর এই চিরকুমার সভার সভ্যদের মনে কী চাঞ্চল্যের আলোড়ন ও শিহরণ তখন এনেছিল সে কথা সহজেই অনুমেয়। শান্তিনিকেতনে গুরুদেবের অন্যান্য নাটক অনেকবার অভিনয় হয়েছে, 'মায়ার খেলা' কিন্তু একবার মাত্র হয়েছিল প্রতিমা ঠাকুরের পরিচালনায় আশ্রমের গৃহিণী ও বড়ো মেয়েদের নিয়ে। তবে অভিনয়ে দর্শক হয়ে পুরুষদের প্রবেশ একেবারে নিষেধ ছিল। রঙ্গমঞ্চসজ্জা কলাভবনে আমরা কয়েকজন ছাত্র মিলে করে দিয়েছিলাম, কিন্তু অভিনয় দেখার বেলায় আমরাও বাদ পড়েছিলাম।

চৈত্র মাসে সংক্রান্তিতে কঙ্কালীতলায় মেলা বসে প্রতি বৎসর। এই মেলা দেখতে বেলা এগারোটায় চলেছি সুরেন কর, গৌরগোপাল ঘোষের সঙ্গে সাইকেল চড়ে। চৈত্র মাসের প্রখর রোদের গরমে সর্বশরীর ঘর্মাক্ত হয় উঠেছে। মেলা খুব একটা বড়ো রকমের নয়। আশেপাশের গ্রামের লোক ও কঙ্কালীতলায় যারা পুজো দিতে আসে তারাই মেলায় ভিড় জমাত। মেলার পথে যাবার সময়ে তিনজনের মধ্যে বদ্রিনাথ ভ্রমণের কথা আলোচনা হয়। আশ্রমে ফিরে এসে 'মায়ার খেলা'র গানের শেষে পরস্পরের মধ্যে আলোচনায় ভ্রমণের কল্পনাটি বাস্তব রূপ নেবার পথে বেশ-কিছুদূর এগিয়ে গেল। কারা এই ভ্রমণে যোগ দেবে তাদের নাম লেখা হল। নন্দবাবুও এই ভ্রমণদলে সঙ্গী হবার মনস্থ করেও শেষ পর্যন্ত তাঁর আর যাওয়া হল না। ১৯২৩ সালের এপ্রিল মাসে সুরেন কর, গৌরগোপাল ঘোষ, তেজেশ সেন, মাসোজী, রমেন চক্রবর্তী ও ধীরেন দেববর্মা বদ্রিনাথ-ভ্রমণে কলকাতা থেকে রওনা হলেন।

কলাভবনের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে এমন কতগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল যা সাধারণত অন্যান্য আর্ট স্কুলগুলির পক্ষে পাওয়া সবসময় সম্ভব হয় না। চিত্রশিল্পী

নিজেরাই ভবনটির সম্পূর্ণ পরিচালক হওয়ায় এখানকার সব অবস্থা অন্যান্য আর্ট স্কুলে সরকারি কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রবর্তিত বিধিবিধানে আবদ্ধ পরিবেশের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। কলাভবনের নিয়মাদি রচিত হয় একমাত্র লক্ষ্য রেখে যাতে ছাত্রদের মনেপ্রাণে যথার্থ শিল্পী করা যায়। তাই নিরানন্দ বন্ধনের পরিবর্তে ছিল মুক্তি ও আনন্দ। শিল্পশিক্ষার উৎকর্ষ লাভ করতে হলে শুধু তার আইনের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকলে সবসময় উদ্দেশ্য সার্থকতা লাভ করে না। জীবনের বহু শিক্ষার অভিজ্ঞতা মূল শিক্ষার উদ্দেশ্যের পরিপূরক। জীবনের সাফল্যেও যে প্রধান রূপটি প্রকাশিত তার পিছনে বহুবিধ অভিজ্ঞতার প্রচ্ছন্ন অবদান সহায়করূপে থেকে যায়। গুরুদেবের গানের ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথ, তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু তেজেশবাবু, ভীমরাও শাস্ত্রী, অনাদি দস্তিদার, গৌরগোপাল ঘোষ, সুরেন কর, নন্দলালবাবু, আমরা কয়েকজন কলাভবনের ছাত্র মিলে একটি রসজ্ঞের দল সৃষ্টি হয়েছিল। দিনুবাবু ছিলেন এই দলের মধ্যমণি। প্রায়ই আশ্রমের আশেপাশে বা শ্রীনিকেতন যাবার পথে কালীবাড়ির পুকুরপাড়ে বনভোজনের আয়োজন করা হত। ভোজনের আয়োজন থাকত কিন্তু সেটা ছিল গৌণ, মুখ্য উদ্দেশ্য প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে গিয়ে আসর জমানো, গান গাওয়া, খোশমেজাজি গল্প ইত্যাদি করা। দিনুবাবু খুব মজলিশি লোক আর তাঁর ব্যক্তিত্বে ছিল অদ্ভুত আকর্ষণী ক্ষমতা। একটি দিনের ঘটনার কথা বলি—পুজোর ছুটিতে আশ্রম প্রায় ফাঁকা। দিনুবাবুর গুণমুগ্ধ গোষ্ঠীদের অনেকেই ছুটিতে আশ্রমে আছেন। বোধহয় ১৯২০ সালের কথা। তখনও আশ্রমের চারদিকে এত বাড়িঘরের ভিড় ছিল না। বড়ো রাস্তাতেও সর্বদা এত লোকের চলাফেরা চোখে পড়ত না। শরৎশ্রীর স্নিগ্ধতায় চারপাশের গাছপালায় উন্মুক্ত প্রান্তরে কেমন যেন ছুটির আমেজ এনে দিয়েছে। মন্দির ও তার উত্তরের বড়ো রাস্তার মাঝখানে জাম, শিরিষের কতগুলি বড়ো গাছের ছায়ায় দিনুবাবুর গুণমুগ্ধদের চড়ুইভাতির ব্যবস্থা হয়েছে। ছায়াতে বড়ো একটি শতরঞ্জি পাতা, সেখানে বসে আছেন দিনুবাবু, নন্দলালবাবু, সুরেন কর, গৌরগোপাল ঘোষ, অর্ধেন্দু, কৃষ্ণকিঙ্কর, ধীরেন দেববর্মা, অনাদি দস্তিদার ইত্যাদি। পাশের উনুনে কড়াইয়ে মাংস চাপিয়েছেন তেজেশবাবু। তিনি রন্ধনবিদ্যায় পারদর্শী। এস্রাজে রবীন্দ্রসংগীতের সুর বেজে উঠেছে, দিনেন্দ্রনাথের দরাজ কণ্ঠস্বরে "কমলবনের মধুপরাজি..." গানের কথাগুলি কানে ভেসে আসছে। তাস খেলায় কেউ কেউ ব্যস্ত, সারা সকালটি মধুময় হয়ে উঠেছে। খাকি রঙের হাফ প্যান্ট পরে খালি গায়ে তেজেশবাবু একটি হাতা দিয়ে

মাংসের কড়াই নাড়াচাড়া করছেন। মাংস সেদ্ধ হল কিনা দেখবার উদ্দেশ্যে লোহার হাতা দিয়ে এক টুকরো মাংস কড়াই থেকে যেই না উঠিয়েছেন অমনি তাঁর মুখ থেকে এক গুচ্ছের লালা কড়াইয়ের মধ্যে থপ করে পড়ে গেল। পাশে আমি দাঁড়িয়ে দেখছিলাম, কিন্তু এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় মুখ ফিরিয়ে 'সর্বনাশ হয়েছে' বলে উঠলাম। দিনুবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে?" উত্তরে বললাম, "আর বলবেন না, তেজেশবাবুর মুখ থেকে গুচ্ছের লালা মাংসের কড়াইয়ে পড়ে গেছে।" দিনুবাবু হাসতে হাসতে বললেন, "এবার দেখো ভালো মসলা যখন পড়েছে মাংস রান্নাটা কেমন ভালো হয়।" নির্বিচারে মাংস রান্না খেয়ে সেদিন তেজেশবাবুর প্রশংসা সকলেই করেছিলেন।

এক সময়ে নন্দলালবাবু শান্তিনিকেতনে গুরুপল্লীর পূর্ব প্রান্তে একটি মাটির দোতলা গৃহে বাস করতেন। বাড়িতে মূল্যবান আসবাবের আতিশয্য নেই, তবু সমস্ত বাড়িটি শিল্পীর সুরুচি ও সৌন্দর্যবোধের স্পর্শে শ্রীমণ্ডিত। গৃহের দক্ষিণ দিকের ছোটো বারান্দায় একটুকু স্থানকে কাঠ দিয়ে ঘিরে ছবি আঁকবার স্টুডিয়োতে পরিণত করা হয়েছিল। নন্দলালবাবু তাঁর বহু বিখ্যাত ছবি এখানেই এঁকেছিলেন। প্রতি বৎসর শ্রীপঞ্চমীর দিনে বিকেলবেলায় কলাভবনের ছাত্রদের চা-পানের নিমন্ত্রণ করে এই দক্ষিণের বারান্দায় বসাতেন। ছাত্রসংখ্যা তখন দশ-বারো জনের বেশি হবে না। সঙ্গে এস্রাজ নিয়ে তাঁর বাড়িতে যেতাম, গুরুদেবের রচিত বসন্তকালের উপযোগী গান গাওয়া হত। গুরু নন্দলাল অভিভূত ও আনন্দিত চিত্তে গান গাওয়া শুনতেন। সংগীত চলার মধ্যে এক সময়ে ছোটো ছোটো রেকাবিতে করে কিছু আম্রমুকুল, শাল ফুল, পলাশ ফুল প্রত্যেককে পরিবেশন করা হত। এগুলির সৌন্দর্য, সুগন্ধও এ বছরের বসন্ত ঋতুর আগমনবার্তা-বহনকারী বলে ফুলগুলিকে উপস্থিত সকল শিল্পীরা সমাদর করত। সব শেষে অবশ্য নানা প্রকার আহার্যে সকলকে পরিতৃপ্ত করার ব্যবস্থা থাকত। এইসব আয়োজনের দ্বারা ছাত্রদের মনে শিল্পী বলে আত্মবোধ জাগ্রত হোক, প্রকৃতির অভিব্যক্তিকে অন্তরে উপলব্ধি করুক গুরু নন্দলাল এটাই চেয়েছিলেন। সেই আনন্দপূর্ণ সন্ধ্যার স্মৃতিগুলি আজও মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে। কাজকর্মের মধ্যে জীবনটাকে এমনি সরসভাবে উপভোগ করবার প্রয়োজন আছে। জীবনযাপনের প্রয়োজনের তাগিদে ফসল ফলাবার যেমন প্রয়োজন আছে তেমনি আবার ফুলের সুন্দর বাগান করারও প্রয়োজন আছে। মানুষের মহত্ত্বের প্রকাশ সেইখানে যেখানে সে শুধু প্রয়োজনের দ্বারা আবদ্ধ ও তৃপ্ত নয়, কিন্তু তার মনের মহৎ অভিব্যক্তির দাবিকেও সে স্বীকার করেছে।

দেহলী সংলগ্ন নতুন বাড়িতে কিছুদিনের জন্য কলাভবনের ছাত্ররা বাস করেছিল। সেই সময়ে জাপান থেকে আগত একটি জাপানি যুবক বিশ্বভারতীতে কোনো একটি বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্য শান্তিনিকেতনে আসে। নতুন বাড়িতে কলাভবনের ছাত্রদের সঙ্গে জাপানি ছাত্রটির থাকার ব্যবস্থা হয়। তার নাম ছিল আঐয়াগী সান। সাত্ত্বিকভাবাপন্ন, এই রকম সৌম্য মূর্তি, বিনয়ী ও নম্র স্বভাবের লোক সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। ভারতীয় কোনো ভাষাই তার জানা ছিল না, ইংরেজি ভাষাও না জানারই সামিল ছিল। প্রতিদিন চলাফেরার প্রয়োজনে ভাষার চাইতে ইঙ্গিতে সব কাজ চালাত। কলাভবনের ছাত্রদের সঙ্গে তার বেশ ভাব হয়ে যায়। সে লক্ষ্য করল শান্তিনিকেতনে ছাত্রছাত্রীদের অধিকাংশ খালি পায়ে কাঁকরের রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করছে। অ্যানড্রুজ সাহেবও খালি পায়েই এখানে চলতেন। ছাত্র, অধ্যাপক সকলের বেশভূষা সাধারণত ধুতি পাঞ্জাবি, আঐয়াগী সান তাই বোলপুর বাজার থেকে বঙ্গলক্ষ্মী মিলের মোটা কোরা ধুতি ও লংক্লথের মোটা সাদা পাঞ্জাবি তৈরি করিয়ে পরতে লাগল, পায়েও কোনো জুতো নেই। শালতলা দিয়ে কাঁকরের রাস্তায় খালি পায়ে কত কষ্ট করে চলতে তাকে দেখেছি। ফর্সা রঙের পা দুটো লাল হয়ে উঠত। রান্নাঘরে মেঝেতে পাতা সিঁড়িতে বসে তখন আহার গ্রহণ করা হত। তার পাতে নুন, ভাত, তরকারি, গ্লাসে জল যারা পরিবেশন করে তাদের প্রত্যেককে সে হাত জোড় করে নমস্কার করত। মসলা, লঙ্কাসহ ভারতীয় রান্না খাবার খেয়ে সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। সঙ্গে এনেছিল বড়ো একটি কাঠের বাক্সে অনেক প্রকার ঔষধাদি। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল 'এত ওষুধ দিয়ে কী হবে?' উত্তরে সে জানাল ভারতে আসার পূর্বে শুনেছে ভারতীয় শহরগুলিতে বুনো হাতি, বাঘ, সাপ ঘুরে বেড়ায়; অধিকাংশ ভারতীয় ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত; ইত্যাদির জন্য তার সঙ্গে এত প্রকার ওষুধ দিয়েছে। লম্বায় বিঘত খানিক হবে নানা রঙের সরু সরু ধূপকাঠি সকাল সন্ধ্যায় সে পোড়াত। তার সুগন্ধে সমস্ত বাড়ি ও তার চারপাশ ভরে যেত। গুরুদেব কাছেই দেহলী বাড়িটায় থাকতেন, তিনি এই সুগন্ধ কোথা থেকে আসছে তার খোঁজ করলে আঐয়াগী সান কিছু ধূপকাঠি গুরুদেবকে উপহার দিয়েছিল। নতুন বাড়ির খোলা ছোটো প্রাঙ্গণে বাঁধানো একটি বেদী ছিল। সন্ধ্যায় ঠাণ্ডাতে বসে আমি প্রায়ই রবীন্দ্রসংগীত এস্রাজে বাজাতাম। আঐয়াগী সান পাশে চুপটি করে বসে এস্রাজ বাজনা শুনত, বলত—বড়ো ভালো লাগে, ইচ্ছা ছিল একটা এস্রাজ কিনে বাজাতে শেখে। মাঝে মাঝে সে জাপানি গান

গাইলে সেই সুরের সঙ্গে এস্রাজ বাজাতাম। বিদ্যালয়ের ছুটিতে ভারতের অন্যান্য স্থানে বেড়াতে কয়েকবার গিয়েছিল। শান্তিনিকেতনে বছরখানেকের মতো অবস্থানের পরে সে এই স্থান পরিত্যাগ করে চলে যায়। রান্নাঘরের আহার তার এখানে অবস্থানের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, প্রায়ই সে অসুস্থ হয়ে পড়ত। শুনতে পাই এই স্থান ত্যাগ করার পর সে ভারতের বৌদ্ধতীর্থ স্থানগুলি পরিদর্শন করে এবং শেষে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হয়ে যায়। শান্তিনিকেতনে আর কখনো আসেনি। পরে আমরা জানতে পারি জাপানের বিখ্যাত জাহাজ কোম্পানি "নিপান ইয়াশন কাইসার" ধনী মালিকের নিকট আত্মীয় ছিল আঐয়াগী সান।

আঐয়াগী সানের কয়েক বছর পরে কলাভবনে আরেকজন জাপানি যুবক এসেছিল ভারতীয় কাঠের আসবাবপত্রের নক্‌শা শিখবার উদ্দেশ্যে। জাপানে নাকি তাদের বড়ো রকম ফার্নিচারের ব্যবসা আছে। জাপানি যুবকটির নাম ছিল হাসেগাওয়া। দেখতে ছোটখাটো ধরনের মানুষটি। বুদ্ধিদীপ্ত ভাবসহ সর্বদা হাসিখুশিতে ভরা মুখটি জাপানি গান গেয়ে শোনাত, পাশ্চাত্য সংগীতও জানত। একদিন আমার এস্রাজের সঙ্গে সুর করে বিখ্যাত ব্লু ডানিয়ুব গান গেয়ে শুনিয়ে দিল। কুনু নামে জাপানি একজন কাঠমিস্ত্রি তখন শান্তিনিকেতনে ছিল। হাসেগাওয়া ও কুনুর মধ্যে বেশ সখ্য গড়ে ওঠে। তারা দুজনে বন্দুক নিয়ে গ্রামাঞ্চলের দিকে অথবা কোপাই নদীর ধারে শিকারের উদ্দেশ্যে যেত। হাসেগাওয়া প্রথম প্রথম কলাভবনে এসে ডেস্কের সামনে বসে কাগজ পেন্সিল নিয়ে আঁকাজোকা করত কিন্তু কিছুদিন বাদে কলাভবনের এলাকা আর মাড়াত না। পূর্ব বাংলার কোনো এক বন্ধুর সঙ্গে একবার ঢাকা ইত্যাদি স্থানে বেড়াতে যায়। সঙ্গে সাধারণ ধরনের একটি কোডাক ক্যামেরা ছিল। তা দিয়ে বেশ সুন্দর সুন্দর ছবি তুলে আনল। সেই একই ক্যামেরা দিয়ে গুরুদেবের সুন্দর একটি ছবি উঠিয়েছিল। তার তোলা ছবি দেখে সহজেই তার ছবি তোলার দক্ষতার কথা অনুমান করা যায়। কলাভবনের ছাত্র ভি. এস. মাসোজীর সঙ্গে হাসেগাওয়া একবার হিমালয়ে মানস সরোবর ভ্রমণে যায়। তখন সে হিমালয় ও মানস সরোবরের অনেক ভালো ভালো ছবি ক্যামেরায় ধরে রাখে। পরে জাপানে ফিরে গিয়ে জাপানি ভাষায় মানস সরোবর ও হিমালয় ভ্রমণ সম্বন্ধে একটি বই প্রকাশ করে এবং তার তোলা সুন্দর সুন্দর ছবি দিয়ে বইটির শোভা বর্ধন করে। আমি যখন ইউনাইটেড নেশনের পরিচালনায় শিল্পবিষয়ে সেমিনারে যোগ দেবার জন্য ১৯৫৪ সালে জাপানে যাই তখন টোকিয়ো

শহরে মাদাম কোরার সহায়তায় হাসেগাওয়ার সঙ্গে দেখা হয়। জাপানে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের ভক্তদের মধ্যে মাদাম কোরা একজন বিশিষ্ট ভদ্রমহিলা। তিনি আমাকে বলেছিলেন লাইকা ক্যামেরা দিয়ে যে কয়েকজন ছবি তুলে বিখ্যাত হয়েছেন হাসেগাওয়া তাঁদেরই মধ্যে একজন। জাপান গভর্নমেন্টের প্রামাণিক বা ডকুমেন্টারি অনেক ছবি নাকি তিনিই তুলেছেন।

বর্তমান বিনয়ভবন ও তার দক্ষিণে অতীতে এক সময়ে শাল, আম ইত্যাদির বনভূমি ছিল। কলাভবনের শিল্পী-অধ্যাপক ও ছাত্ররা প্রায়ই এই বনে বেড়াবার জন্য যেতেন। গাছপালার স্কেচও করতেন। শান্তিনিকেতনের কাছে বন বলতে এইটিই একমাত্র ছিল। বিকেলের দিকে একদিন ঐ শালবনে ঘুরে বেড়াচ্ছি তখন ফুলের অপূর্ব সুগন্ধ পেয়ে সেই ফুলের সন্ধানে ফিরছিলাম। হঠাৎ কিছু দূরে দেখতে পেলাম একটা মাঝারি উচ্চতার গাছে থোকা-থোকা সাদা রঙের নামহীন বনফুল ফুটে আছে। কাছে গিয়েই বুঝতে পারলাম এই ফুলের সুগন্ধই সমস্ত বনভূমিকে মোহিত করে রেখেছে। কিছু ফুল পেড়ে নিয়ে এলাম। প্রতি সন্ধ্যায় কোণার্ক বাড়িতে গুরুদেব তাঁর রচিত নূতন গান আমাদের শেখাতেন। সে সময় সেখানে থাকতেন দিনেন্দ্রনাথ, ভীমরাও শাস্ত্রী, অনাদি, আরো কয়েকজন গানের ছাত্র ও নন্দলালবাবু, ক্ষিতিমোহনবাবু ইত্যাদি। গান শেখানো হয়ে গেলে রাত্রের খাবার ঘণ্টার ধ্বনি শুনতে পেয়ে ছাত্ররা সকলেই চলে গেল। বাকি যাঁরা বসে রইলেন তাঁরা গুরুদেবের কথা শুনবার প্রত্যাশী। আমি শালবন থেকে আনা বনফুলটি আগেই গুরুদেবকে দিয়ে প্রণাম করেছি। তিনি ফুলটি হাতে নিয়ে বললেন, ভারি সুগন্ধ ফুলটি। কী নাম জানতে চাইলেন। বললাম, নাম তো জানি নে, বন থেকে সংগ্রহ করে এনেছি। উপস্থিত যাঁরা ছিলেন তাঁদের দিকে তাকিয়ে গুরুদেব জিজ্ঞেস করলেন, "এ ফুলটির কী নাম?" কেউ কিছু না বলায় ক্ষিতিমোহনবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি যদি নামটি জানেন, কিন্তু তিনিও বললেন, "জানি না।" তখন গুরুদেব হাতের ফুলটিকে নেড়েচেড়ে ভালো করে দেখে বললেন, "এর নাম 'বনপুলক' দেওয়া যাক।" সেদিন থেকে বনের নামহীন ফুলটি বনপুলক নাম পেল। এমনিভাবে শান্তিনিকেতনের অনেক ফুলের নামকরণ করেছেন গুরুদেব। হিমঝুরি, সোনাঝুরি, অগ্নিশিখা, এমনতরো আরো কয়েকটি ফুলের নাম করা যায়।

একবার নন্দবাবু ছাত্রদের একটি দলকে রাজস্থানে ভ্রমণে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই দলে তাঁর সঙ্গে ছিলেন সুরেন কর, মাসোজী, রমেনবাবু, আরো দু-চারজন ছাত্র ও আমি। সম্ভবত ১৯২২ সালের কথা, তখন রাজগৃহে এখনকার মতো

এত যাত্রীদের ভিড় হত না। আমরা মোট আট-নয় জন যাত্রী ছিলাম। সেখানে উঠেছিলাম একটি ধর্মশালায়। শীতের শেষ রাত্রের অন্ধকারে ঘাগরাপরা গ্রাম্য গোয়ালিনী মেয়ে এসে দুধ দিয়ে যেত। তার পরিষ্কার অবয়ব দেখা যেত না, শুধু একটি ঝাপসা ছায়ার মতো চোখে ধরা পড়ত, মনে হত প্রাচীন বৌদ্ধযুগের সুজাতা যেন এসে দাঁড়িয়েছে মাথায় দুধের ঘড়াটাকে নিয়ে। আমরা সকালের জলখাবার খেয়ে এবং সঙ্গে আরো কিছু খাবার নিয়ে সমস্ত দিনের মতো বেরিয়ে যেতাম। রাজগৃহের দর্শনীয় স্থানগুলি একের পর একটি করে দেখতাম, স্কেচ করতাম, আবার চলতাম, তারপর সন্ধ্যার কিছু পূর্বে ক্লান্ত দেহে গরম জলের উৎস ব্রহ্মকুণ্ডে গিয়ে উপস্থিত হতাম অবগাহনের জন্য। বেশ-কিছুক্ষণ ধরে গরম জলে স্নান করে সন্ধ্যায় ধর্মশালায় ফিরতাম। তখন রাজগৃহ ছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে নিভৃত একটি আদর্শ ভ্রমণের যোগ্য স্থান। পাড়াগাঁয়ের গোটাকতক মিষ্টির দোকান বাজারে বসেছে গরম জলের উৎসের ধারে। চারদিকে ধুলোবালি আর মাছির রাজ্য, পরিচ্ছন্নতার কোনো বালাই নেই। কিন্তু শিল্পীদের চোখে ঐ সরল ও অপরিচ্ছন্ন পরিবেশই সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছিল। রাত্রের আহার সমাধা হয়ে গেলে প্রতি রাত্রে নন্দবাবুর সঙ্গে আমরা ঐ বাজারে ঘুরে বেড়াতে যেতাম। চার দিকে রাত্রির অন্ধকার বিরাজ করছে, দোকানগুলির মধ্যে ক্ষীণ কেরোসিনের মলিন প্রদীপগুলি মিট্‌মিট্‌ করে জ্বলছে, অন্ধকার আর আলোয় মিশে অদ্ভুত রহস্যময় করে তুলেছে বাজারটিকে। নন্দবাবু আমাদের বললেন, হয়তো বা এমনি পরিবেশের মধ্যে বুদ্ধদেব কখনও কখনও ঘুরে বেড়াতেন। এই ভ্রমণ থেকে আশ্রমে ফিরে এসে আমরা প্রত্যেকেই রাজগৃহের অনেক ছবি এঁকেছিলাম। নন্দবাবু একটি ছবি এঁকেছিলেন রাজগৃহের বাজারের মাঝখান দিয়ে বুদ্ধদেব চলেছেন। একদিন এই ধুলিময় স্থান করুণার অবতার তথাগতের পাদস্পর্শে ধন্য হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই রাজগৃহে কলাভবনের শিক্ষা-ভ্রমণ দলে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন বছরে অনেকবার গিয়েছিল। ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং ভ্রমণকারীদের সংখ্যা অত্যধিক হওয়াতে ধর্মশালায় পূর্বের মতো আশ্রয় নেওয়া আর সম্ভব নয়। কলাভবনের ভ্রমণদলে কয়েকটি তাঁবু, রান্নার লোক, বাসন ইত্যাদি সঙ্গে থাকত এবং রাজগৃহের কোনো একটি নিভৃত স্থানে তাঁবু খাটিয়ে দিন-সাতেকের মতো থাকার সুন্দর ব্যবস্থা করা হত। পূর্বের মতো দর্শনীয় স্থানগুলি দেখা, স্কেচ করা, ব্রহ্মকুণ্ডের গরম জলে স্নান করা সব হয়ে গেলে সন্ধ্যার দিকে তাঁবুর ধারে উন্মুক্ত স্থানে আগুন জ্বালিয়ে সকলে মিলে চারধারে বসে গান,

বাজনা, কবিতা আবৃত্তি, অভিনয়াদি করা হয়। এইভাবে সমস্ত সন্ধ্যাটি আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠত।

কলাভবনের ওপরের হলঘরটিতে গুরুদেব প্রায়ই সন্ধ্যার দিকে এসে আশ্রমের শিক্ষক ও বড়ো ছাত্রদের কাছে নিজের লেখা নতুন কবিতা পাঠ করে কখনও বা ইংরেজি কবিতা পড়ে বাংলায় তার অনুবাদ করে শোনাতেন। বেশ-কিছুদিন ধরে 'গোরা' উপন্যাসটি পড়ে শুনিয়েছিলেন। তারপর জাপান দেশের এক শ্রেণীর কবিদের কবিতা পড়ে শোনালেন। কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য হল খুব সংক্ষিপ্ত ও বিশ্বপ্রকৃতির সর্বপ্রকাশে, সুখে দুঃখে সকল অবস্থাতেই আনন্দরূপের উপলব্ধি করা। এই কবিতাগুলি হাইক বা হাইকু নামে পরিচিত। বোহেমিয়ান ভাবাপন্ন বিচিত্র কবিদের জীবনদর্শন আমাদের কচি মনের উপর তখন খুবই প্রভাব বিস্তার করেছিল। তার প্রধান কারণ এই কবিতাগুলোয় গুরুদেবের বিশ্বপ্রকৃতির গভীর অনুভূতির সঙ্গে সামঞ্জস্য ছিল। গুরুদেব প্রতিদিনই প্রায় নূতন কবিতা, গান রচনা করছেন, কলাভবনে ভালো ভালো ছবি আঁকা হচ্ছে, সংগীতভবনে সংগীতসাধনায় শৈথিল্যের লেশমাত্র নেই, বিদ্যাভবনে গবেষণার কাজ খুবই উৎসাহজনকভাবে চলেছে। বিশ্বভারতীর সকল বিভাগের কর্মের মধ্যে গুরুদেবের আদর্শের প্রেরণা, উদ্দীপনা প্রবলরূপে দেখা দিয়েছিল। বিশ্বভারতীর আর্থিক অবস্থা তখন খুবই অসচ্ছল। অধ্যাপকদের বেতনও প্রতিমাসের প্রথম দিকে একসঙ্গে দেওয়া সম্ভব হত না। সমস্ত মাস ধরে তিন-চার কিস্তিতে সম্পূর্ণ টাকাটা দেওয়া হত। প্রত্যেক অধ্যাপকের কাছে একটি করে বেতন-গ্রহণের খাতা থাকত, সেটিকে অফিসে উপস্থিত করে তবে টাকা গ্রহণের রীতি ছিল। আজ সেইসব অধ্যাপকদের কথা মনে হলে দুঃখ বোধ হয়। তাঁরা কষ্টের মধ্যেও গুরুদেবকে, শান্তিনিকেতনকে কত গভীরভাবে ভালোবাসতেন। কখনও তাঁদের মুখে আর্থিক অসুবিধের বিষয়ে কোনোপ্রকার অনুযোগ শুনিনি।

মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে ১৯২০-২১ সালে ভারতের সর্বত্র সাড়া পড়ে গেছে। এই সময়ে মহাত্মাজি নাকি উক্তি করেছিলেন যে বর্তমানে ভারতে আর্টের কোনো প্রয়োজন নেই। আমরাও তখনই এই উক্তিটির বিষয়ে সংবাদ পেয়েছিলাম। মহাত্মাজি একবার সেই সময়ে ১৯২০ সালে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। গুরুদেব তখন শান্তিনিকেতনে ছিলেন না। উত্তরায়ণের পরিধির মধ্যে তখন বর্তমান কোণার্ক নামক বাড়িটির স্থানে একটিমাত্র খড়ের ছাউনিযুক্ত মাটির গৃহ ভিন্ন অন্য বাড়িঘর বিশেষ ছিল না। বাড়িটির পশ্চিম দিকের

সংলগ্ন খোলা জমির কিছু অংশে মাটি ঢেলে উঁচু করে তার তিন প্রান্তে কাঁটামনসা গাছ লাগানো হয়। এই গৃহে গুরুদেব কিছুকালের জন্য বাস করেছিলেন। এখানেই মহাত্মাজির থাকার ব্যবস্থা করা হয়।

কলাভবনের ছাত্রসংখ্যা তখন খুব বেশি নয়। একদিন বিকেলবেলায় নন্দবাবু আমাদের বললেন, "চলো মহাত্মাজির সঙ্গে দেখা করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জানব কেন তিনি বর্তমানে দেশে আর্টের প্রয়োজন নেই বলেছেন।" মহাত্মার দর্শনপ্রার্থী হয়ে কলাভবনের ছাত্র আমরা সকলে নন্দবাবুর সঙ্গে সেই মাটির ঘরে গিয়ে উপস্থিত। ঘরের মধ্যেকার কোঠায় ঢুকতেই চোখে পড়ল মেঝের ওপরে বড়ো একটি শতরঞ্চি পাতা, তার ওপরে বড়ো ও মোটা একটি তোশক পাতা এবং সেটি ধব্‌ধবে একটি সাদা খদ্দরের চাদরে ঢাকা। মহাত্মাজি তোশকের মাঝখানে উত্তরমুখী হয়ে বসে সামনে একটা বড়ো মাটিতে রাখা পায়েসের মতো কী একটা খাবার নিয়ে খাচ্ছিলেন। তাঁর পাশেই তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী কস্তুরাবাঈ বসে মহাত্মাজিকে দেখেশুনে খাওয়াচ্ছিলেন। ছাত্রসহ নন্দবাবুকে দেখে তিনি সহাস্যে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। আমরা সকলেই মহাত্মা ও তাঁর স্ত্রীকে প্রণাম করে শতরঞ্চির ওপরে বসে পড়লাম। কথাপ্রসঙ্গে নন্দবাবু তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "শুনতে পাই আপনি নাকি বলেছেন বর্তমান ভারতে আর্টের কোনো প্রয়োজন নেই, আপনি এই কথার দ্বারা কী বোঝাতে চেয়েছেন?" তিনি কোনো কথা না বলে ধীরে ধীরে তাঁর বাম পাশের উন্মুক্ত জানালার ভিতর দিয়ে খোলা প্রান্তরের পশ্চিম দিগন্তে অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভায় রঙিন আকাশের দিকে কিছুক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলেন। তারপরে সেখান থেকে চোখ ফিরিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, "দেখ, আমি যদি এখানে বসে এমন সুন্দর সূর্যাস্ত দেখতে পাই তবে সূর্যাস্তের একখানা ছবি এঁকে ঘরের দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখার কি কোনো প্রয়োজন আছে?" যদিও এই প্রশ্নের উত্তরে শিল্পী হিসেবে অনেক কথা বলা যেত, নন্দবাবু কিন্তু তাঁর সঙ্গে কোনোপ্রকার তর্কাদি করেননি, সামান্যভাবে কিছু আলোচনা করেন। পরবর্তীকালে মহাত্মা হয়তো তাঁর এই উক্তির মধ্যে কোনোপ্রকার অযৌক্তিকতা উপলব্ধি করেছিলেন যার জন্য বিশেষ করে নন্দবাবুকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন যখন লক্ষ্ণৌতে হয় তখন তার অধিবেশন-মঞ্চ, তোরণ ইত্যাদিতে শৈল্পিক সৌন্দর্যের নিপুণ স্পর্শে রূপসজ্জা করে দেবার জন্য। তারপর থেকে পর পর কয়েক বছর ধরে কংগ্রেসের প্রত্যেক অধিবেশনে রূপসজ্জার দায়িত্ব নন্দলাল ও তাঁর ছাত্রদের উপর অর্পণ করা হত।

একবার কলাভবনের আমরা পাঁচজন ছাত্র মিলে স্থির করি নিজেরা রান্না করে খাব। নিচু বাংলার ধারে ছোটো একটি খোড়োচালার ঘর ছিল। আমরা প্রত্যেকে এক-একটি প্রাইমাস স্টোভ ও রান্নার কিছু বাসনপত্র নিয়ে সেই ঘরটি দখল করি। এই দলে ছিল মাসোজী, ভি. আর. চিত্রা, রমেন চক্রবর্তী, বিনোদ মুখার্জি ও আমি। প্রথম প্রথম খুবই উৎসাহ করে ভালো খাবার খেতে চেষ্টা করতাম। মনের মধ্যে একটা ভাব ছিল, রান্নাঘরের খাওয়া ছেড়েছি তার চাইতে ভালো খাবার খাব বলে। সকলেরই বয়স অল্প, রান্নার বিষয়ে বিদ্যার দৌড়ের কথা না বলাই ভালো, কিন্তু উৎসাহের প্রাবল্য সীমাহীন। ছেলেমানুষিরও একটা সীমা আছে। কিছুকাল বাদেই রান্নার উৎসাহে যেন ভাঁটা পড়েছে, তার লক্ষণ দেখা দিতে লাগল। রাতে ভাত খাওয়ার পরিবর্তে রান্না সংক্ষিপ্ত করার জন্য সুজির মোহনভোগ খাওয়া চলতে লাগল। মাঝে মাঝে হাতে গড়া আটার রুটিও তৈরি করতাম। রুটি গড়ার প্রয়োজনে চাকী-বেলনার কোনো বালাই ছিল না। অ্যালুমিনিয়ামের থালা উল্টে তারই উপরে আটার লেছি রেখে স্পিরিটের বোতলকে বেলনার কাজে লাগিয়ে রুটি বেলা হত। বেলা রুটির আকার প্রায়ই গোল না হয়ে ভারতবর্ষের মানচিত্রের আকারে তিন কোণা হয়ে যেত। লক্ষ্য করতাম আমাদের মধ্যে একমাত্র মাসোজী রুটি বেলায় দক্ষ। সে ঠিক গোলাকার রুটি বেলতে পারত। কিছুকালের মধ্যে আমরা উপলব্ধি করলাম রান্না করাতে কত ক্ষমতা ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়। নন্দবাবু বোধহয় আমাদের চেহারার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। একদিন আমাদের বললেন, "তোমরা রোগা হয়ে যাচ্ছ কেন?" কী খাই ইত্যাদি প্রশ্ন করে যখন জানতে পারলেন রাতে মোহনভোগে ভোগকার্য সমাধা করা হয়, তখন তিনি বললেন, "ছবি আঁকায় দেহে শক্তির প্রয়োজন হয়, যাও, রান্নাঘরে গিয়ে আবার যোগ দাও।" গুরুর আদেশে রান্না করার পর্বের এখানেই সমাপ্তি হল।

৭ই পৌষ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপনকালে তিন দিন ধরে এখানে মেলা বসে। আমরা কয়েকজন কলাভবনের ছাত্র একবার মনস্থ করলাম সাদা পোস্টকার্ডে ছবি এঁকে বিক্রির জন্য মেলাতে একটি স্টল দেব। কলাভবনের উত্তরের ঘরে বসে কয়েকজন মিলে ৭ই পৌষের দিন-সাতেক আগে কার্ডে ছবি আঁকছি। তাই না দেখে নন্দবাবু অসিতবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'এগুলি দিয়ে কী হবে।' বিক্রির জন্য মেলাতে স্টল দেবার কথা জেনে ছাত্রদের সঙ্গে অতি উৎসাহে সুরেন কর-সহ তাঁরাও কার্ডে ছবি আঁকার

কাজে লেগে গেলেন। সকলে জটলা করে আঁকার কাজে ব্যস্ততারই মাঝে মাঝে হাসি-তামাশারও কোনো অভাব হত না যখনই এক-একটি মজার ছবি আঁকা হত। এমনিভাবে দিনকয়েক ধরে খুব আনন্দের মধ্যে অনেকগুলি কার্ড আঁকা হল। ৭ই পৌষের মেলাতে যখন স্টলে ছবিগুলি সাজানো হল, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সব ছবি উজাড় হয়ে গেল। তখনকার ছবি-কার্ডগুলি খুবই যত্ন করে আঁকা হত, তাই তার চাহিদা ছিল খুব। তারপর থেকে মেলায় ছবি-কার্ডের স্টল দেওয়া কলাভবন ছাত্রদের মধ্যে একটা চলতি প্রথা হয়ে দাঁড়াল। কয়েক বছর পরে ছবি-কার্ড কলাভবনে বসে আঁকায় যেন তেমন আনন্দ আর পাওয়া যাচ্ছে না—তাই গোয়ালপাড়া যাবার রাস্তার ধারের খোয়াইয়ের মধ্যে গিয়ে মেলার দিন সাত-আট আগে তাঁবু খাটানো হত। বিছানা ইত্যাদি বয়ে নিয়ে তাঁবুর মধ্যেই আস্তানা গাড়া হত, আশ্রমমুখো আর নয়, রান্নাঘর থেকে দু-একজন ছাত্র সকলের খাবার বয়ে নিয়ে আসত। রাত দিন বসে সেই তাঁবুতেই, সূর্য উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত সারাক্ষণ চলত কার্ড আঁকা। হাটের দিন রাস্তা ধরে চলেছে গোরুর গাড়ির সারি, মাথায় পিঠে হাটের পশরা বয়ে চলেছে গ্রামের লোকেরা, হাটের শেষে ফিরতি গোরু গাড়িতে মেয়ে পুরুষ জটলা করে বসে থাকে। পুবে রেল লাইনের ওধার থেকে সারি সারি তালগাছের ডগায় লাল সূর্য ওঠে, এমনিভাবে তাঁবুর চারপাশে বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র রূপ প্রকাশ ৭ই পৌষের মেলা-কার্ডে শিল্পীরা তাদের তুলি দিয়ে ধরে দিত।

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ১৯২২ সালের প্রথম দিকে শান্তিনিকেতনে বেড়াতে আসেন। অবনবাবু কলাভবন দেখতে এসে খুব আগ্রহসহকারে আমাদের সকলের কাজ দেখলেন। আম্রকুঞ্জে কারমাইকেল বেদীতে গুরুদেব সকল আশ্রমবাসীর উপস্থিতিতে অবনবাবুকে সংবর্ধনা জানালেন। সেই সংবর্ধনায় অবনবাবু একটি অতি মর্মস্পর্শী ভাষণ দিয়েছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় সেটি কোথাও লিপিবদ্ধ হয়নি। কলাভবনের পুরাতন ছাত্র বা শিক্ষকদের মধ্যে যাঁরা ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন তাদের কেউ কেউ হয়তো বা সেই ভাষণের কিছু কিছু যুক্তি এখনও মনে রেখেছেন। তিনি বলেছিলেন, একদিন স্বপ্ন দেখলেন একটি উঁচু পাহাড়ের গা বেয়ে রাস্তা চলে গেছে। সেই রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছেন, পিছনে চলেছেন তাঁর ছাত্রের দল—নন্দলাল, অসিতকুমার, ভেঙ্কটাপ্পা ও আরো অন্যেরা। তার পর যেই না পাহাড়ের একটি বাঁক পার হলেন পিছন ফিরে দেখেন ছাত্রের দল তাঁকে কেউ আর অনুসরণ করছে না। শিল্পের

নামে একাই এগোতে হবে, একাই চলতে হবে। তাঁর ভাষণের শেষের দিকে তাঁর ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বললেন, "আমার গুরুদক্ষিণা কোথায়? আমি তোমাদের কাছ হতে কোনো মূল্যবান সম্পদ অথবা কোনোপ্রকার অর্থ চাই না, কিন্তু আমি চাই একটি সামান্য জিনিস, সেটি হচ্ছে একটি পুতুল যার নক্‌শা তোমরা করবে। সেই পুতুল দেশের শিশুদের কচি কচি হাতে আমি তুলে দিতে পারি, যা দিয়ে খেলা করে ঐ শিশুরা আনন্দিত হবে।" জানি না তাঁর শিষ্যবৃন্দ কখনও গুরুর ঋণ পরিশোধ করেছিলেন কিনা।

অসিতকুমার ১৯২৩ সালে বন্ধু উইলি পিয়ার্সনের সঙ্গে ইংল্যান্ডে যান। সেখানে থাকাকালে ছয় মাস ফ্রান্স ও ইটালি পরিদর্শন করেন। দেশে ফিরে এসে কলাভবনের সঙ্গে তাঁর সংস্রব ছিন্ন হয়। তারপরে জয়পুর রাজকীয় কলানিকেতনের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করেন ১৯২৪ সালে। লক্ষ্ণৌ সরকারি চারুকারু বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন ১৯২৫ সালে।

চীন গভর্নমেন্টের আমন্ত্রণে গুরুদেব ১৯২৪ সালে চীন দেশ ভ্রমণে যান, এই সুযোগে জাপান দেশেও যাবেন বলে মনস্থ করেন। তাঁর সঙ্গে চলেছেন ক্ষিতিমোহনবাবু, নন্দবাবু, কালিদাস নাগ ও এলম্‌হার্স্ট সাহেব। চীন দেশে খুব খাতির ও সম্মান পেয়েছিলেন। সেই দেশে ক্রেসেন্টমুন সোসাইটির আয়োজনে পিকিং শহরে ৮ মে ১৯২৪ সালে গুরুদেবের জন্মোৎসব পালিত হল এবং এই উৎসব সভায় তাঁকে চু-চান-তান্‌ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এই উপাধির অর্থ ভারতের মেঘমন্দ্রিত প্রভাব। চীনসম্রাট গুরুদেবকে মূল্যবান হলুদ রঙের সিল্কের জোব্বা ধরনের একটি পোশাক উপহার দিয়েছিলেন। চীনসম্রাজ্ঞীর কাছ থেকে তাঁর সামান্য ব্যবহৃত একটি মূল্যবান নীল রঙের পাথরের (লেপিসলাজুলি) ঢেলা নন্দবাবু উপহারস্বরূপ পেয়েছিলেন। গুরুদেব এই ভ্রমণকালে কতগুলি মূল্যবান চীনা ও জাপানি চিত্র উপহার পেয়েছিলেন সেগুলি কলাভবনের সংগ্রহে রাখা আছে। যে সময়ে গুরুদেব চীনভ্রমণে গিয়েছিলেন তখন সে দেশের রাষ্ট্রীয় জীবনে বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। তার কয়েক বছর পরেই চীন সম্রাট দেশ থেকে বিতাড়িত হন। চীনদেশ ভ্রমণ শেষে সদলবলে গুরুদেব জাপানে গমন করেন। জাপানিদের মধ্যে গুরুদেবের গুণগ্রাহীর সংখ্যা ছিল অনেক। বিশেষ করে শিল্পীমহলে অনেকেই ছিলেন যাঁরা ভারতে এসে ঠাকুরবাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। ভারতের কৃষ্টির সঙ্গে তাঁদের গভীর পরিচয় ছিল। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী টাইকোয়ান, আরাইসান, হিসিদা সেইসব ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন। নন্দবাবু জাপান থেকে

ফিরে এসে সেইসব শিল্পীদের বিষয়ে অনেক গল্প করেছিলেন। জাপানি শিল্পীদের সঙ্গে গুরুদেব এবং অবনীন্দ্রনাথের যোগাযোগ থাকায় আধুনিক ভারতীয় চিত্রশিল্প-বিবর্তন ইতিহাসের গোড়ার দিকে জাপানি শিল্পের সামান্য প্রভাব লক্ষিত হয়। শিল্পীদ্বয় টাইকোয়ান ও সামামোরা খানজানের বড়ো কয়েকটি চিত্রের নকল গুরুদেবকে জাপান থেকে উপহার দেওয়া হয়। এই চিত্রগুলি কলাভবনের সংগ্রহের বিশেষ সম্পদ। মূল্যবান জাপানি বাদ্যযন্ত্র ক্যত, বাঁশি, ডমরু, গং, কাঠের মুখোশ ইত্যাদি সংগ্রহ করে জাপান থেকে আনা হয়। গুরুদেব তাঁর সঙ্গীসহ চীন, জাপান ভ্রমণ শেষ করে শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন করেন ২২ জুলাই ১৯২৪ সালে। কলাভবন তখন পুরাতন লাইব্রেরির উপরতলায় উঠে এসেছে। একদিন সন্ধ্যায় কলাভবনে একটি সভা হল, গুরুদেব চীনসম্রাট প্রদত্ত হলুদ রঙের পোশাকটি পরে সেই সভায় উপস্থিত হন। সভায় চীন, জাপান ভ্রমণের অভিজ্ঞতার বর্ণনা গুরুদেব করেছিলেন। সবশেষে সভাতে চীনা ও জাপানি কাঠের মুখোশগুলি পরে নন্দবাবু ও কলাভবনের ছাত্রদল আমরা অভিনয় করেছিলাম। সভাভঙ্গ হয়ে গেলে মুখোশগুলি পরেই মাঠ পেরিয়ে অন্ধকারের মধ্যে চুপিচুপি সুরপুরী দিনুবাবুর বাড়িতে যাওয়া হল। সেখানে গিয়ে অন্ধকারে আড়ালে উঁকিঝুঁকি মেরে দিনুবাবুকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছিল।

শুরুতে কলাভবন ছিল দ্বারিক বাড়িটায় আশ্রমের পূর্ব প্রান্তে। পরে তার যাত্রার গতি পশ্চিম দিকে চলতে থাকে। দ্বারিক ত্যাগ করে পশ্চিমের দিকে কিছু দূরে সন্তোষালয় নামক একটি বাড়িতে সাময়িকভাবে কলাভবন স্থানান্তরিত হয়। কলাভবনের প্রারম্ভকালে এই গৃহেতে এই ভবনের প্রথম যুগের ছাত্ররা এক সময়ে বাস করেছিল। পরবর্তীকালে এখানে পাঠভবনের শিশুছাত্ররা বাস করে এবং বর্তমানে ছোটো ছোটো ছাত্রীরা বাস করছে। গৃহের অভ্যন্তরে দেওয়ালে নন্দলালবাবু তাঁর ছাত্রদের নিয়ে দেওয়ালচিত্র আঁকেন। বিনোদ দক্ষিণের বারান্দায় দেওয়ালে চিত্র এঁকেছিল। এইখানেই প্রথমে সুসীম চা-চক্রের উদ্‌বোধন হয় উপরের খোলা বারান্দায়। দিনেন্দ্রনাথ ছিলেন চা-চক্রের মধ্যমণি। এই উপলক্ষে গুরুদেব সুন্দর একটি গান রচনা করেছিলেন এবং চা-চক্রের উদ্‌বোধনের দিনে সেটি গাওয়া হয়। গুরুদেব যখন চীনভ্রমণে যান তখন সুসীম নামক একটি চীনা যুবক তাঁর সঙ্গে সর্বদা থাকতেন এবং নানা বিষয়ে সহায়তা করেছিলেন। তিনি চীনদেশীয় চা তৈরির কিছু সাজসরঞ্জাম গুরুদেবকে উপহার দিয়েছিলেন। সুসীম চা-চক্রের শুরুতে এইসব বাসনপত্রাদি

ব্যবহৃত হয়েছিল। পরে খেলার ঘর বেণুকুঞ্জের দক্ষিণে দিনান্তিকা ছোটো বাড়িটিতে চা-চক্রটি স্থানান্তরিত হয়। সুসীম চা-চক্রের উদ্‌বোধন উপলক্ষে যে গানটি লেখা হয়েছিল তার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্‌ধৃত করা হল—

হায় হায় হায় দিন চলি যায়।
চা-স্পৃহ চঞ্চল চাতক দল চলো চলো চলোহে॥
টগবগ-উচ্ছল কাথলিতল-জল কল কল হে।
এল চীনগগন হতে পূর্বপবনস্রোতে শ্যামলরসধরপুঞ্জ॥

কলাভবন এখন অনেক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। অনেক নিয়মকানুনের দ্বারা বাঁধা, নির্ধারিত শিক্ষার ধারা প্রবর্তন, পাঠক্রম ও শিক্ষার সময় নিরূপণ করা হয়েছে। শিক্ষা সম্পূর্ণ হলে ডিপ্লোমা, ডিগ্রি প্রদানেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। কলাভবনের প্রথম যুগে এ-সব কিছুই ছিল না, শুধু ছিল অফুরন্ত প্রেরণা আর উদ্দীপনা। শিক্ষক, ছাত্র সকলেই ভাবতেন তাঁরা শিল্পী, এই মূলমন্ত্রই তাঁদের সকল শিক্ষায় প্রেরণা জোগাত। নন্দলাল শুধু মহান শিল্পী নন, তিনি একজন মহান শিক্ষকও। যথার্থ শিক্ষক হওয়ার সকল গুণই তাঁর মধ্যে ছিল। ছাত্রদের ড্রইং শুধু তিনি সংশোধন করতেন না, সে ড্রইং বা ছবিটিকে উন্নত রূপ দান করতেন। তাঁর সংস্পর্শ ছাত্রদের শিল্পক্ষেত্রে মানসিক উন্নতি, প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ, উদার চরিত্র লাভের সহায়তা করত। নন্দলালের মধ্যে একত্রে ছাত্রেরা পেয়েছিল শিক্ষাগুরু, দরদী সঙ্গী ও বন্ধু, মমতাপূর্ণ আত্মীয়। তাঁর মতো গুরু পাওয়া ছাত্রদের পক্ষে খুবই সৌভাগ্যের বিষয়। ছাত্রদের ছবি কেবল সংশোধন করে নয়, নিজে ছবি এঁকে তবে শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন শিক্ষক তাঁর নিজের সৃষ্টির কাজ হতে যেন বিরত না হয়। প্রতিদিন শিল্পী তাঁর শিল্পসৃষ্টির দ্বারা যেমন আনন্দ লাভ করবেন, তেমনি প্রতিদিনই নূতন নূতন করণ-কৌশল আয়ত্তও করবেন। ছাত্রদের সঙ্গে নিজেও স্কেচ করবার জন্য বাইরে বেরুতেন। কোপাই নদীর পাড়ে বনভোজনের ব্যবস্থা, ছুটির দিনে গোরুর গাড়ি চড়ে দূর দূরান্তরে শিক্ষাভ্রমণে যাওয়া—এইসব আয়োজনের মধ্যে একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল শিল্প। সকলেরই ভাব দেখে মনে হয় যেন শিল্পরসে তন্ময় হয়ে আছে। গুরুদেবের সংগীত, কাব্য, তাঁর ভাষণ, কলাভবনের প্রতি তাঁর দরদ আমাদের সকলের শিল্পীমনা হবার, ভাবুক হবার প্রেরণার উৎসস্থল ছিল। কলাভবনে রবীন্দ্রনাথের ও নন্দলালের মণিকাঞ্চন যোগ হয়েছিল। এই সৌভাগ্যলাভের সুযোগ অন্য কোনো শিল্প-প্রতিষ্ঠানের হতে পারে না। এখানে চিত্র অঙ্কনের সঙ্গে সংগীতেরও সংযোগ

বিশ্বভারতীর এই বাড়িতে একসময় থেকেছেন ধীরেনকৃষ্ণ। পরে
এই বাড়িতেই ছিলেন স্বনামধন্যা কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়
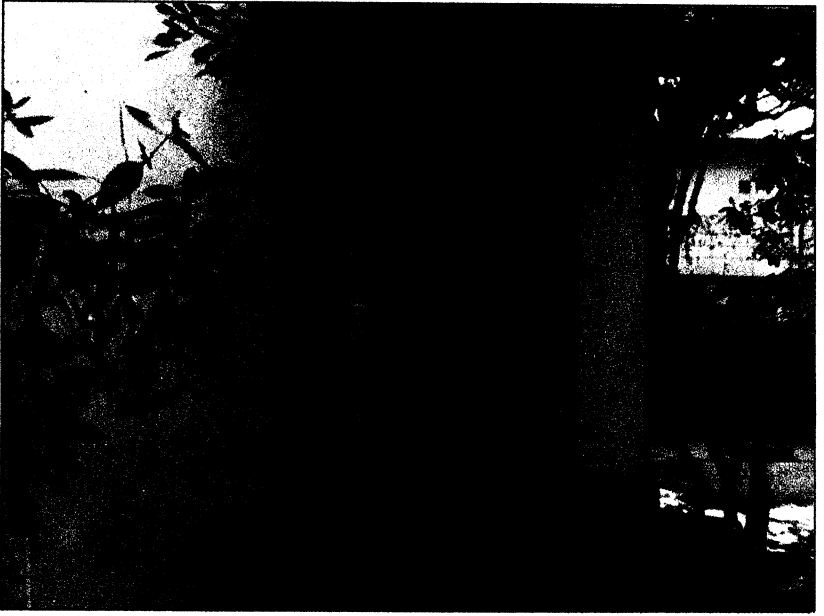
অবনপল্লীর নিজস্ব বাসগৃহে শিল্পীর স্টুডিও
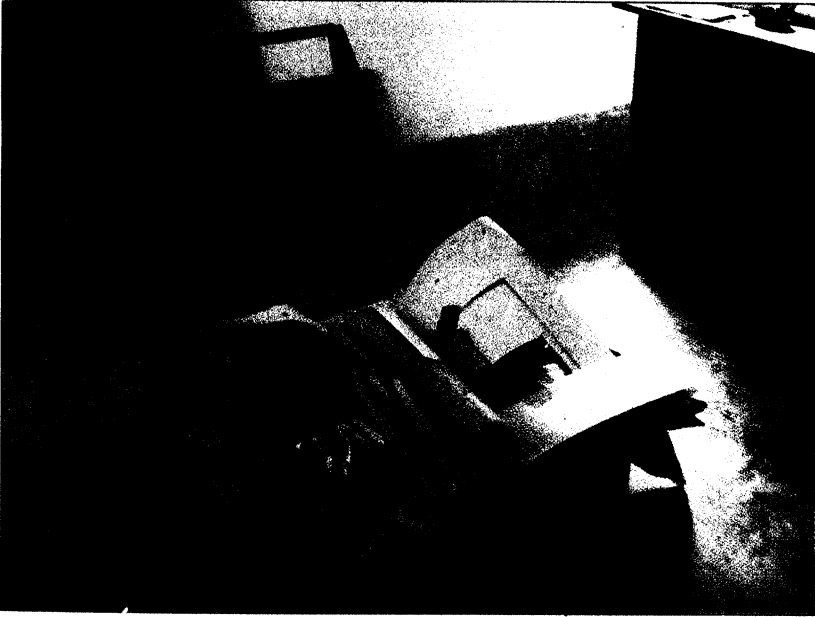
দীর্ঘকাল স্পর্শহীন পড়ে রয়েছে স্টুডিওর অভ্যন্তরে
চিত্রাঙ্কনের আসবাব

শিল্পীর প্রিয় বইপত্র, অবনপল্লীর বাড়িতে
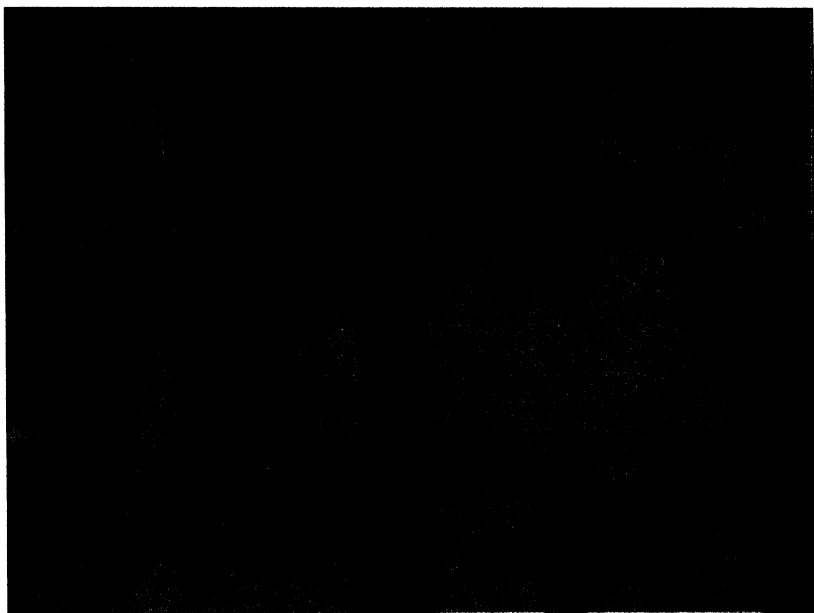
ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মন ও সরযূ দেবী

সাতানব্বুই বছরের প্রবীণা সরযূ দেবী, এখনও
মাঝে মাঝে যিনি অতীত রোমন্থন করে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন।
সঙ্গে লেখক

আলাপচারিতায় মগ্ন, শিল্পীর জ্যেষ্ঠপুত্র, রামকিঙ্করের একাধিক
বড় কাজের সঙ্গী প্রণবকৃষ্ণ দেববর্মন

DHIRENDRAKRISHNA DEB BARMAN RETROSPECTIVE EXHIBITION

'কলারত্ন' উপাধিলাভ। দাতা
অল ইণ্ডিয়া ফাইন আর্টস অ্যান্ড ক্র্যাফট্‌স্ সোসাইটি

Dear Connoisseur

Gallery Dhirendra Krishna
Presents
Paintings and drawing
of
Bimal Kar
from November 28 to December 4
1995
Mr. Amiyamukul De
Eminent Rabindra sangeet exponent
has kindly consented to inaugurate
the exhibition
on November 28, 1995 at 6 p.m.
Mr. Bimal Chowdhury, noted
literateur, will grace the occasion as
the Chief Guest
Please join the inaugural ceremony
With Compliments

Samiran Roy
on behalf of
Gallery Dhirendrakrishna
Jagannath Bari Road.

শহর আগরতলায় 'গ্যালারি ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ'। প্রদর্শনীর আমন্ত্রণপত্র

ছিল। ছবি আঁকার আসনেই আমার এস্রাজ ও বাঁশি থাকত। ছবি আঁকছি, তারই মাঝে মাঝে এস্রাজের বাজনাও চলত। সংগীতভবনের একটি ছাত্র বামন ক্ষীরোদকার তার বীণাযন্ত্রটি নিয়ে কলাভবনেই বসত। গান হত, বাজনা চলত, সমস্ত আবহাওয়া যেন সুরের মূর্ছনায় ভরপুর হয়ে আছে। যখনই শুনতেন যে কারো ভালো একটি ছবি আঁকা হয়েছে গুরুদেব কলাভবনে আসতেন। ছবি দেখে তাঁর মতামত প্রকাশ করতেন। ছবির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেয়ে আমরা যেন বেঁচে গিয়েছিলাম।

বাগ গুহাচিত্র নকল করার কাজ সমাপ্ত করে নন্দবাবু ওঁরা আশ্রমে ফিরে এলেন ১৯২২ সালে। সে বছর গ্রীষ্মের ছুটির পর বাড়ি থেকে আশ্রমে ফিরে এসে দেখি পুরাতন লাইব্রেরির পশ্চিমাংশের একটি গৃহের চারপাশের দেওয়ালে নন্দবাবু ছবি এঁকে রেখেছেন। তাঁর তুলির স্পর্শে সমস্ত দেওয়াল জুড়ে পদ্মের, পদ্ম পাতার, বক, মাছ ইত্যাদির ছবিতে শ্রীমণ্ডিত। তার পরে ১৯২৯ সালে দেওয়ালচিত্র অঙ্কনে প্রবল উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। জয়পুর থেকে একজন জয়পুরি দেওয়ালচিত্র অঙ্কনে পটু শিল্পী এলেন যাঁর সহায়তায় নন্দবাবু ও তাঁর কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে পুরাতন লাইব্রেরির বারান্দার দেওয়ালে অনেকগুলি ছবি আঁকলেন। পরবর্তীকালে ভিন্ন পদ্ধতিতে কলাভবনের নন্দন নামক গৃহের দেওয়ালে, চীনভবনে নন্দবাবু ও তাঁর ছাত্রের দল অনেক ছবি আঁকেন। বিনোদ কলাভবনের ছাত্রাবাসে ও হিন্দীভবনের দেওয়ালে সাধুসন্তদের ছবি এঁকে শ্রীমণ্ডিত করে। কলাভবনের ইতিহাসে দেওয়ালচিত্র অঙ্কনের যেন একটি ঢেউ এসেছিল। এখন নানা কারণে সেটি ম্লান হয়ে গেছে।

কলাভবনে প্রথমের দিকে নন্দবাবু ও আমি মাঝে মাঝে মাটি দিয়ে ছোটো ছোটো কিছু মূর্তি গড়েছিলাম, তবে ভাস্কর্য শিক্ষা প্রবর্তনের কোনো কল্পনা তখন দেখা দেয়নি, যদিও এ বিষয়ে উৎসাহের কোনো অভাব ছিল না। এতদিন পর্যন্ত চিত্রাঙ্কনই প্রাধান্য লাভ করে আছে। কলাভবন প্রারম্ভের অনেক পরে উল্লেখযোগ্যভাবে ভাস্কর্যের কাজ প্রবর্তিত হয়। নন্দবাবুর এ বিষয়ে উৎসাহ থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত ছাত্রের অভাব ছিল ভাস্কর্যশিক্ষায়। রামকিঙ্কর ছবি আঁকায় শিক্ষা লাভ করলেও মাটি দিয়ে মূর্তি গড়ার কাজে ধীরে ধীরে আগ্রহ দেখাতে লাগল নন্দবাবুর দ্বারা উৎসাহিত হয়ে। রামকিঙ্করের একাগ্রতায় ও দক্ষতায় ধীরে ধীরে কলাভবন-ছাত্রদের ভাস্কর্যশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা হল এবং বর্তমানে চিত্রাঙ্কনের মতোই ভাস্কর্যশিক্ষা দানের মান উচ্চ ও প্রশংসিত।

গুরুদেব তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে সঙ্গে নিয়ে ১৯৩০

সালে বিলাতে গমন করেন। সেখানে কেন্‌সিংটন অঞ্চলে এক বাঙালি ভদ্রলোকের মালিকানায় পরিচালিত রেজিনা হোটেলে বাস করতে লাগলেন। ইণ্ডিয়া হাউস দেওয়ালচিত্র আঁকা সংক্রান্তে আমি তখন বিলাতে ছিলাম। রোজই সন্ধ্যার দিকে সেই হোটেলে গিয়ে গুরুদেব ও রথীবাবুদের সঙ্গে দেখা করতাম। তখন লক্ষ্য করেছিলাম রথীবাবু তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও লন্ডন শহরের একটি স্টুডিয়োতে গিয়ে আর্টিষ্টিক চামড়ার কাজ শিক্ষা করতেন এবং হোটেলে অবসর সময়ে বসে বসে সুন্দর সুন্দর চামড়ার ব্যাগ, চিঠি লেখার সাজসরঞ্জাম-ধারণ থলি ইত্যাদি তৈরি করতেন। দেশে ফিরে এসে চামড়ার অনেক কাজ করেছিলেন। বহু ছাত্রছাত্রীকে এই কারুশিল্পটি শিখিয়ে দেন। আজ দেশের সর্বত্র চামড়ার কাজের প্রবর্তন দেখা যায়, সুন্দর সুন্দর কাজের নমুনা চোখে পড়ে, এই সাফল্যের কৃতিত্ব ও প্রশংসা রথীন্দ্রনাথের প্রাপ্য। কলাভবনের শিল্পীরা এই চর্মশিল্পে যথেষ্ট উন্নতি করেছেন। কাপড়ের ওপর মোম দিয়ে নক্‌শা করে রঙ করাকে বাটিক কাজ বলা হয়। এই শিল্পেও যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করছেন কলাভবনের শিল্পীরা। সুন্দর সুন্দর নক্‌শার বাটিক কাপড় তৈরি করা হয় এখানে। তবে জাভা দেশীয় মূল বাটিক কাপড়ের তুলনায় এগুলি একটু ভিন্ন রকমের। কারুশিল্প শিক্ষা দানের চেষ্টা কলাভবনে হয়েছিল এ বিষয়ে পূর্বে উল্লেখ করেছি। তখন উপযুক্ত শিক্ষকের খুবই অভাব ছিল, বর্তমানে কিন্তু সে অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে। কলাভবনের শিক্ষণীয় বিষয়তালিকায় কারুশিল্প শিক্ষা বিশেষ একটি স্থান অধিকার করে আছে। একদিন গুরুদেব এই শিক্ষার কথা ভেবেছিলেন, তখন সাফল্য লাভ করেনি বহুপ্রকার অসুবিধার কারণে, আজ কিন্তু শিল্পশিক্ষার ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল ও উৎসাহজনক। এই ভবন প্রতিষ্ঠার কাল থেকে আজ পর্যন্ত অর্ধ শতাব্দী অতিক্রম করেছে, এই সময়ের মধ্যে শিল্পশিক্ষার প্রতিষ্ঠানরূপে তার কার্যের উৎকর্ষের দ্বারা যে সুনামের অধিকারী হয়েছে তার পিছনে রয়েছে গুরুদেবের উপদেশ, তাঁর উৎসাহ, তাঁর সাহিত্য, সংগীত, তাঁর জীবনদর্শন আর রয়েছে নন্দলালবাবু ও তাঁর কৃতী ছাত্রশিল্পীদের অক্লান্ত শিল্পরচনার আনন্দ।

চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১)

রবীন্দ্রজীবনসূর্য যখন পশ্চিমাকাশের দিকে হেলেছে, তখন দেখতে পাই বিশ্ববরেণ্য কবির অঙ্কনশিল্পপ্রতিভা পূর্বাকাশে সূর্যের মতো প্রকাশিত হতে লাগল। তাঁর সত্তর বৎসর বয়সের মধ্যে সাহিত্যরচনা যখন খ্যাতির চরমে প্রতিষ্ঠিত, তখন তাঁর লেখনীর সঙ্গে যুক্ত হল তুলিকা, শুরু হল ছবি আঁকা। প্রতিদিনই ছবি এঁকে চলেছেন, যেন নেশায় পাওয়া অবস্থা। এই অবস্থায় আসার কিছুকাল পূর্বের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতা, সংগীত ও আরো অন্যসব লেখা সংশোধন করতে গিয়ে যেখানে কাটাকুটি করেছেন সেখানে একটা ছন্দ আনবার প্রয়াস করেছেন। তিনি কবি, সুরস্রষ্টা তাই ছন্দ-বন্ধনে আবদ্ধ। যেমন-তেমন করে কাটা তাঁর ভালো লাগত না। এই যত্ন করে ভুল সংশোধনে কাটাকুটি করতে গিয়ে তার মধ্যে নানাপ্রকার রূপ এসে গেছে। যেমন হেঁয়ালি-ভরা চিত্র, বিচিত্র রূপের পাখি, প্রাগৈতিহাসিক জীবজন্তুর আভাস ইত্যাদি। এরা সকলেই যেন কল্পলোকের সৃষ্টিছাড়া জীব। আবার অনেক সংশোধনে কিম্ভূত আকারের মানব অবয়বও দেখা যায়। প্রাগৈতিহাসিক জীবজন্তুর ক্রমবিবর্তনে ধীরে ধীরে যেমন মানুষের রূপ নিয়েছে তেমনি রবীন্দ্রনাথের চিত্রজগতের সূত্রপাত হয়েছিল প্রথমে লেখার সংশোধনে কাটাকুটির মধ্যে। সেখানে বিচিত্র রূপের পাখি, জীবজন্তুর আভাস পেলেও চিত্রশিল্পীর মন সন্তুষ্ট হতে পারছিল না যতদিন না মানুষের চোখমুখের মধ্যে বিচিত্র ভাবের রূপটিকে দেখতে পাওয়া গেছে। প্রথম দিকে কালিকলমের নিবের দ্বারাই যে কাজটা করা সহজ ছিল, সেটিকে সম্পূর্ণ ছবির রূপ দিতে গিয়ে দেখা গেল তাতে আর কুলোচ্ছে না, তাই কবিকে শিল্পীর মতো তুলি রঙ নিতে হল। তিনি সাধারণত ছবি আঁকতে তরল রঙ ব্যবহার করতেই ভালোবাসতেন। ছবি আঁকার জোর তাগিদে ধৈর্য ধরে ধীরে ধীরে রঙ গোলার তর সইত না, তাই তৈরি রঙ ব্যবহার করতে পছন্দ করতেন। আঁকবার টেবিলে নানা রকম রঙ ও বিভিন্ন রঙের কালি ইত্যাদি নিয়ে বসতেন, মাঝে মাঝে ছবিতে মনের মতো এফেক্ট বা জেল্লা আনতে গিয়ে নানাপ্রকার ফুলের বোঁটার কষও ব্যবহার করতেন। এইভাবে এফেক্ট আনতে গিয়ে কত রকম

পদ্ধতি যে প্রয়োগ করতেন যা তাঁর একেবারে নিজস্ব ছিল। শিল্পীদের পরম্পরাগত শিক্ষাপদ্ধতি ধারার সঙ্গে তাঁর নিজের পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ছিল। প্রত্যেক ছবিটির আঁকার প্রয়োজনে খাটুনির কোনো অভাব রবীন্দ্রচিত্রগুলিতে দেখা যায় না। ছবিগুলি দেখে অনায়াসে উপলব্ধি করা যায় শিল্পী ছবি আঁকার সময় বেশ আনন্দ পেয়েছেন, যার জন্য ছবি তৈরিতে শ্রমের কোনো অভাব রাখেন নি।

রবীন্দ্রচিত্রের কতকগুলি গুণ-বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার মতো। প্রথমেই চোখে পড়ে সমস্ত ছবির মধ্যে একটা ছন্দের অপূর্ব বন্ধন, যা দর্শকের মনকে আনন্দ দেয়। দ্বিতীয়ত, হালকা ও গাঢ় রঙ ব্যবহারের দক্ষতা। ভালো সংগীত যেমন গাওয়া হয় উদারা, মুদারা, তারা—তিন সুরসপ্তকের মধ্যে ওঠানামা করে, ভালো চিত্রেও সেই গুণটি থাকা চাই। রবীন্দ্রচিত্রে হালকা এবং গাঢ় রঙের অপূর্ব সমন্বয় চোখে পড়ে। তৃতীয়ত, মুখাকৃতিতে চোখ-মুখের মধ্যে অপূর্ব একটি ভাব যা দেখে মুগ্ধ হতে হয়। দীর্ঘকাল ধরে যাঁরা ছবি এঁকে ভালো শিল্পী বলে খ্যাতি অর্জন করেছেন, অনেক সময় তাঁদের পক্ষেও এমন ভাবময় চোখ-মুখ আঁকা সম্ভব হয়ে ওঠে না। চতুর্থ গুণটি হল তাঁর চিত্রগুলি বাস্তবধর্মী নয়। বাস্তবের কিছু আভাস থাকলেও প্রধানত ছন্দ ও ভাবের প্রাধান্যে ছবিগুলি ঠিক ছবির মতো হয়েই প্রকাশ পেয়েছে। যেমনি সাধারণভাবে কথা কওয়াকে কবিতায় ছন্দরক্ষায় ভিন্নরূপে বলা হয়, সংগীতও তাই। আরেকটি গুণ হল তাঁর ছবিতে কেবলমাত্র মুখটি এঁকে হাত পা ঢেকে দেওয়ার কৌশল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছবি আঁকার প্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন, "সাধারণত শিল্পীরা ছবি আঁকার পূর্বে ছবির বিষয়টিকে মনের মধ্যে কল্পনা করে, ভেবে নিয়ে পরে তাকে রূপ দেবার চেষ্টা করে। আমার ছবি আঁকা শিল্পীদের বিপরীত রীতিতে হয়ে থাকে। ছবির বিষয়ে পূর্ব থেকে কিছু চিন্তা না করেই ছবি আঁকা শুরু করি। কাগজের ওপরে দু-চারটা রেখা যা টানি তারাই ধীরে ধীরে কলমের নিবের আরো রেখার সাহায্যে নিজস্ব আকার বা ফর্ম নিতে থাকে, এমনি করে একটি ছবি হওয়ার ইঙ্গিত চোখের সামনে এনে দেয়। তখন তার উপরে কাজ করতে থাকি যতক্ষণ না সেটা সম্পূর্ণ একটি ছবি হয়ে ওঠে।" শিল্পীরা হয়তো তাঁর ছবি আঁকার পদ্ধতির কথা ভেবে অবাক বোধ করবেন। ছবির বিষয়কে পূর্ব থেকে কল্পনা না করে ছবি আঁকা শিল্পীদের পক্ষে কখনও সম্ভব নয়।

ছবি আঁকার কাজ তিনি শুরু করতেন বেশ সকাল থেকেই। চেয়ারের

সামনে একটি টেবিলে নানাপ্রকার রঙ ও তুলি সাজিয়ে বসতেন। জামার হাতা দুটি গুটিয়ে নিয়ে বেশ গুছিয়ে বসে তবে আঁকা শুরু করতেন। কাগজের ওপর কলম দিয়ে প্রথমে ড্রইং করে নিয়ে তার পরে রঙের প্রয়োগ চলতে থাকত। অনেক সময় নিবের উল্টো পিঠ দিয়েও কাগজের ওপর কালির আঁচড় কাটা হত। প্রয়োজনবোধে হাতের আঙুল দিয়েও রঙ লাগাতেন। কলাকৌশলের দিক দিয়ে এটাকে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব প্রণালী বলা চলে। ছবি আঁকার সময় তিনি তন্ময় হয়ে যান, তখন শুধু একমাত্র ভাবনা ছবিটিকে কেমন করে মনের মতো সুন্দরভাবে রূপদান করা যায়। প্রধানত তাঁর অধিকাংশ ছবিই সম্পূর্ণ হয়েছে সকাল থেকে মধ্যাহ্নের মধ্যে এক বসায় বা এক সিটিঙে। খুব কম ছবিই আছে যা দু-তিন দিনে এঁকেছেন।

ছবি আঁকার সময় যে দৃঢ়তা নিয়ে বসতেন তা দেখে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে যায়। আমাদেরই সমসাময়িককালের একজন কলাভবনের ছাত্র যীশু খ্রীস্টের একটি ছবি এঁকেছিলেন। ছবিটিকে সম্পূর্ণ বা ফিনিশ করতে পারছিলেন না। শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়ির বিখ্যাত দক্ষিণের বারান্দায় সকালের দিকে কলাভবনের ছাত্রটি তাঁর যীশু খ্রীস্টের ছবিটি নিয়ে অবনীন্দ্রনাথকে দেখান এবং কী করলে ছবিটিকে ফিনিশ করতে পারবেন তাঁর উপদেশ প্রার্থনা করেন। শিল্পীগুরু ছবিটিকে হাতে নিয়ে বেশ ভালোভাবে দেখে বললেন, "দেখ, ছবি যখন আঁকবে তখন ছবিটিকে একটা চ্যালেঞ্জ রূপে গ্রহণ করবে। দুই পালোয়ানের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যেমন একজন আর-একজনকে হারাবার জন্য তাল ঠুকে কুস্তি করতে লেগে যায়, ছবির বেলাতেও তাই, তাল ঠুকে লাগবে, ছবিকে নিজের বাগে আনবার চেষ্টা করবে, হার মেনে নেবে না, যদি হেরে যাও তবে ছবিটিকে ছিঁড়ে ফেলবে।" শেষটায় যীশুর ছবিটিকে কী ভাবে ফিনিশ করতে হবে শিল্পীগুরু বলে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকা দেখে মনে হত যেন জামার হাতা গুটিয়ে তাল ঠুকে ছবিটিকে বাগে আনবার একান্ত প্রয়াসে রত। তিনি একজন পাকা নক্‌শা-আঁকিয়ে বা ডিজাইনারও ছিলেন। নানারকম নক্‌শা আঁকতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। রঙিন চকে, প্যাস্টেলে, ড্রাই পয়েন্টে ও এচিং পদ্ধতিতেও ছবি এঁকেছেন। মাটির ভাণ্ডের গায়ে নক্‌শা আঁকার কাজও করেছিলেন।

ছবি আঁকার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রজীবন আলোচনা করলে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ বালককালেও কিছু কিছু ছবি এঁকেছেন। তবে কোনো আর্ট স্কুলে বা কারো কাছে কখনও চিত্রবিদ্যায় শিক্ষালাভ করেছেন বলে কোথাও উল্লেখ

পাওয়া যায় না। শিল্পী মুকুল দে-র একটি লেখাতে তিনি উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথের সুন্দর কালো চামড়ায় বাঁধানো একটি ড্রইং খাতায় কতকগুলি লোকের মুখ ও দেহ দেখে পেন্সিল দিয়ে তাঁর আঁকা ছবি ও কলম দিয়ে কতকগুলি নক্‌শা ছিল, তার মধ্যে কবিপত্নীরও একটি মুখাকৃতির ছবি ছিল। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিল্পী মুকুল দে-ও আলমোড়ার ধারে রামগড় পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন। একদিন প্রাতে মুকুল দে-র স্কেচ খাতাখানি নিয়ে তাতে রবীন্দ্রনাথ পেন্সিল দিয়ে তিনটি স্কেচ করেছিলেন। তার মধ্যে একটি কবির পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীর ও অপর দুটি মুকুল দে-র।

ছোটোকাল থেকে রবীন্দ্রনাথের শিল্পবিষয়ে জ্ঞান থাকা খুবই স্বাভাবিক। কারণ তিনি যে পরিবারে জন্মেছেন সেই পরিবারে প্রতিভাবান শিল্পীর অভাব ছিল না। বড়ো ভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথকে তাঁদের কত সব বিখ্যাত ছবি আঁকতে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন। এক সময়ে এই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দক্ষিণের বারান্দা শিল্পীদের নিকট তীর্থস্থানরূপে গণ্য হত। এইভাবে অবনীন্দ্রনাথের গোষ্ঠীভুক্ত বহু ভালো ভালো শিল্পীর ছবি তিনি দেখার সুযোগ পেয়েছেন। তা ছাড়া প্রাচীন ভারতীয় চিত্রও তিনি অনেকে দেখেছেন। প্রাচীন ভারতীয় চিত্রের সুন্দর একটি সংগ্রহ ছিল অবনীন্দ্রনাথদের বাড়ির বৈঠকখানায়। এ ছাড়াও পৃথিবীর বহু দেশের বিখ্যাত ছবির গ্যালারিগুলি পরিদর্শন করেছেন। দেশের ও বিদেশের শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি দেখার অভিজ্ঞতাও তাঁর ছিল। তিনি যখন ছবি আঁকা শুরু করেছিলেন তখন সেই অভিজ্ঞতার প্রভাব হয়তো তাঁর উপর কাজ করেছিল। যার জন্য তিনি অবনীন্দ্র-অঙ্কনপদ্ধতি বা ভারতীয় অন্য যে-কোনো রীতিকে অনুসরণ করেন নি। তাঁর আঁকার ধরণকে রবীন্দ্রনিজস্ব পদ্ধতি বলেই স্বীকৃতি দিতে হয়। পাশ্চাত্য পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ না করলেও আন্তর্জাতিক প্রভাব হতে একেবারে মুক্ত এ কথাও বলা চলে না। পাশ্চাত্য মডার্ন আর্টে আঙ্গিকের দিক থেকে একটা স্বাধীনতা আছে, খুব একটা বাঁধাধরা নিয়মে আবদ্ধ নয়, রবীন্দ্রনাথ এই সুযোগ নিয়েছিলেন বলে মনে হয়। পাণ্ডুলিপিতে সংশোধনে কাটাকুটির মধ্যে চিত্রশিল্পীর ভবিষ্যত গতিপথের সূক্ষ্মতম যে ইঙ্গিত বা নির্দেশ একদিন উপলব্ধি করেছিলেন সেই পথেই শেষ পর্যন্ত চিত্রশিল্পীরূপে তাঁকে অগ্রসর হতে হয়েছিল। চিত্রের বিষয় নির্বাচনে দেখা যায় সাদৃশ্যবর্জিত বিমূর্ত সৃষ্টি, সাদৃশ্যের আভাসযুক্ত কিছু ছবি যেমন পাখি, জীবজন্তু ইত্যাদি, নরনারীর মূর্তি, প্রতিকৃতি ও দৃশ্যচিত্র, মুখোশের মতো প্রতিকৃতি, নাটকীয় ভাবভঙ্গিযুক্ত প্রতিকৃতি, মধুরভাবযুক্ত
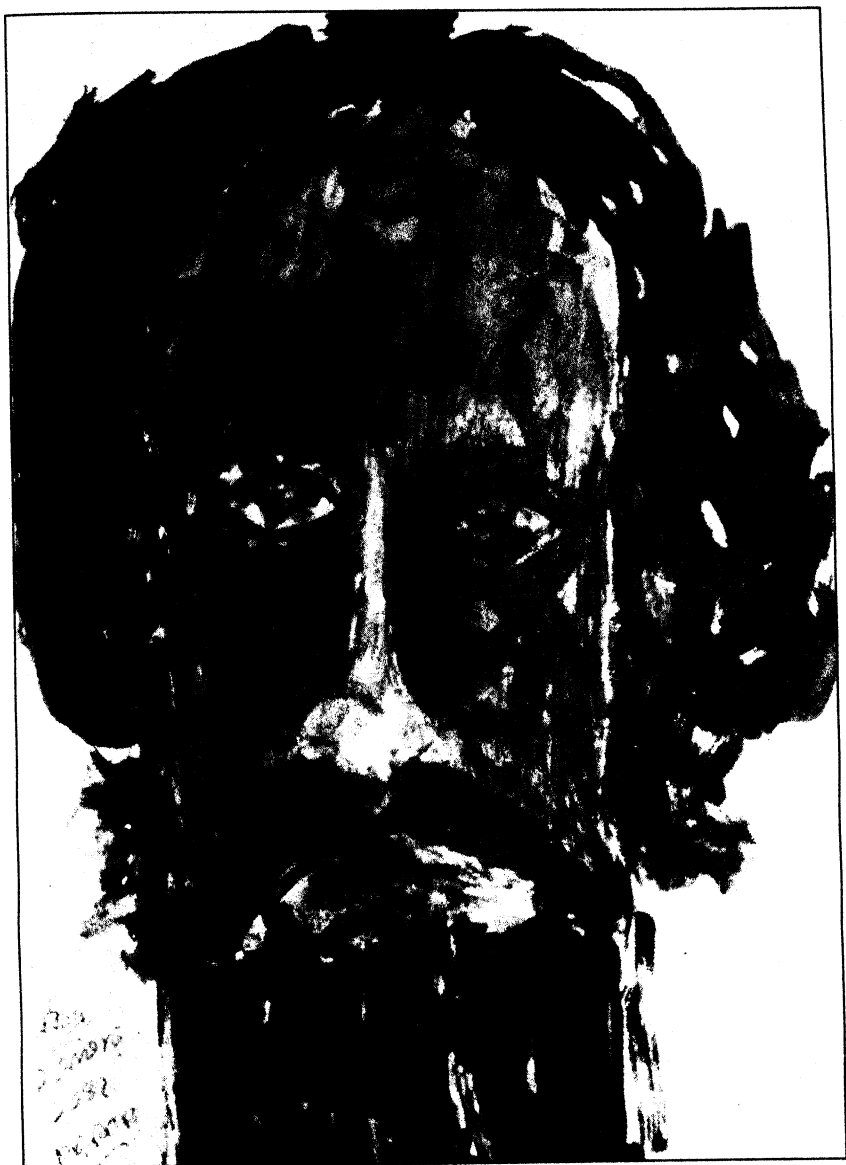
আত্ম-প্রতিকৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রতিকৃতি। রবীন্দ্রচিত্রে পূর্ণবয়স্কা নারী ও পুরুষ এই দুই রূপই পাওয়া যায়। শিশু বা জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের প্রতিকৃতি দেখা যায় না। পুরুষের প্রতিকৃতিতে বিকৃত মুখভঙ্গি পাওয়া গেলেও নারীর মুখাকৃতিতে কোনোপ্রকার বিকৃতি লক্ষ্য করা যায় না, বরং নারীর মুখাকৃতি যত্ন ও দরদ দিয়ে আঁকার নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। বেশ-কিছুকাল পূর্বে রবীন্দ্রভবনে রবীন্দ্রচিত্রের একটি প্রদর্শনী চলছিল। তাঁর অনেকগুলি ছবি এই প্রদর্শনীতে ছিল, যত্ন করে দেখছিলাম। রবীন্দ্রচিত্রে মুখাকৃতিতে কিম্ভূতকিমাকার কিছু ছবি আছে জানতাম। ভালো করে ছবিগুলি দেখতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম কয়েকটি পুরুষের মুখ কিম্ভূতকিমাকার করে এঁকেছেন অনেকটা মুখোশের ধরনে কিন্তু কোনো নারীর মুখকে তিনি বিকৃত করে আঁকেন নি। অতি যত্নসহকারে সেই মুখকে সুন্দর, মৃদু করে চোখে মুখে অপূর্ব ভাব আনতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি কবি, সুন্দরের উপাসক, নারীর মুখকে বিকৃত করা তাঁর রুচিবিরুদ্ধ, নারীর মুখকে সুন্দর করেই দেখতে চান।

রবীন্দ্রনাথ মোট আট-নয় বছরের মতো সময়ের মধ্যে দুহাজারেরও কিছু বেশি সংখ্যায় ছবি এঁকেছিলেন। আমেরিকা ও ইয়োরোপের বিখ্যাত কতকগুলি আর্ট গ্যালারিতে তাঁর চিত্র সংগৃহীত আছে। আমেরিকা, জার্মানি, ফ্রান্সে তাঁর চিত্রের প্রদর্শনী করবার পরে ১৯৩০ সালে লন্ডনে এসে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে ছিলেন পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী। অভিজাত পাড়া কেনসিংটন এলাকায় রেজিনা নামক হোটেলে উঠেছিলেন। মালিক ছিলেন নোয়াখালির এক বাঙালি ভদ্রলোক। লন্ডনে রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে তাঁর পুরোনো ইংরেজ বন্ধুরা খুব খুশি, বিশেষ করে রয়্যাল আর্ট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল স্যার উইলিয়াম রথেনস্টাইন। তাঁরা সকলেই রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করলেন লন্ডনে তাঁর ছবির একটি প্রদর্শনী করবার জন্য। সেগুলি নিয়ে লন্ডনে প্রদর্শনী হল খুব সাফল্যের সঙ্গে। বন্ধুদের অনুরোধে বার্মিংহামেও তাঁর চিত্রের প্রদর্শনী হয়। বেশ উচ্চমূল্যে কতকগুলি ছবি ম্যুজিয়ামের জন্য বিক্রি হয়ে যায়। বিদেশে তাঁর চিত্রপ্রদর্শনী হওয়া এবং চিত্র-সমালোচক ও নামকরা শিল্পীদের উচ্চ প্রশংসা লাভ করাতে রবীন্দ্রনাথের নিজের চিত্র সম্বন্ধে বেশ একটা আত্মপ্রত্যয় জন্মে যায়। নিজের দেশে তখন পর্যন্ত তাঁর চিত্রের কোনো প্রদর্শনী করেননি। বিদেশ থেকে ফিরে এসে সর্বপ্রথমে কলকাতায় নিজের চিত্রপ্রদর্শনী করবার কথা ভাবলেন।

কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ পদে তখন মুকুল দে ছিলেন।

তিনি আর্ট স্কুলের একটি অংশে বাস করতেন। রবীন্দ্রনাথ মুকুল দে-র আতিথ্য গ্রহণ করে তাঁর সঙ্গে বাস করতে গেলেন। এই সুযোগে অধ্যক্ষমহাশয় ১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২০ তারিখ থেকে নয় দিনের জন্য রবীন্দ্রনাথের ছবি অন্যান্য শিল্পকর্মের একটি পরিপাটিরূপে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করলেন। রবীন্দ্রচিত্রের প্রদর্শনী এটাই প্রথম ভারতে হল। দেশের লোক অবাক হল চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা লক্ষ করে। তবে তাঁর শিল্পবিষয়ে যে আলোড়ন তখন এসেছিল সেটা বিদগ্ধ সমাজের মধ্যেই সীমিত ছিল, সাধারণ লোকেদের মধ্যে বিশেষ ঔৎসুক্য জাগাতে পারেনি। তাঁকে ভারতীয় চিত্রধারার ধারক রূপে গণ্য করার চেয়ে মডার্ন আর্টিস্ট রূপেই কেউ কেউ দেখেছেন। রবীন্দ্রচিত্রগুলিকে প্রধানত দু ভাগে ভাগ করা চলে—যেমন রেখাঙ্কন চিত্র ও অপরটি সম্পূর্ণ চিত্র। পরিণত বয়সে বিশ্ববিখ্যাত কবি এই ছবিগুলি এঁকেছেন খেলার ছলে এই কথা ভেবে অনেকে হালকা মনে কৌতুকসহকারে এগুলিকে দেখেন, তাঁরা ভাবেন এর মধ্যে বড়ো কিছু পাবার নেই, তাই ছবির সামনে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে ভাবা নিষ্প্রয়োজন। সেইজন্যই বোধহয় একজন জগদ্‌বিখ্যাত চিত্রসমালোচক একবার বলেছিলেন, "রবীন্দ্রচিত্রগুলি দেখলে প্রথমে মনে হতে পারে ছেলেখেলায় আঁকা, কিন্তু একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সেখানে কোনোপ্রকার ছেলেমানুষি নেই। ছবিগুলি যত্ন করে দেখার ও ভাববার মতো।" ফরাসি দেশের একজন খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের চিত্রগুলি দেখে অবাক হয়ে বলেছিলেন, "দেখ, টেগোর, বহুদিন ধরে ছবি আঁকছি এবং আঁকায় যে লক্ষ্যে পৌঁছবার চেষ্টা করছি সেখানে পৌঁছতে এখনও পারিনি, তুমি কী করে সে লক্ষ্যে পৌঁছে গেলে, দেখে আশ্চর্য বোধ করছি।" কলাকৌশল শিক্ষার অভাব রবীন্দ্রনাথের বেলাতে ক্ষতিকর না হয়ে আশীর্বাদস্বরূপই কাজ করেছিল। যখন তিনি ছবি আঁকতেন তখন একমাত্র লক্ষ্যে পৌঁছবার ভাবনাই তাঁকে পেয়ে বসত, কলাকৌশল বিষয়ে সচেতন হবার সময় পেতেন না। তাই ছবি আঁকার সময়ে কলম ব্যবহার করছেন, কখনও নিবের উল্টোদিক, কখনও তূলি, কখনও হাতের আঙুল, এইভাবে কাজ করে লক্ষ্যে পৌঁছবার কি তীব্র আকূতি প্রকাশ পেত। মানসিক উচ্চ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতেই এমন নিবিষ্টচিত্তে ছবি আঁকায় মনোনিবেশ করতে পারতেন।

রবীন্দ্রচিত্রে মানুষের হাত-পা দেখা যায় না। শিল্পাচার্য নন্দলালের সঙ্গে তাঁর বাগানে বিকেলের দিকে একদিন বসে শিল্প বিষয়ে গল্প হচ্ছিল। প্রসঙ্গ

ক্রমে রবীন্দ্রচিত্রের কথা এসে গেলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম রবীন্দ্রচিত্রের সম্বন্ধে তাঁর কী অভিমত। উত্তরে তিনি বলেছিলেন রবীন্দ্রচিত্র ভালো করে বোঝার চেষ্টা করছি। এই কথা বলে তিনি শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের মতামতের কথা উল্লেখ করলেন। রবীন্দ্রচিত্রগুলি দেখে অবনীন্দ্রনাথ নাকি মন্তব্য করেছিলেন যেন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বেশি সংখ্যায় ছবি আঁকা রবিকাকার পক্ষেই সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি। তিনি যদি শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ অথবা নন্দলালকে অনুসরণ করে ছবি আঁকতেন তবে সেটা তাঁর পক্ষে অখ্যাতি হত। নিজস্ব ধরনের ছবি এঁকে তাঁর প্রতিভার সম্মান রেখেছেন। তিনি কারও অনুসরণকারী নন এখানেই তাঁর যথার্থ পরিচয়। কাব্যে, সাহিত্যে যা প্রকাশ করেন নি চিত্রে তাই প্রকাশ করলেন।

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ (১৮৭১-১৯৫১)

১৯১৬ সনের কথা। তৎকালীন ভারতসচিব মন্টেগু সাহেব বিলেত থেকে ভারতে আসছেন রাজনৈতিক আলোচনা করবার জন্য। সেই সময়ে কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও দেখা করবেন। এই উপলক্ষে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ আমাকে ডেকে পাঠালেন আমার বাঁশি নিয়ে কলকাতায় যাবার জন্য, সাহেবকে বাঁশি বাজিয়ে শোনাতে হবে। আমি তখনও ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র। গুরুদেবের বাড়িরই একটি অংশ একটি দোতলা লাল রঙের বাড়ি যার নাম বিচিত্রা তারই দোতালায় সাহেবকে দেখাবার জন্য বিশেষভাবে নির্বাচিত কয়েকজন ভালো শিল্পীর আঁকা চিত্র নিয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। এই প্রদর্শনীতে একদিন গুরুদেবের সঙ্গে শিল্পী ভ্রাতৃদ্বয় গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথকে আমার জীবনে প্রথম দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। তাঁরা সকলেই ঘুরে ঘুরে চিত্রগুলি দেখছিলেন এবং পরস্পরের মধ্যে চিত্রগুলির বিষয়ও আলোচনা করছিলেন। প্রদর্শনীতে শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ করের বিখ্যাত চিত্র 'পথের সাথি', নন্দলাল বসুর আঁকা 'যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ' এবং শৈলেন দে-র অঙ্কিত মেঘদূতের কতগুলি সুন্দর চিত্র আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গগনেন্দ্রনাথ গৌরবর্ণ, দেখতে সুপুরুষ রাজোচিত চেহারার লোক। মুখে মৃদু হাসি লেগেই আছে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা অবনীন্দ্রনাথ লম্বায় দীর্ঘ না হলেও বেঁটে নন, গায়ের রঙ সামান্য ময়লা, মাথায় কোঁকড়ানো কালো চুল, বুদ্ধিদৃপ্ত চেহারা। দুজনেরই পরনে লম্বা জোব্বা। তখন তাঁদের সঙ্গে আলাপের আমার কোনো সুযোগ হয়নি।

কলকাতায় প্রতি ডিসেম্বর মাসে সমবায় ম্যানসন নামে বৃহৎ বাড়িটির ১২ নম্বর বড়ো হলঘরটিতে সোসাইটি অব অরিয়েন্টাল আর্টের সর্বভারতীয় চিত্রপ্রদর্শনী হত। কলাভবন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৯ সনে। উক্ত প্রদর্শনীতে দেওয়ার আগে কলাভবনের শিক্ষক ও ছাত্রদের আঁকা ছবিগুলিকে নিয়ে কলকাতায় শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথকে প্রথমে দেখানো হত। ভোরবেলায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দিকে ছবিসহ যখন অগ্রসর হতাম তখন বাড়ির কাছে পৌঁছেই প্রথম চোখে পড়ত বাড়ির নীচের তলার প্রবেশপথের বারান্দায়

অতি পুষ্ট শয়নরত একটি ভেড়া ও বিরাট ভুঁড়িওয়ালা বলিষ্ঠ এক পশ্চিমি দারোয়ান। তার পরে একটু এগিয়ে দোতালায় ওঠার সুন্দর কাঠের সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছলে মোহিত-করা খাম্বিয়া তামাকের খুসবাই নাকে আসত। অবনীন্দ্রনাথদের প্রাসাদোপম বাড়িটার দোতলার বসবার ঘর শিল্পসম্ভারে ও ভারতীয় ধরনের আসবাবপত্রে সুন্দরভাবে সাজানো ছিল। দেওয়ালের গায়ে ছোটো বড়ো বহু রঙিন চিত্র টাঙানো ছিল, দেখেই মার্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। অধিকাংশ চিত্রই অবনীন্দ্রনাথের, গগনেন্দ্রনাথের ও নন্দলালের অঙ্কিত। তবে ভালো ভালো প্রাচীন রাজপুত ও মুঘল চিত্রও এই সংগ্রহে স্থান পেয়েছিল। দোতালার প্রশস্ত দক্ষিণের বারান্দায় পাশাপাশিভাবে তিনটি পৃথক আরামকেদারায় তিন ভাই—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গগনেন্দ্রনাথ, মাঝখানে কনিষ্ঠ অবনীন্দ্রনাথ ও মেজো ভ্রাতা সমরেন্দ্রনাথ প্রত্যেকেই এক-একটি করে আলবোলা নিয়ে বসে তামাক খেতেন আর জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় ছবি আঁকতেন, গল্প করতেন। মেজো ভ্রাতা শিল্প সমঝদার ও সমালোচকের স্থান গ্রহণ করতেন। যেমন মহান শিল্পী তেমনি বড়ো মজলিসি ব্যক্তি ছিলেন তাঁরা তিনজনই। কলাভবনের শিক্ষক ও ছাত্রদের আঁকা নূতন ছবিগুলি নিয়ে যখন ওঁদের সামনে গিয়ে উপস্থিত হতাম, তখন ছবিগুলি দেখবার জন্য কী আগ্রহই না তাঁদের তিন ভাইয়ের মধ্যে দেখেছি। কাড়াকাড়ি করে ছবিগুলি দেখতেন এবং ছবির নাম, তার মূল্য দুই-ই তাঁরা নির্ধারিত করে দিতেন। ছবিগুলির দোষগুণ বলে দিতেন, কিন্তু তার সঙ্গে থাকত তাঁদের অকৃত্রিম গভীর দরদ আর মমত্ববোধ। তাঁদের দেখা হয়ে গেলে ছবিগুলি নিয়ে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট ভবনে পৌঁছে দিয়ে আসতাম। এইভাবেই অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় হওয়ার প্রথম সূত্রপাত হয়।

তার পরে ১৯২১ সনে জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা বাড়ির পিছন প্রাঙ্গণে বিরাট একটি প্যাণ্ডেল তৈরি হল। সেখানে প্রথমে প্রকাশ্য জলসা বর্ষামঙ্গল গীতোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এস্রাজ বাজাবার জন্য দলভুক্ত হয়েছিলাম। গানের মহড়া হয়ে যাবার পরে সকালের দিকে কিছু সময় পাওয়া যেত, তখন অবনবাবুদের বাড়িতে গিয়ে তাঁর ছবি আঁকা দেখতাম তাঁর পাশের একটি কাঠের বেঞ্চিতে বসে। তিনি ছবি আঁকার ফাঁকে দু-চারটা গল্প এবং ছবি আঁকা সম্বন্ধে নানা রকম কথা বলতেন। কলকাতায় সাধারণ মঞ্চে তার পর থেকে কয়েক বছর অন্তরই বর্ষামঙ্গল অথবা বসন্তোৎসব, কিংবা বিসর্জন নাট্যাদি অভিনীত হয়। প্রতিবারেই এইসব উৎসবাদিতে যোগ দেবার সুযোগে

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে যেতাম। তখন অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে মেলামেশার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলাম।

বর্ষামঙ্গলের ও বসন্তোৎসবের গানের এবং বিসর্জন নাট্যের সব মহড়াই অবনবাবুদের বসবার ঘরের পাশে একটি বড়ো হলঘরে প্রাতে বা সন্ধ্যার সময়ে হত। গুরুদেব উপস্থিত থাকতেন ও নির্দেশ দিতেন। সংগীত পরিচালনা করতেন দিনেন্দ্রনাথ, পাখোয়াজ, বাঁয়া, তবলা সংগীতজ্ঞ ভীমরাও শাস্ত্রী বাজাতেন, এস্রাজ বাজাতাম আমি। অবনীন্দ্রনাথও তাঁর এস্রাজ নিয়ে আমাদের পাশে বসে বাজনায় যোগ দিতেন। গগনবাবু, সমরবাবু, আরো ঠাকুরবাড়ির কেউ-কেউ তখন সেখানে উপস্থিত থাকতেন। ভীমরাও শাস্ত্রীকে আমরা সকলে পণ্ডিতজী বলে ডাকতাম। পাখোয়াজ বাজাবার সময়ে পণ্ডিতজীর আটা জলে মাখানো একটি ঢেলার প্রয়োজন হত। পাখোয়াজের এক পাশে আটা ঢেলার কিছুটা লাগিয়ে বাকিটা পাশে রেখে দিতেন। অবনবাবু তার থেকে কিছু মাখানো আটা নিয়ে ছোটো একটি মানুষ তৈরি করে এস্রাজের ছড়ের মাথায় বসিয়ে এস্রাজ বাজাতে লাগলেন। এই দৃশ্য দেখে গানের কয়েকজন ছেলেমেয়ে মুচকি মুচকি হাসছিল। তারা গুরুদেবের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি কিন্তু তিনি এদের হাসির উৎসটি কোথায় সেটা ধরতে পারছিলেন না কারণ অবনবাবু আমাদের আড়ালে বসে এস্রাজ বাজাচ্ছিলেন। গুরুদেবের সন্ধানী চোখের ভাব দেখেই তাড়াতাড়ি অবনবাবু ছড়ের মাথার আটার মানুষটি লুকিয়ে ফেললেন।

শান্তিনিকেতনের সঙ্গে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হল যখন তাঁর প্রধান ও প্রিয় শিষ্য শিল্পাচার্য নন্দলাল ১৯২০ সালে স্থায়ীভাবে কলাভবনের কাজে এসে যোগদান করেছিলেন। এই ভবনের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের আঁকা ছবি অবনীন্দ্রনাথের মনকে শান্তিনিকেতনের প্রতি আরো বেশি করে আকর্ষণ করেছিল। ১৯২০, ২১, ২২ সালের কথা বলছি, তখন কলকাতায় প্রতি ডিসেম্বর মাসে সমবায় ম্যানসনে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের চিত্র প্রদর্শনী হত। কলাভবনের শিল্পী-শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের আঁকা ছবিগুলির নাম ও দাম তখন নন্দলালবাবু ও অসিতবাবুরা দিতেন না। ছবিগুলি কলকাতায় অবনবাবু, গগনবাবুদের কাছে পাঠানো হলে তাঁরাই নাম ও দাম স্থির করে প্রদর্শনীতে পাঠিয়ে দিতেন। প্রয়োজন হল ছবির দোষগুণ বুঝিয়ে দিতেন। কলাভবনের কাজের প্রতি অবনীন্দ্রনাথের সর্বদা লক্ষ্য ছিল। একবার একটি পত্রে আমাকে লিখেছিলেন—'আমি তো তোমাদের সামনেই সেদিন নন্দলালকে সাবধান করেছি জানো, ঐ অজন্তার মুখেই চলো আর

গ্রীস, জাপান বা চীনের দিকেই চলো সে পরের রাস্তা ধরে চলা ছাড়া আর কিছুই হবে না। অন্যের বন্দরে আমার জাহাজ কেন ভেড়াব আমাদের প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র বন্দর রয়েছে যখন। একলা চলা ছাড়া উপায় নেই আমাদের কারো, নিজের ফসল নিজের নৌকো বোঝাই করে নিজের বন্দরে গিয়ে নামলেম এর চেয়ে আর ভালো গতি ও মুক্তি নেই আর্টিস্টের, আমার নৌকোয় তোমার স্থান নেই, তোমার নৌকোয় আমার স্থান নেই। "ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই ছোটো সে তরী, আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি"—এই গান গেয়ে সব আর্টিস্টকেই চলতে হয়েছে চিরকাল একলা একলা রূপের রাজত্বের বন্দরে বন্দরে এই একই গান চিরকাল গেয়ে চল্লো সবাই। ছবি আঁকায় এমনি করে তিনি উপদেশ দিতেন। শেষ পর্যন্ত গৃহকোণ ত্যাগে অনিচ্ছুক অবনীন্দ্রনাথ ১৯২২ সালের প্রথম দিকে শান্তিনিকেতনে স্বয়ং এসে উপস্থিত হলেন। আম্রকুঞ্জে গুরুদেব তাঁকে সুন্দরভাবে সংবর্ধনা জানালেন। গুরুদেবের ভাষণের উত্তরে সেদিন অবনীন্দ্রনাথ যে কথাগুলি বলেছিলেন তা অতি মর্মস্পর্শী হয়েছিল। স্বপ্নের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন : পাহাড়ের রাস্তা ধরে চলেছেন, পিছনে নন্দলাল, অসিতকুমার, আরো সব শিল্পীছাত্রগণ তাঁকে অনুসরণ করছেন। কিছুদূর চলার পরে পাহাড়ের একটি বাঁক পার হয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখেন শিষ্যরা কেউ আর আসছেন না। শিল্পীদের সর্বদা একাই পথে চলতে হয়, সেই কথাটি সেদিন বুঝেছিলেন। এই ভাষণের এক জায়গায় বলেছিলেন তিনি তাঁর শিষ্যদের কাছ থেকে গুরুদক্ষিণা পেতে চান, তবে সে দক্ষিণা অর্থ বা বহুমূল্য জিনিস নয়, কিন্তু গড়ে দিতে হবে সুন্দর একটি পুতুল যা ছোটো ছোটো শিশুদের কচি হাতে তুলে দিতে পারবেন, তারা খেলা করে খুশি হবে। সেবারে এখানে তিনি ছিলেন মাত্র পাঁচটি দিনের জন্য। কলাভবন দেখা, গান শোনা, আশ্রমের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে বেড়ানো, সবই করলেন। তাঁর আন্তরিকতায় আশ্রমের সকলেই বুঝে নিয়েছিল তিনি আমাদেরই একজন।

এখান থেকে কলকাতায় তো ফিরে গেলেন কিন্তু এই পাঁচটি দিনের সুখ-স্মৃতি যেন মন থেকে কিছুতেই মুছে যেতে চায় না। তাই আমাকে একটি পত্রে লিখছেন—'তোমাদের কাছে তো যেতে চাই আমি কিন্তু ডানা পাইনে যে, সব আর্টিস্ট মিলে দু'খানা ডানা আমাকে বানিয়ে দিতে পারো নাকি? কিন্তু মনে রেখো ডানা মেলে ওড়ার ইচ্ছে আমাকে হয়তো কোন্ পারে নিয়ে ফেলে দেবে বোলপুর ছাড়িয়ে ভীষণ একটা উড়ো কলের মতো, তোমরা থাকবে মাটিতে দাঁড়িয়ে আকাশে চেয়ে আমি চলে যাব ডানায় ভর করে

অতএব ডানায় কাজ নেই একটা পুষ্পক রথের জোগাড় দেখ যাতে দলশুদ্ধ উড়ে পড়া যাবে।' তার পরে ১৭ এপ্রিল ১৯২৩ সালে অপর একটি পত্রে আমাকে আবার লিখছেন—'তোমরা শান্তিনিকেতনে ছাড়া পাখি আর আমি এখানে খাঁচায় ধরা পাখি, আমি যদি পালাতে পারতুম তো তোমাদের সঙ্গে গিয়ে মিলে নববর্ষে আনন্দ করতুম। আমবাগানে রাত্রে সেই বেদীর কাছে গিয়ে গান শোনবার তৃষ্ণা এখনো জাগছে আমার। তা ছাড়া মনে ভাবি সেই যে পাঁচটা দিন তার পুনরাবৃত্তি আর করা যাবে না, আমাকে তোমাদের সঙ্গে নতুন করে দেখাশোনা করবার সুবিধে করে দেবে কিনা জানি না, তবে মন বলছে হবে হবে, একদিন হয়তো দেখবে চুপি চুপি হঠাৎ উপস্থিত হয়েছি নতুনতরো খেলার পুঁজি নিয়ে!' শান্তিনিকেতনে আসবার ইচ্ছা এমনিভাবে বারবার প্রকাশ করেছিলেন।

তাঁর এই ইচ্ছা সত্যি একদিন পূর্ণ হয়েছিল। গুরুদেবের পরলোকগমনের পরে ১৯৪২ থেকে ১৯৪৬ সাল চার বছরের জন্য বিশ্বভারতীর আচার্য পদ গ্রহণ করে তিনি শান্তিনিকেতনে বাস করতে এলেন। এই সময়ে কলাভবনে প্রায়ই এসে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আর্টের বিষয়ে আলোচনা করতেন, গল্প করতেন। মনে যখন খুশি ধরত তখন কাটুম কুটুম গড়া কখনো বা ছোটো ছোটো ছবি এঁকে বিলিয়ে দিতেন। খুব আনন্দের সঙ্গে দিনগুলো তাঁর কেটে যাচ্ছিল। থাকতেন উত্তরায়ণের বড়ো বাড়ি উদয়নে। এমনিভাবে তাঁর সঙ্গে শান্তিনিকেতনের যোগাযোগ সুন্দরভাবে এক সময়ে গড়ে উঠেছিল।

রূপরসজ্ঞ শিল্পাচার্য নন্দলাল

অতীত ও বর্তমান কালের য়ুরোপীয় শিল্পীদের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনকাহিনীতে তাঁহাদের ভাবনা চিন্তা আচরণ রূপসৃষ্টির আবেগের সুস্পষ্ট পরিচয় প্রকাশিত হইয়া আছে। চীন ও জাপান-দেশীয় শিল্পীদেরও জীবন-ইতিহাসের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু অতীতকালের ভারতীয় শিল্পীদের পরিচয় বা তাঁহাদের কর্মধারার কোনো বিবরণ কোনো স্থানে উল্লিখিত হয় নাই। বিগতকালে ভারতে যে অপূর্ব ও মহান শিল্পসৃষ্টি হইয়া গিয়াছে যাহার নিদর্শন অজন্তা ইলোরা মহাবলিপুরম এলিফেন্টা ও কোনারক মন্দিরের গাত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের স্রষ্টাদের কোনো সংবাদ পাওয়া বর্তমানকালে আর সম্ভব নহে। তবে সেইসব প্রাচীনকালের শিল্পীদের সম্বন্ধে স্বভাবতই মনে একটা ধারণা জন্মায় যে তাঁহারা নিশ্চয়ই উচ্চপর্যায়ের শিল্পী ছিলেন, তাহা না হইলে এইরূপ মহান শিল্প সৃষ্টি করা তাঁহাদের পক্ষে কখনো সম্ভবপর হইত না। সেইসব দক্ষ অসাধারণ রূপস্রষ্টাদের আচার-ব্যবহার, চিন্তার মান, আর্থিক অবস্থা, সামাজিক স্তর, এমনি করিয়া তাঁহাদের জীবনচিত্রের পূর্ণ রূপটি পাইবার আজ আর কোনো উপায় নাই।

এই বিচ্ছিন্ন ঐতিহ্যকে বহন করিয়া বর্তমানকালে এমন একজন ভারতীয় শ্রেষ্ঠ শিল্পীর আবির্ভাব হইয়াছিল যাঁহার জীবনাদর্শে প্রাচীন ও বর্তমান শিল্পীদের সমুদায় গুণাবলীর পূর্ণ মিলন ঘটিয়াছিল। প্রাচীন শিল্পসৃষ্টিগুলিকে বুঝিবার ক্ষমতা ছিল যথেষ্ট এবং তাহাদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল অসীম অথচ তিনি নিজে ছিলেন অত্যাধুনিক শিল্পী। এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও মহান শিল্পী আচার্য নন্দলাল বসুর পরিচয়ে সর্বপ্রথমেই বলিতে হয় তিনি ছিলেন একজন মহান শিল্পী, শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করিবার মতো সকল গুণই তাঁহার মধ্যে ছিল। দেশী বিদেশী সব রকমের ভালো শিল্পের কাজকেই বুঝিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইতে আনন্দ পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন, এই বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল খুবই উন্নত ও উদার। কিন্তু যেখানে শিল্পধারার কথা বলা হইত সেখানে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় শিল্পী বলিয়া পরিচয় দিতে আনন্দ বোধ করিতেন। তিনি ছিলেন মনে-প্রাণে আদর্শ ভারতীয় শিল্পীর

প্রতীক। তাঁহার শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথকে যে নিষ্ঠার সহিত তিনি শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালোবাসিতেন তাহা এই যুগে খুবই বিরল। আবার নিজের ছাত্রদের প্রতিও ছিল তাঁহার অসীম ভালোবাসা ও স্নেহ। গুরুশিষ্যের আদর্শেরও প্রতীক ছিলেন নন্দলাল। তাঁহাকে দেখিয়া সেই অতীতকালের অনামী ভারতীয় শিল্পীদের কথা কল্পনায় ভাবা যায়, মনে হয় হয়তো বা তাঁহারাও এইরকমই ছিলেন। নন্দলালের ছিল তীক্ষ্ণ ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি, মানুষের জীবন-প্রবাহ, প্রকৃতির বৈচিত্র্য প্রকাশ—এই বিশ্বের যাহা-কিছু সুন্দর ও অসুন্দর সকলই বুঝিতে পারিতেন। সুন্দরকে নিজের অন্তরে উপলব্ধি করিয়া আনন্দিত হইতেন, তাহাকে প্রকাশ করিতেন নিজের শিল্পসৃষ্টির মধ্যে। অনেক সময় কথার প্রসঙ্গে কৌতুকচ্ছলে নিজের ছাত্রদের এবং বন্ধুদেরও এই আনন্দের ভাগী করিতেন। তাঁহার চলন বলন ভাবনা হাসি ঠাট্টার মধ্যে শিল্পীর সরসতার গুণটি পরিস্ফুট। তাঁহার বাসগৃহ, তাহার চারি পাশের বাগান, চিত্র অঙ্কনের স্থানটি যেখানে তাঁহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত শিল্পচিন্তায়, রূপসৃষ্টির কাজে, তাহাদের পরিপাটি বিন্যাসের সৌন্দর্য লক্ষণীয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে গুরু অবনীন্দ্রনাথের নিকট নন্দলালের চিত্র অঙ্কন শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে সমাপ্ত না হওয়ায় তখনো গুরুর সান্নিধ্য ত্যাগ করিতে পারেন নাই। দেশের আবহাওয়া তখন স্বাদেশিকতার মন্ত্রে উদ্দীপ্ত। যুবক নন্দলাল ইহার দ্বারা প্রভাবিত হইবেন ইহা খুবই স্বাভাবিক। এই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া দেশের পুরাতন বা বর্তমান-কালের মধ্যে যাহা-কিছু ভালো তাহাকেই গভীরভাবে বুঝিবার, উপলব্ধি করিবার একটা তীব্র প্রয়াস শিল্পীর সর্বকাজের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। নন্দলালের প্রথম যুগের চিত্রগুলিতে ইহার সাক্ষ্য রহিয়া গিয়াছে। ভারতীয় প্রাচীন চিত্রগুলির মধ্যে অজন্তা গুহাচিত্র-রচনাশৈলীই এক সময়ে শিল্পীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। ইহার একটি প্রধান কারণ ইংরেজ মহিলা চিত্রশিল্পী লেডি হেরিংহামের দলভুক্ত হইয়া অজন্তা গুহাচিত্রগুলিকে নকল করিবার সুযোগ তিনি পাইয়াছিলেন। তখন ভালো করিয়া এই চিত্রগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া ইহার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ ও দক্ষতা অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন। অজন্তা চিত্রের বৃহৎ রচনা-কৌশল, সীমিত রঙের প্রয়োগ, মূর্তি অঙ্কনে অপূর্ব পারদর্শিতা, তুলির রেখায় ছন্দোগতির দৃঢ়তা, সর্বোপরি চিত্রগুলিতে ভাবের প্রয়োগ নন্দলালকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি নিজে একজন কৌশলী দক্ষ শিল্পী, তাঁহার রুচিবোধের ও স্বভাবগত সামঞ্জস্য অজন্তার চিত্রগুলির মধ্যে যেন খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন,

সেই কারণেই তিনি অনেক সময় বলিতেন যে, "এই গুহাচিত্রগুলি পূর্বজন্মে আমরাই আঁকিয়াছি।" তাঁহার অঙ্কিত চিত্রগুলির মধ্যে তুলিচালনার দক্ষতা লক্ষ্য করিয়া অনেক সময়ে মনে হইয়াছে যে তিনি যদি এ বিষয়ে আর একটু লক্ষ্য দিতেন তবে চীন দেশীয় শ্রেষ্ঠ চিত্রকরদের তুলি-চালনায় ওস্তাদির সমকক্ষ অনায়াসে হইতে পারিতেন।

স্বদেশকে ভালোবাসিতেন বলিয়া দেশের লোকশিল্প কারুশিল্পের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত আন্তরিকতা ও দরদ ছিল। দরদীর দৃষ্টিভঙ্গিতে আবার নূতন করিয়া গভীরভাবে এই শিল্পগুলিকে বুঝিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার নিজের চিত্রেও ইহাদের প্রভাব ব্যক্ত হইয়াছে। ইহার জন্য তিনি আনন্দ ও গর্ববোধ করিতেন। কিছুদিন তিনি গ্রাম্যপটের নমুনায় চিত্র আঁকিয়াছিলেন, রঙ-তুলিও পটুয়া শিল্পীদের মতোই নিজে প্রস্তুত করিয়া লইতেন এবং চিত্রগুলির মূল্য এমন সুলভ করিয়াছিলেন যাহাতে অতি সাধারণ লোকেরাও ক্রয় করিতে পারে। তবে এই প্রচেষ্টা বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই। শিল্পী নন্দলালের প্রথমযুগের চিত্রগুলির বিষয়বস্তুর প্রতি মনোনিবেশ সহকারে অনুধাবন করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তখন স্বদেশপ্রীতি সর্বত্র অত্যন্ত প্রবল থাকায় অথবা অন্য কোনো কারণবশত দেশের কৃষ্টিকে, পূজাপার্বণাদির আনন্দকে চিত্রের মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট নূতন করিয়া দেখাইবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। প্রচলিত আখ্যান, প্রাচীন কাব্য, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, হিন্দু দেবদেবীর কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া শিল্পী তখন বহু সুন্দর সুন্দর চিত্র রচনা করিয়াছেন। বহুদিনের গতানুগতিক কিছু হিন্দু দেবদেবীর মূর্তির যে অশোভন রূপকল্পনা চলিয়া আসিতেছিল তাহার উন্নততর সংস্কার নন্দলালই করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যাত্রাদলের গোঁফ-দাড়িযুক্ত ভুঁড়িওয়ালা শিবের পরিবর্তে কি অপরূপ শিবসুন্দরের রূপ-কল্পনা আমাদের চোখের সম্মুখে নন্দলাল ধরিয়া দিয়াছেন। তাঁহার অঙ্কিত চিত্রে উমা অগ্নিদেবতা রাম লক্ষ্মণ সীতা অন্নপূর্ণা আরো .বহু দেবদেবীর আকৃতি আধুনিক রুচিসম্মত রূপ পাইয়াছে। তাঁহার গুরু অবনীন্দ্রনাথ দিল্লীর মুঘল বাদশাহ, সাহজাদীদের রহস্যাবৃত রঙিন জীবনকাহিনীকে অবলম্বন করিয়া যখন রূপকথার জাল বুনিয়া চিত্র আঁকিতেছিলেন তখন নন্দলাল গ্রাম্য সরল জীবনের প্রতি, পানা পুকুরে স্নানরতা গ্রাম্য বধূদের জটলা, পুরাতন গৃহের অর্ধভগ্ন প্রাচীরের গাত্রে সতেজ নবীন অশ্বত্থবৃক্ষের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের চিত্র আঁকিয়াছেন। বাদশাহ বেগম বা উচ্চতর শৌখিন আভিজাত্যের বিষয়বস্তু

তাঁহার চিত্রে খুব কমই স্থান পাইয়াছে। তিনি নিজে যেমন সরল জীবনযাত্রা পালন করিতেন তেমনি গ্রামের সাধারণ সরল জীবন প্রকাশের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। তাঁহার এই যুগের চিত্রগুলির বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে বলিতে হয় ভালো ও উচ্চপর্যায়ের চিত্রের সকল গুণই ইহাদের মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে। যেমনটি ইহাদের রচনাভঙ্গি, অঙ্কনবিন্যাস, উৎকৃষ্ট ড্রইং তেমনই ইহাদের বর্ণপ্রয়োগ ও সমাপক বা ফিনিশিং। ভাবপ্রয়োগেরও কোনো অভাব নাই, এক কথায় বলিতে হয় নিখুঁত চিত্র।

শান্তিনিকেতনে আসিবার পরবর্তীকাল হইতে তাঁহার চিত্রে আরো কতকগুলি গুণের সংযোগ হইয়াছিল তাহা হইল প্রকৃতির সৌন্দর্য-রসের আস্বাদনের আনন্দ, মানবজীবনের বৈচিত্র্য প্রকাশে বহু রূপের সন্ধান, চিত্রে অঙ্কনের আড়ষ্টতা অতিক্রান্ত সহজ স্বচ্ছন্দতা। তবে সমালোচকের কঠোর দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করিতে গেলে হয়তো দেখিতে পাওয়া যাইবে নন্দলালের প্রথম যুগের প্রশংসিত চিত্রগুলির মধ্যে কিছু সংখ্যক চিত্র আছে যাহাদের পরবর্তী দীর্ঘ কালের কষ্টিপাথরে পরীক্ষায় খ্যাতির সামান্য তারতম্য হইবার আশঙ্কা রহিয়া গিয়াছে। যেসব চিত্র কাব্যিক প্রেরণায় রচিত নহে কিন্তু কেবল মাত্র বর্ণনাধর্মী চিত্র (illustrative) তাহাদের আবেদন সমকালীন বা বিশেষ কালোপযোগী। কাব্যিক গুণসম্পন্ন চিত্রসৃষ্টির আবেদন চিরকালের—কারণ মানুষের মনে এই ভাবের আবেগ চিরকালের। অনেক চিত্র আছে যাহার মধ্যে শিল্পীর গুণপনার সন্ধান না করিয়াই অঙ্কন-বিষয়বস্তুর মোহে আমরা মুগ্ধ হইয়া থাকি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে বঙ্গভঙ্গের সময় শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কিত ভারতমাতা চিত্রটি যে ভাবে তখনকার বঙ্গবাসীদের মনে আলোড়ন আনিয়াছিল তাহার প্রধান কারণ এই চিত্রের বিষয়বস্তুর সহিত তখনকার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির একটি সামঞ্জস্য ছিল। বর্তমানকালে ইহার আবেদন পূর্বের মতোই রহিয়াছে কি না এই বিষয়ে সন্দেহ আছে।

রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যলাভের সুযোগ নন্দলাল পাইয়াছিলেন যখন তিনি শান্তিনিকেতনে কলাভবনের কার্যে শিল্পীশিক্ষকরূপে যোগদান করিয়াছিলেন। এই সুযোগকে শিল্পী নন্দলাল পরম সৌভাগ্য, পরম লাভ বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি একবার এইরূপ উক্তি করিয়াছিলেন যে, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার তৃতীয় নয়ন বা অন্তর্দৃষ্টি লাভ হইয়াছিল। এতদিন ধরিয়া যে দৃষ্টিভঙ্গিতে এই বিশ্বজগৎ তাঁহার নিকট প্রকাশিত এখন তাহার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আরো গভীরভাবে সরসতা

সহকারে যেন ইহাকে দেখিতে ও বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কবির ভাষায় বলিতে হয় "রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন আশা করি।" শিল্পীকে দেখিয়াছিলাম কি গভীরভাবে সম্পূর্ণভাবে এই অরূপরতনের আশায় রূপের সাগরে তিনি ডুব দিয়াছিলেন। সেই আনন্দের প্রকাশ তাঁহার পরবর্তী সকল চিত্রের মধ্যে ধরা পড়িয়াছিল। শহর হইতে দূরে প্রকৃতির সমাবেশে শান্তিনিকেতন, তাহার আশপাশের উন্মুক্ত প্রান্তর, খোয়াই, কোপাই নদী—ইহারা যেন একটি বন্ধনহীন মুক্তির আবহাওয়া শিল্পীর নিকট আনিয়াছিল। সহজ সরল বীরভূমি গ্রাম্যজীবন, সাঁওতালদের সরল আত্মপ্রকাশের সৌন্দর্য, রাঙামাটির রাস্তা ধরিয়া গোরুগাড়ির চলন, হাটের লোকের চলা নন্দলালকে সত্যিই মুগ্ধ করিয়াছিল। চৈত্রশেষের প্রবল বালির ঝড়, কালবৈশাখীর ঝোড়ো পাগলামি, আবার শরতে সবুজ মাঠে ফুলের আস্তরণ শিল্পীর দৃষ্টিতে অবহেলিত হয় নাই। শান্তিনিকেতনে বসবাসের পরবর্তীকালে নন্দলালের চিত্রের বিষয়বস্তুর পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রবীন্দ্রপূর্ব ও রবীন্দ্রোত্তর-কাল নির্দেশ করিয়া শিল্পীর সমস্ত চিত্রকে প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। পূর্ববর্তীকালে অঙ্কন-বিষয়বস্তুতে হিন্দু দেবদেবী, হিন্দুর কৃষ্টি, পুরাণ আখ্যানগুলি বিশেষ স্থান পাইয়াছিল, আবার পরবর্তীকালে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও তাহার বহুমুখী প্রকাশ, জনগণের জীবনধারা, পশুপাখি ফুল গাছ লতা পাতা কাব্যিক মনের প্রেরণা। তাঁহার নিকট গুরুগম্ভীর অথবা সামান্য বিষয় দুইয়ের মধ্যে আর বিশেষ প্রভেদ রহিল না, শিল্পীর রচনায় দুইই সমান গুরুত্ব লাভ করিত। নন্দলাল যেন স্পর্শমণি লাভ করিয়াছিলেন। সামান্য বিষয়ও তাঁহার তুলির স্পর্শে অপরূপত্ব লাভ করিত। এই সময়ে শিল্পীর বিষয়বস্তু-নির্বাচনের সীমা বহুভাবে প্রসারিত। তিনি যুক্তির ক্ষমতা, সৌন্দর্যবোধ ও দার্শনিকের দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। আমৃত্যু এই পথেই তাঁহার শিল্পসাধনা পরিচালিত হইয়াছিল।

এই স্বনামধন্য শিল্পীর প্রথম দর্শন পাইয়াছিলাম ১৯১৪ সনে ছাতিমতলায় ইহার বৃক্ষাদি অঙ্কনরত অবস্থায়। তখন আমরা শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র। পূর্বাহ্ণে আম্রকুঞ্জে গুরুদেব তাঁহাকে মানপত্র প্রদান করিয়াছেন, এই উপলক্ষেই নন্দলালের শান্তিনিকেতনে প্রথম আগমন। তখন কল্পনাও করিতে পারি নাই যে ভবিষ্যতকালে তাঁহারই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া চিত্রবিদ্যায় শিক্ষালাভ করিব। ১৯১৯ সনের গোড়ার দিকে তিনি শান্তিনিকেতনে ঘন ঘন আসিতে লাগিলেন ও কয়েকটি ছাত্রকে চিত্র অঙ্কনে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। ধীরে ধীরে বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ছাত্রদের দল আসিয়া

তাঁহার নিকট একত্র হইতে লাগিল। এমনি করিয়াই কলাভবনের প্রতিষ্ঠা হইল। নন্দলালের শিল্পশিক্ষার আদর্শে ও পদ্ধতিতে কতগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়, যথা গুরুশিষ্যের পরস্পরের মধ্যে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সম্বন্ধ, শিল্প বিষয়ে আলোচনা ও ইহার বিষয়ে জ্ঞানলাভ এবং কলাশিল্পের চর্চা। নন্দলাল, অতীত ও বর্তমান-কালের সকল শ্রেষ্ঠ শিল্পের প্রতি ছাত্রদের শ্রদ্ধা ও দৃষ্টি যাহাতে থাকে তাহার প্রতিও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহার শিক্ষাপ্রদানের অন্য বৈশিষ্ট্য হইল তিনি কখনো ছাত্রদের চিত্র অঙ্কনকালে তাহাদের স্বাধীন ভাবনায় বা চিন্তায় কোনোপ্রকার বাধা সৃষ্টি করিতেন না বরং ইহাতে উৎসাহিত করিতেন। ছাত্রদের চিত্রের একমাত্র সংশোধন করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না, উপরন্তু তাহাতে উৎকর্ষ আনয়ন করিতে সর্বদা চেষ্টা করিতেন। তাঁহার সকল ছাত্রছাত্রীগণ একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে শিক্ষক হিসাবে নন্দলালের সমকক্ষ পাওয়া খুবই দুরূহ। তাঁহার নিকট শিক্ষালাভের সুযোগ পাওয়া একটি সৌভাগ্যের বিষয়। চারি পাশের গাছপালা বাড়িঘর পশুপাখি মানুষ সকলই স্কেচ করিতে তিনি নিজে যেমন আনন্দ বোধ করিতেন তেমনি ছাত্রদেরও এই বিষয়ে উৎসাহিত করিতেন। ছবি আঁকিবার ঘরে বসিয়া যে শিক্ষা হয় ইহাতে সম্পূর্ণতা লাভ হইতে পারে না এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই ছাত্রদের সঙ্গে লইয়া প্রতি শীতকালে গ্রাম, গ্রামাঞ্চলে ও শিল্পপ্রধান স্থানগুলি যেমন অজন্তা ইলোরা মহাবলিপুরম বুদ্ধগয়া পুরী কোনারক এবং ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ স্থান রাজগৃহ নালন্দা ইত্যাদিতে শিক্ষা-ভ্রমণে যাইতেন। বর্তমানকালে স্কুল কলেজের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতি বৎসর শিক্ষা-ভ্রমণে যাইবার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। হয়তো এই কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে নন্দলালই সর্বপ্রথমে শিক্ষা-ভ্রমণ এই দেশে প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এইরূপ ভ্রমণের সুযোগে ছাত্রগণ প্রভূতভাবে উপকৃত হইয়া থাকে। শিক্ষাকালে ক্লাসঘরে শিক্ষক ও ছাত্রদের পরস্পরের আচরণের মধ্যে যে একটা ব্যবধান থাকিয়া যায় ইহার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি হইয়া থাকে এই সময়ে। যাহা-কিছু দর্শনীয় আকর্ষণীয় অধ্যাপকগণ ইহাদের স্কেচ করিতেন; তখন তাঁহাদের কাজ করিবার ধরণ ছাত্রগণ দেখিতে পাইত। যতক্ষণ পর্যন্ত দিনের আলো থাকিত ততক্ষণ স্কেচ করার কাজ চলিত। সন্ধ্যার দিকে নিজেদের তাঁবুতে সকলে ফিরিয়া তাঁবুগুলির মধ্যেকার উন্মুক্ত স্থানে জ্বলন্ত আগুনের চারি পাশে জটলা করিয়া গান গাহিয়া, নৃত্য কৌতুক অভিনয়াদি করিয়া আনন্দ করা হইত। এই সময়ে অনেক ছাত্রছাত্রীদের স্বাভাবিক গুণের পরিচয় ধরা পড়িত যাহা বিদ্যালয়ে থাকাকালীন

কেহই জানিত না। গুরু নন্দলাল আলাপ ও গল্পচ্ছলে ছাত্রদের নিকটে শিল্পে সৌন্দর্যবোধের, অঙ্কন পদ্ধতির এবং আরো অনেক বিষয়ের কথা ব্যক্ত করিতেন। ঋতুরাজের সমাগমে পলাশ শিমুল ফুলের রক্তিম রাগে যখন গাছপালায় আগুন ধরাইয়া দেয় তখন এই সৌন্দর্যকে দেখিবার সুযোগ করিয়া দিতেন কোপাই নদীর পারে বনভোজনের আয়োজন করিয়া।

আজ হইতে পঁয়তাল্লিশ বৎসরেরও পূর্বেকার কথা, তখন শিল্পশিক্ষার কেন্দ্র কলাভবন প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। নন্দলাল শান্তিনিকেতনে গুরুপল্লীর পূর্বপ্রান্তে একটি মাটির দোতলা গৃহে সপরিবারে বাস করিতেন। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা তখন সচ্ছল না থাকায় এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপকগণের আর্থিক অবস্থাও খুব ভালো ছিল না, অবশ্য ইহার জন্য কেহই খুব একটা অসন্তুষ্ট ছিলেন না। কলাভবনের ছাত্র হিসাবে তাঁহার গৃহে আমাদের যাতায়াত ছিল। মাটির গৃহ, খড়ের চালা, প্রয়োজনীয় সাধারণ আসবাবপত্রেরও অভাব তবু সমস্ত বাড়িটি যেন শিল্পীর সুরুচি ও সৌন্দর্যবোধের স্পর্শে শ্রীমণ্ডিত। গৃহের দক্ষিণ দিকের অপরিসর বারান্দায় একটুকু স্থানকে কাঠ দিয়া ঘিরিয়া ছবি আঁকিবার স্টুডিয়োতে পরিণত করা হইয়াছিল। নন্দলালের বহুবিখ্যাত চিত্রগুলি এই স্টুডিওতে অঙ্কিত হইতে দেখিয়াছি। প্রতি বৎসর শ্রীপঞ্চমীর দিনে বিকাল বেলায় কলাভবনের ছাত্রগণকে চা পানের নিমন্ত্রণ করিয়া ঐ দক্ষিণের বারান্দায় বসাইতেন। ছাত্রসংখ্যা তখন দশ বারো জনের বেশি হইবে না। সঙ্গে এসরাজ লইয়া যাইতাম, গুরুদেবের রচিত বসন্তকালোপযোগী গান গাওয়া হইত একের পর এক। গুরু নন্দলাল অভিভূত চিত্তে গান শুনিতেন। রবীন্দ্রসংগীত তাঁহার নিকট অতি প্রিয় ছিল। সংগীত চলার মধ্যে এক সময়ে ছোটো ছোটো রেকাবিতে করিয়া কিছু আম্রমুকুল, শালফুল, পলাশফুল প্রত্যেককে পরিবেশন করা হইত। ইহাদের নিরীক্ষণ করিয়া ইহাদের সৌন্দর্য সুগন্ধ ও এই বৎসরের বসন্তঋতুর আগমনের বার্তাবহনকারী বলিয়া এই ফুলগুলিকে উপস্থিত সকল শিল্পীগণ সমাদর করিতেন। সর্বশেষে অবশ্য নানা প্রকার আহার্যে সকলকে পরিতৃপ্ত করিবার ব্যবস্থা থাকিত। এইসব আয়োজনের দ্বারা ছাত্রগণের মনে নিজেরা শিল্পী বলিয়া আত্মবোধ জাগ্রত হোক, প্রকৃতির অভিব্যক্তিকে অন্তরে উপলব্ধি করুক গুরু নন্দলাল ইহাই চাহিয়াছিলেন।

পূজা অথবা গ্রীষ্মাবকাশে ছাত্রগণ নিজেদের বাড়িতে ছুটির দিনগুলি অতিবাহিত করিবার জন্য শান্তিনিকেতন ত্যাগ করিয়া যাইত। তখন গুরু নন্দলালের সহিত ছাত্রগণের পত্রালাপ হইত পোস্টকার্ডে ছবি আঁকিয়া। ইহার

প্রচলন কলাভবনের পুরাতন ছাত্রগণের মধ্যে এখনো দেখিতে পাওয়া যায়। শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর জাপানী শিল্পী টাইকান সানকে ছবি আঁকিয়া চিঠিপত্রাদি সর্বপ্রথমে লিখিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়। প্রাচীরচিত্র বা ফ্রেস্কো পুনঃপ্রচলনে তাঁহার ছিল অনন্ত উৎসাহ। গোয়ালিয়র গভর্নমেন্টের দ্বারা আমন্ত্রিত হইয়া ১৯২১ সনে বাগগুহার প্রাচীরচিত্রগুলি নকল করিবার জন্য চিত্রশিল্পীত্রয় সুরেন্দ্রনাথ কর,, অসিতকুমার হালদার ও নন্দলাল গোয়ালিয়র রাজ্যে গিয়াছিলেন। চিত্রগুলি নকল করিয়া শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন করিবার পর হইতেই নন্দলাল শান্তিনিকেতনের প্রধান লাইব্রেরিগৃহে, চীনাভবনে, কলাভবনের ছাত্রছাত্রীগণকে লইয়া প্রাচীরচিত্র অঙ্কন করিয়া শিল্পী অধ্যাপকগণকে ও ছাত্রছাত্রীদের এই অঙ্কনরীতিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের বহু অভিনয়াদি শান্তিনিকেতনে ও কলিকাতার নাট্যমঞ্চে অভিনীত হইবার সময়ে মঞ্চসজ্জা, অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের রূপসজ্জায় নন্দলালের অভিনব অবদান সর্বজনপ্রশংসিত। বর্তমানকালে অভিনয়াদিতে ইহার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ছাত্রগণকে শিক্ষাদান করার মধ্যে সামান্য অবসর পাইলে নিজের খুশি খেয়াল মতো কাজ করিতে ভালোবাসিতেন। পরিত্যক্ত ছোটখাট দ্রব্যাদি কুড়াইয়া তাহাকে কাটিয়া ঘষিয়া নিজের পছন্দমতো একটি শিল্পবস্তুতে পরিণত করিতে শিল্পী বড়ই আনন্দ বোধ করিতেন। অনেক সময় রাস্তার ধারে উই-খাওয়া পুরাতন তালের আঁটিকে কুড়াইয়া নিজের নকশায় সুন্দর জল উঠাইবার ছোট একটি পাত্র গড়িতেন। পুরাতন বাঁশের টুকরাকে এইরূপে মান-পত্র প্রদানের সুন্দর একটি আধার প্রস্তুত করিতে একবার দেখিয়াছিলাম। দক্ষ শিল্পীর গুণই হইল কেবলমাত্র চিত্র অঙ্কনের মধ্যে সৃষ্টির ক্ষমতা সীমিত হইবে না, কিন্তু দ্রব্যের গুণাগুণের উর্ধ্বে একমাত্র শিল্পীর কৌশলী হস্তস্পর্শ ও চিন্তায় অপূর্ব কলাসৃষ্টির রূপ গ্রহণ করিবে। শেষবয়সে তিনি তাঁহার চিত্রে রঙ ব্যবহার করা এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রঙ গোলার পরিশ্রম করিতে অসুবিধে বোধ করিয়া রঙের পরিবর্তে চীনা কালি ব্যবহার করিতে পছন্দ করিতেন। এই সময়ে কিছুদিন ধরিয়া সাদা কাগজ কোনো একটা আকারে ছিঁড়িয়া রঙিন কাগজের পটভূমিতে আঠার দ্বারা আঁটিয়া চিত্ররচনার কাজ চলিতে লাগিল। প্রয়োজন বোধে কালি দিয়া একটুকু রেখার সংযোগও তাহাতে হইত। অনেক সময় ইহার বিপরীত পদ্ধতিতে রঙিন কাগজ ছিঁড়িয়া সাদা কাগজের পটভূমিতে আঁটিয়া দেওয়া হইত। জীবনের দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি চিত্রের বহু করণ-কৌশলের মাধ্যমে চিত্ররচনা করিয়া গিয়াছেন। নূতন নূতন

অঙ্কনপদ্ধতিতে পরীক্ষা করিতে কখনো পশ্চাদ্‌পদ হইতেন না। প্রাচীন বর্তমান দেশী বিদেশী সকল শিল্পসৃষ্টির মধ্যেই যদি কোনো শিক্ষণীয় বিষয় লক্ষ্য করিতেন নিরলসভাবে তাহা গ্রহণ করিতে সচেষ্ট হইতেন। এই অনুসন্ধিৎসার গুণটি নন্দলালের মধ্যে ছিল বলিয়া তাঁহার শিল্পজ্ঞান যেমন ব্যাপক ছিল তেমনি করণ-কৌশল দক্ষতাও বহুভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

শিল্পীর সুদীর্ঘ জীবনের অধিকাংশ সময়ই শান্তিনিকেতনে অতিবাহিত হইয়াছে। ইহার গাছপালা পারিপার্শ্বিকের প্রতি যেমন আকৃষ্ট হইয়াছিলেন তেমনি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের দৈনন্দিন জীবন তাহাদের আনন্দ-উৎসবাদির সহিত ওতপ্রোতভাবে নিজের জীবনকেও একই সুরে বাঁধিয়াছিলেন। আশ্রম বিদ্যালয়ের সর্ব অনুষ্ঠানেই যোগদান করিতে তাঁহাকে দেখা যাইত। অনুষ্ঠানের স্থানগুলিকে আলপনায় শ্রীমণ্ডিত করিবার জন্য কলাভবনের ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকদের লইয়া কাজ করিতে ভালোবাসিতেন। বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকগণের প্রতি স্নেহশীল ও বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন এবং তাঁহার বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার জন্য এইখানের সকলেরই নিকটে বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল বড় কিছু কাজ করা বা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা যত বড় প্রতিভাবান ব্যক্তি হোন না কেন একজনের পক্ষে তাহা করা সম্ভব নহে। উপযুক্ত সহকর্মী ছাত্রছাত্রী সকলের মিলিত চেষ্টার দ্বারাই সেই উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

চারু ও কারু-কলা মহাবিদ্যালয়ে শিল্পাচার্য নন্দলালের একটি চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়াছিলেন ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ। এই প্রদর্শনীতে শিল্পীর বহু চিত্রের সমাবেশ হওয়াতে শিল্পীর কার্যের একটি পূর্ণ পরিচয়ের আভাস পাইবার সুযোগ হইয়াছিল, এক কথায় বলা যাইতে পারে ইহা ছিল নন্দলালের প্রতিনিধিত্বমূলক সার্থক প্রদর্শনী। প্রদর্শনীর পরের দিনে কলিকাতা হইতে শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন করিয়া প্রাতঃকালে গুরু নন্দলালের বাসভবনে গিয়াছিলাম প্রদর্শনীর সাফল্য ও চিত্রগুলির প্রশংসার সংবাদ তাঁহাকে জানাইবার উদ্দেশ্যে। তিনি তাঁহার স্টুডিয়োতে বসিয়া ছিলেন। খুব আগ্রহ সহকারে আমার নিকট হইতে প্রদর্শনীর বিস্তারিত সংবাদ শুনিলেন। তাহার পরে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "দেখো, এই সাফল্যে আমার কৃতিত্ব কিছুই নাই। এই কার্য আমার একার দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়। ইহার পিছনে আমার গুরু অবনবাবু, গুরুদেব, তোমরা সকলেই আছ বলিয়াই সম্ভব হইয়াছে। যদি একা

আমার দ্বারা ইহা হইত তাহা হইলে এখন আর করিতে পারিতেছি না কেন।" এই কথা বলিতে বলিতে একটু যেন ভাবাবেগে অভিভূত হইয়া গিয়াছিলেন। আবার বলিলেন, "দেখো, আমার ভারতীয় egoism আছে। যাহাই আঁকি-না কেন তাহা ভারতীয় হওয়া চাই। নূতন কিছু না হইয়া যদি ভারতীয় tradition-এর নকল হয় তাহাও ভালো। Tradition হইল বীজের ভিতরের নবপ্রাণের বহিরাবরণ। এই আবরণ না থাকিলে বীজের ভিতরের নবপ্রাণ রক্ষা পাইতে পারে না। জল বৃষ্টি তাপ ও অন্য রকমের ধ্বংসের হাত হইতে tradition-রূপী আবরণ রক্ষা করিয়া থাকে। আবরণ কঠিন হইলেও যথাসময়ে তাহাকে ফাটাইয়া নূতনভাবে প্রাণবীজের প্রকাশ হওয়া প্রয়োজন। আর্টেও তাহাই হইয়া থাকে, tradition ভাঙিবার শক্তি থাকা চাই, তবেই নূতন আর্টের সৃষ্টি হইবে। এইখানে tradition ও New Art-এর পরস্পরের মধ্যে কোনো প্রকার বিরোধ নাই, কিন্তু একে অন্যের সহায়ক।"